যতীশ যাদব

# RAW

## বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশে দেশে ভারতের গোপন মিশন

অনুবাদ: প্রমিত হোসেন

য তী শ  যা দ ব

# RAW
# বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশে দেশে ভারতের গোপন মিশন

রূপান্তর : প্রমিত হোসেন
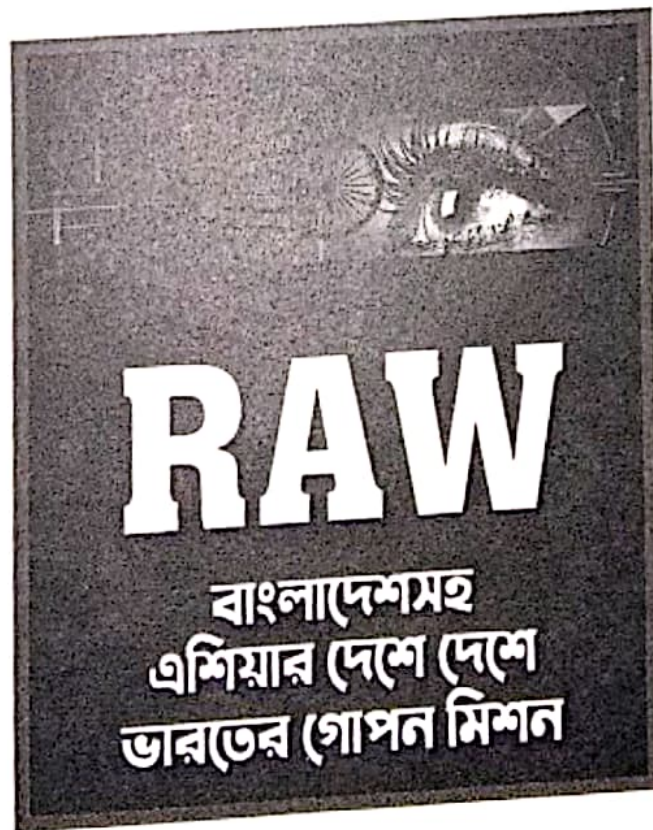
ঢাকা-বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

# অনুবাদ প্রসঙ্গে

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং, আরঅ্যান্ডএডাব্লিউ, সংক্ষেপে র। এই সংস্থা সাধারণত বিদেশে ভারতের গোপন মিশন পরিচালনা করে। কীভাবে সংস্থাটি গোপন কার্যক্রম করে থাকে, এর গুপ্তচরবৃত্তির ধরন-ধারণ, দেশে-দেশে গড়ে তোলা নেটওয়ার্ক ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়ে গেছে অন্ধকারে ঢাকা। সেই অন্ধকার থেকে র-কে অনেকটাই বের করে এনেছেন ভারতীয় সাংবাদিক যতীশ যাদব, লিখেছেন একটি বই– 'র: এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'স কভার্ট অপারেশনস।' বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোয় এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে র-এর মাধ্যমে ভারতের গোপন কার্যকলাপ, বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের গোপন হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন তিনি বইটিতে। তার সেই বই থেকে পাঁচটি অধ্যায় নিয়ে এ বই– 'র: বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশে দেশ ভারতের গোপন মিশন।' ইংরেজিতে রচিত মূল বইটির ওই পাঁচটি অধ্যায়ের শিরোনাম: ১) ব্লাডবাথ ইন বাংলাদেশ, ২) এ ওয়ারিয়র অ্যান্ড দ্য ওয়ারলর্ডস, ৩) শ্রী লংকা অ্যাফেয়ার্স, ৪) স্পাইজ ইন নেপাল ও ৫) এ স্পাই অ্যামং দ্য ডার্ভিশ। এছাড়া রয়েছে লেখকের নোট, পূর্বকথা ও শেষ কথা। এই পাঁচটি অধ্যায়ের সরাসরি ও মূলানুগ অনুবাদ নিয়েই এ বই। অনুবাদে কোনও প্রকার সংযোজন-বিয়োজন করা হয়নি। যতীশ যাদব যা লিখেছেন সেটারই স্বচ্ছ বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে মূলানুগতা বজায় রেখে। তাছাড়া এই অধ্যায়গুলো অনুবাদের জন্য বেছে নেয়ার কারণ ভৌগোলিক প্রাসঙ্গিকতা। বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান ও ইরান নানাসূত্রে পরস্পর নিকটবর্তী দেশ। এসব দেশে প্রতিবেশী দেশ ভারতের গোপন অভিযান কৌতুহলী মনে আগ্রহের জন্ম দেয়। সেটাও

বিবেচ্য ছিল অধ্যায়গুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে। এসব দেশ ছাড়াও ভারত গোপন হস্তক্ষেপ করেছে ফিজিতে ও নানাপ্রকার গোপন মিশন চালিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশকে নিয়ে র-এর নানাপ্রকার তৎপরতা সম্পর্কে নানাপ্রকার কথা শোনা যায়। সেই তৎপরতার কিছু অংশ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে জানা যাবে 'বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা' শিরোনামে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে। নিরপেক্ষ এই কারণে যে বইটি যিনি লিখেছেন, অনেক রকম তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি করে, তিনি স্বয়ং একজন ভারতীয়, বাংলাদেশে র-এর তৎপরতা সম্পর্কে তিনি ভুল গল্প রচনা করেছেন এমন মনে করার কোনও কারণ নেই।

**প্রমিত হোসেন**

ঢাকা/জুন, ২০২১

# গ্রন্থকারের নোট

ভারতের গুপ্তচর মহল নিজস্ব অভিযান, সাফল্য ও ব্যর্থতাগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে সুরক্ষিত রাখে, যার সঙ্গে মিল নেই আমেরিকান সিআইএ, ব্রিটিশ এমআই৬ কিংবা ইসরায়েলি মোসাদের। এ বইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে মাকড়শার জাল পরিষ্কার করা। সক্রিয় গুপ্তচর আর স্পাইমাস্টারদের সঙ্গে অসংখ্য আলাপচারিতা হচ্ছে এর ভিত্তি। যা দেখা সম্ভব হয়েছিল কেবল একান্তে সেসব ডিক্লাসিফাইড নথিপত্র থেকেও সাহায্য পাওয়া গেছে, যার ফলে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (আরঅ্যান্ডএডাব্লিউ, সংক্ষেপে র) নামক ভারতের বিদেশবিষয়ক গুপ্তচর সংস্থাটির এজেন্ট এবং অ্যাসেটদের জীবন ও ইতিহাস একসঙ্গে গাঁথা সহজ হয়েছে এ বইটিতে। এতে উল্লেখকৃত অনেক উদ্ধৃতি ও পরিপ্রেক্ষিত গৃহীত হয়েছে সূত্রের দেয়া নোটে। কোথাও সূত্রের উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে, সেটা করা হয়েছে প্রধানত নাম প্রকাশ না করার জন্য। আমি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে নির্দিষ্ট কিছু অভিযানের সঙ্গে জড়িত অ্যাসেট, এজেন্ট ও স্থানের প্রকৃত নাম গোপন রেখেছি, প্রশংসার বাইরে থাকা এই হিরোদের নিয়ে কথা বলেছি তাদের লৌহমুখোশের আড়ালে রেখে। তবে যা তুলে ধরা হয়েছে তার সবই সত্য ঘটনা। দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা আর বিভিন্ন শক্তির ছায়াযুদ্ধ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করা হচ্ছে র-এর কাজের ধরন। এক দিক থেকে এ বইয়ের বৃত্তান্ত হচ্ছে ভারতের এসপিওনাজ ইতিহাসের মাইলফলক যা বলা দরকার ছিল, যাতে বিভিন্ন সময়ে আর সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারতীয় গুপ্তচরদের 'মিশন ইম্পসিবল' সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্বসম্প্রদায় জানতে পারে। ভারতীয় গুপ্তচর মহলের পুরুষ ও নারীরা তাদের কাজকর্মের মধ্যে উঁকি দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন বলে লেখক তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ আর এ জন্যই বইটি সম্ভব হয়েছে।

মার্চ ২০২০

# পূর্বকথা

সহকর্মীদের বিদায় আবেগের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা দুই ভাগ হয়ে গেলে সেটাই ঘটেছিল। ভারতের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স বুরো (আইবি) ছাড়তে হয়েছিল দুইশোজন অফিসারকে, নতুন প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (আরঅ্যান্ডএডাব্লিউ) নামক সংস্থায় যোগদানের জন্য, এই সংস্থার মূল কাজ বিদেশে গুপ্তচরবৃত্তি, আইবি ছেড়ে যাওয়ায় তাদের বলা হয়েছিল 'বিশ্বাসঘাতক।'

এই দুইশোজন সাবেক আইবি অফিসারের জন্য র প্রদান করেছিল অজ্ঞাত অঞ্চলে গ্লামার ও ছদ্মনাম। যারা অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থায় রয়ে গিয়েছিল তারা তাদের উপহাস করে চলেছিল পরবর্তী কয়েক বছর।

আরঅ্যান্ডএডাব্লিউ-এর প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর নাথ কাও জানতেন, তার ও তার দলের ব্যর্থ হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য র-এর মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আইবির দক্ষতাকেও ছাড়িয়ে বিশেষায়িত গোয়েন্দা কার্যক্রমের দিকে নজর দিতে শুরু করেছিল সংস্থাটি। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস সার্ভিস (আরএএস)-এর প্রথম ব্যাচের অফিসারদের আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯৭১ সালে। এসব অফিসার ছিলেন কাঁচা প্রতিভা, গুপ্তচরবৃত্তির লিখিত পরীক্ষা ও বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান যাচাই করে কঠোরভাবে গভীর ও সতর্ক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তাদের রিক্রুট করা হত। আইবি নেটওয়ার্কে নিম্নসারির পদমর্যাদায় সরাসরি রিক্রুট করা হত ইন্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস (আইপিএস) অফিসারদের। কিন্তু র-এর ছিল নিজস্ব ক্যাডার। আইবি থেকে যেসব আইপিএস অফিসার র-তে যোগ দিয়েছিলেন, এমনকি তারাও আরএএসে স্থায়ীভাবে যোগ দিতে উৎসাহিত ছিলেন। ক্যাডারের এই রূপান্তরকে গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচরবৃত্তির প্রস্তুতিতে 'পুলিস হ্যাংওভারের' ক্ষেত্রে সেরা উপশম হিসেবে বিবেচনা করা হত। যাই হোক, কোন ক্যাডারের ধার বেশি,

আইপিএস নাকি আরএএসের, তা নিয়ে আজকের দিন পর্যন্ত বিতর্ক চলছেই। আইপিএস থেকে আসা একজন সিনিয়র র অপারেটিভ বিতর্কটির একটা দিকের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন: 'আইপিএস অফিসাররা সব সময়ই আরএএস অফিসারদের চেয়ে এক কদম এগিয়ে থাকবে, কারণ নিবিড় জনসম্পৃক্ততা থেকে লোকজনকে বুঝতে পারার ও তাদের মনের মধ্যে ঢুকে পড়ার যথার্থ সুযোগ আসে। আরএএস অফিসাররা রেশমগুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

আইবি থেকে যেসব আইপিএস অফিসার র-তে যোগ দিয়েছিলেন, পরিচয় গোপন রেখে ছদ্মনামে তাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল বিদেশে, কেননা সিভিল লিস্টে তাদের নাম থাকায় ভারতে অবস্থিত বিদেশী মিশনগুলো সহজেই তা জেনে যেতে পারত। সুতরাং বিক্রম সিং মস্কোয় গিয়েছিলেন বিশাল পণ্ডিত নামে, তার পরিবারের সদস্যদেরও নাম পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তার পরিবার বিদেশে অবস্থানকালে যদি তার সন্তান জন্ম নিত, তাহলে শিশুটির সারাজীবনের মত লেগে যেত ওই কুলনাম। এই ব্যক্তিগত সমস্যা যদিও সীমিত ছিল কয়েকজন আইপিএস অফিসারের মধ্যে, তবু কিছু সময় পর্যন্ত এতে সংস্থাটির মধ্যে তাপ ছড়িয়েছিল, বিশেষ করে আরএএসের সদ্য রিক্রুটদের মধ্যে।

সামাজিকভাবে ছদ্মনামের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার পাশাপাশি নতুন র রিক্রুটদের চার বছরের কঠোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছিল, যার মধ্যে অন্তত একটি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা রপ্ত করার বিষয়টিও ছিল, ভাষাগুলোর মধ্যে ছিল চীনা, রুশ, আরবী, সিংহলী, জার্মান, পোলিশ ও উর্দু। টার্গেট ছিল কমিউনিজম। কমিউনিস্টদের প্রভাব শনাক্ত করা, তাদের অবস্থান নির্ণয় করা ও তাদের নিষ্ক্রিয় করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল সদ্য রিক্রুটদের। চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আফগানিস্তান, পূর্ব জার্মানি ও ইস্টার্ন ব্লক ভুক্ত অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট সরকারগুলোর কার্যক্রম ভালভাবে বোঝার মত প্রশিক্ষণ পেয়েছিল তারা। এসব ছাড়াও কমান্ডো ও এক্সপ্লোসিভ প্রশিক্ষণ ছিল বাধ্যতামূলক।

গুপ্তচর বৃত্তিতে রিক্রুটদের প্রশিক্ষণ দিতে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোয় অফিস খুলেছিল র, যেমন রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, আসাম এবং জম্মু ও কাশ্মির। লক্ষ্ণৌতে র-এর গুপ্ত অফিস খোলা হয়েছিল নেপাল ও চীনকে টার্গেট করে, জম্মু ও কাশ্মির স্টেশনের কাজ ছিল পাকিস্তানের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি। নতুন স্পাইরা দিন কাটাত কোড শিখে আর ইনফর্মার নিয়োগ করে এবং রাতে শক্তিশালী বিস্ফোরকের অংশগুলো জোড়া দিয়ে ও খুলে। ইতোমধ্যে

সমস্ত সার্ভিসে কাও সেইসব লোকদের সন্ধান করে চলেছিলেন যাদের গুপ্তচর বৃত্তির দক্ষতা ছিল। এ জন্য তিনি সিভিল সার্ভিস ও প্যারামিলিটারি বাহিনীতেও অনুসন্ধান করেছিলেন।

১৯৭৭ সালের মার্চে ভারতের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেসাই, ততদিনে পাঁচ হাজারেরও বেশি বেতনভুক্ত কর্মী নিযুক্ত করে ফেলেছিল র। রাইসিনা হিলে উঠে আসার পর দেসাই প্রথম যে কাজটা করেছিলেন সেটা ছিল র-এর এজেন্টদের তাদের অফিসে সীমাবদ্ধ করে ফেলা যাতে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস পায়। সমাজবাদী ধারার এই প্রধানমন্ত্রীর সন্দেহ ছিল, ভারতে জরুরি অবস্থার সময় তার পূর্বসুরী ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন দিয়েছিল র। র কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দেসাই বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে নির্মমতা গ্রহণের কৌশলের জন্য সংস্থাটিকে অভিযুক্ত করেছিলেন। দুর্ভাগা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে দেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালানোর ম্যানডেট তাদের নেই। যদি এ ব্যাপারে কোনও সংস্থাকে অভিযুক্ত করতেই হয় তাহলে সেটা আইবি, র-এর একান্ত অপ্রিয় বস্তু। কিন্তু দেসাই ছিলেন কঠোর।

এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কাও এবং তার সেরা অফিসার কে. সঙ্করন নায়ারকে দেসাই সরকারের চাপে সংস্থাটি ছাড়তে হয়েছিল। বিদেশে র-এর অভিযানের ব্যাপারে বড় ধরনের শুদ্ধি চলেছিল এবং নতুন নিয়োগ দৃশ্যত থেমে গিয়েছিল। গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ স্থগিত ছিল, অসংখ্য রিক্রুট অন্ধকারে পড়ে গিয়েছিল তাদের প্রশিক্ষকরা যথাসময়ে তাদের ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হওয়ায়। সৌভাগ্যবশত দেসাই এই সংস্থাটির দায়িত্ব দিয়েছিলেন এন. এফ. সানটুককে, তিনি কোনও ভাবে রকে রক্ষা করেছিলেন এর নিজের কাস্টমার তথা সরকারের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার হাত থেকে। তাছাড়া ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যাবর্তনের ফলে র-এর ম্যানডেট পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু মোরারজি দেসাই ও পরবর্তীকালে তার সাবেক সাথী চৌধরী চরণ সিং-এর দ্বারা সৃষ্ট গভীর ক্ষত সারতে সময় লেগেছিল প্রায় চার বছর। ১৯৮৪ সালের অক্টোবরে যখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন, ততদিনে সারা বিশ্ব থেকে গোয়েন্দা তথ্য পাঠাতে শুরু করেছিল র। রাজীব গান্ধী এতে খুশি ছিলেন, তবে তখনও চীনাদের ব্যাপারে ত্রস্ত ছিলেন। সে সময় চীনা ডেস্কে কাজ করতেন এমন একজন র অফিসারের মতে, ১৯৬২ সালে চীনের হামলায় ভারতের যে পরাজয় ঘটেছিল সেই ঘটনায় রাজীব মানসিক আবদ্ধতায় ভুগছিলেন, ওই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন

রাজীবের মাতামহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। 'যদিও তাকে ব্রিফ করা হয়েছিল যে চীনাদের তরফ থেকে ভয়ের কিছু নেই, তা সত্ত্বেও ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে চীনের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের চেয়ারম্যান দেং শিয়াওপিং-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রাজীব এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেন অধ্যক্ষের সামনে দাঁড়ান স্কুল বালক।'

শ্রীলঙ্কায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর যে মন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজীব তাতেও সংস্থাটির ক্ষতি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন র-এর ভিতরকার লোকজন, যারা এখনও বিশ্বাস করেন এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিবেশী দেশটিতে র-এর বেশ কিছু অপারেশন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। রাজীব গান্ধীর উত্তরসুরী ভি. পি. সিং ও চন্দ্র শেখর ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতে আগ্রহী ছিলেন না এবং বিদেশের মাটিতে র-এর অভিযানের দিকে তাদের সামান্যই মনোযোগ ছিল। র অফিসারদের বিশ্বাস এই দুজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর প্রধান লক্ষ্য ছিল একটা রাজনৈতিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ভারতের স্পাই এজেন্সি ও গোয়েন্দা তথ্যের কার্যকারিতা ও মূল্য এবং বিভিন্ন দেশ ও ঘটনাবলীর ওপর এই এজেন্সির জোগান দেয়া গোয়েন্দা তথ্য ও কৌশলগত বিশ্লেষণের দিকে তাদের তেমন আগ্রহ ছিল না। যাই হোক, একজন অফিসার যার কোড-নেম প্রিন্স এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক প্রভুদের ব্যাপারে মাথা ঘামাত না র, এবং রাজীব ও চন্দ্র শেখর সরকারের আমলে এজেন্সি বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ স্পাই অপারেশন পরিচালনা করেছিল।

স্পাইমাস্টারদের চোখ দিয়ে এ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযানের সাফল্য ও ব্যর্থতা। এটা মশলাদার টি-টোয়েন্টি ম্যাচ নয়। একটা ইয়র্কার সামলানোর চেয়েও কঠিন হতে পারে একজন স্পাইয়ের মন জয়ের চেষ্টা। এসপিওনাজ অপারেশনের আসল ব্যাপার বোঝার জন্য দরকার হয় পানশালায় অনিঃশেষ ভেজা সন্ধ্যা কাটান, নিষ্প্রভ আলোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রবণ চৌকিতে বসে থাকা আর বহু মাইল দীর্ঘ হাঁটা। তবে ফলাফল হতে পারে শিহরণ জাগান।

বাংলাদেশের মুক্তির সমার্থকে পরিণত হয়েছে র। পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের এজেন্সি কীভাবে সহযোগিতা করে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে যদিও স্পাইদের প্রজন্ম বিভিন্ন রকম ধারণা নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু গোপনীয়তার কারণে কোনও কিছুই কখনও নিশ্চিত করা হয়নি বা অস্বীকারও করা হয়নি।

তবে আরও অনেক চমকপ্রদ কাজ ও বিপত্তি হচ্ছে ভারতীয় স্পাইদের জীবনে প্রধান বিষয়, যার কতকগুলি সম্পর্কে এমনকি তাদের স্ত্রীরাও অবগত থাকে না। এ বইয়ের অনেক কাহিনী লেখা হয়েছিল যখন একটা সংগঠন হিসেবে র পরিণত অবস্থায় পৌঁছেছে সেই সময়। ১৯৮০-এর দশকে ভারতীয় স্পাইরা অকস্মাৎ নিজেদের আবিষ্কার করেছিল আফগানিস্তানের লেলিহান যুদ্ধক্ষেত্রে। মিখাইল গরবাচেভ তখনও পর্যন্ত ইউএসএসআরের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হননি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির বিষয়টি সোভিয়েত গেম প্ল্যান পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। ভারত আশঙ্কা করেছিল যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্রটি তৈরি করা হয়েছিল আফগান মুজাহিদীনের জন্য-মুজাহিদীন ছিল সোভিয়েত বিরোধী প্রতিরোধ বাহিনী-এই বাহিনী পরিচালনা করছিল পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)। আরেকটা ফ্রন্ট দ্বীপরাষ্ট্র ফিজিতে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী টিমোসি বাভাদ্রাকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন সেনাবাহিনীর জেনারেল সিটিভেনি রাবুকা। এই রাবুকা ছিলেন ফিজির জাতিগত ভারতীয়দের কট্টর শত্রু। ভারতীয় স্পাইদের জন্য আফগানিস্তান ও ফিজি এই দুটো ফ্রন্টই ছিল অনির্ভরযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্র উভয় ঘটনাতেই কিছুই করেনি। ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র ও অর্থ প্রদান করা থেকে আইএসআইকে বাধা দেয়নি, ফিজির ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ করতেও চাপ দেয়নি রাবুকাকে। রাজীব গান্ধী সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপের বাইরে ভারতীয় স্পাইরা ফিজির ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলা করেছিল এমন পন্থায় যার জন্য তাদের প্রশংসা পাওনা।

ভারতের পক্ষে এসব অভিযান ভবিষ্যতের জটিল ভূরাজনৈতিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জকে ঘিরে পরিচালিত হয়েছিল তিনটি শব্দে: গোপনীয়তা, গতি ও সাফল্য। ভারতীয় গুপ্তচররা তাদের প্রভাব খাটাতে শুরু করেছিল বিদেশে। ব্যগ্র এজেন্টরা অভ্যুত্থানের বিপদজনক পরিস্থিতিকে ভারতের স্বার্থের অনুকূল পরিস্থিতিতে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছিল ফলপ্রসূভাবে। ইন্টেলিজেন্স মহল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল জীবন বাজি রেখে, মনের কৌশল ছিল তাদের জ্বালানি।

এসব নজিরবিহীন অভিযান সীমিত ছিল না শুধুমাত্র পাকিস্তানের মত আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রেই। ইনফর্মার ও গোপন দলকে রিক্রুট, প্রশিক্ষণ ও নিযুক্ত করেছিল র যুক্তরাষ্ট্রে, ইরানে ও কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রে, এছাড়াও নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোয়। এই সমস্ত কিছু পরিচালিত হয়েছিল অকল্পনীয় গোপনীয়তায়।

এ বইয়ের বেশির ভাগ গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছেন পুরুষ অপারেটিভরা, তবে ১৯৬৮ সালে র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে প্রচুর নারী অফিসারও এতে নিযুক্ত হয়েছেন। নারী অপারেটিভদের দায়িত্ব পালন করেন অ্যানালিস্ট, কার্টোগ্রাফার, পলিগ্রাফ এগজামিনার, ইন্সট্রাক্টর, লিঙ্গুইস্ট, ইকোনমিস্ট ও টার্গেটিং অফিসার হিসেবে। বর্তমানে তারা সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট, কাউন্টারইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ, হিউম্যান রিসোর্স স্পেশালিস্ট ইত্যাদি আরও নানা পদে দায়িত্ব পালন করছেন। পর্দার আড়ালে কর্মরত এই নারী গুপ্তচররা বড় বড় অভিযান, বিশাল ঘটনা আর দেশের ভাগ্যকে আকৃতি প্রদান করেছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমার একজন নারী বন্ধু র-তে কাজ করেন অ্যানালিস্ট হিসেবে, তিনি সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের অর্থায়ন শনাক্ত করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। অ্যানালিস্টরা ফিল্ড এজেন্টদের কাছ থেকে আসা অপরিমার্জিত গোয়েন্দা তথ্য একত্রিত করেন এবং তা থেকে সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট প্রস্তুত করেন এজেন্সির কাস্টমারদের জন্য। র-এর প্রথম কাস্টমার হচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এর মানে হল, রিপোর্টে প্রাসঙ্গিক বিশদ বিবরণ অবশ্যই থাকতে হয় যাতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। এসপিওনাজ পেশায় একজন অ্যানালিস্টের কোনও বিকল্প নেই। ফিল্ড থেকে আসা অশোধিত গোয়েন্দা তথ্যে সজ্জিত আমার বন্ধুটির কারণে একটা অপারেশন পরিচালিত হয়েছিল যার ফলে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের গ্রে লিস্টে নাম উঠে যায় পাকিস্তানের। এই টাস্ক ফোর্স হচ্ছে আন্তঃসরকারী সংস্থা যার কাজ অর্থপাচারের ওপর নজর রাখা। তিনি হয়তো মাঠপর্যায়ে কাজ করেন না, কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধে তার অবদান মোটেও উপেক্ষা করা যাবে না।

অ্যানালিস্ট, লিঙ্গুইস্ট, সাইবার এক্সপ্লয়টেশন অফিসার, কান্ট্রি এক্সপার্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে যেসব স্পাই কাজ করেন ডেস্কে, তারা ছদ্মবেশী অপারেটিভদের মতই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাদের ভূমিকায় জেমস বন্ড চলচ্চিত্রের সেই গ্ল্যামার থাকে না যা আরোপ করা হয় ফিল্ডে কর্মরত এজেন্টদের ওপর। যাই হোক না কেন, সদরদপ্তরে ও বিদেশে তাদের পদ্ধতিগত নিরলস কাজ সর্বদাই হয়ে থাকে সবচেয়ে চমকপ্রদ অভিযানগুলোরই অংশ। একজন নারী অফিসার তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন অ্যানালিস্ট হিসেবে, পরে তিনি বিদেশে একটা র মিশনের প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি সেই দুর্লভ স্পাই: উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা বিষয়ক গোয়েন্দা তথ্যের এক মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার।

একজন কিংবদন্তীতুল্য স্পাই চিফ একদা লক্ষ্য করেছিলেন যে অনেক নারী আইপিএস অফিসার র-তে যোগ দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তারা অভ্যন্তরীণ সংস্থায় থাকতেই পছন্দ করতেন; যেমন প্যারামিলিটারি, রাজ্য পুলিশ অথবা আইবি; এটা ঘটত পারিবারিক বাধ্যবাধকতার জন্য। ঠিক এই মুহূর্তে আইবির মধ্যে নারী অফিসাররা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর অভিযানসমূহের দায়িত্বে রয়েছেন এবং অন্তত পাঁচটি এসআইবি (স্টেট ইন্টেলিজেন্স বুরো, আইবির অংশ) সংস্থায় কাজ করছেন সিনিয়র নারী কর্মকর্তারা। কিন্তু ডেস্কেই হোক আর ফিল্ডেই হোক, সবখানেই মানতে হয় একই কঠোর রুটিন: প্যারামিলিটারির মানদণ্ড অনুযায়ী ফিজিক্যাল ট্রেইনিং, ভূরাজনীতি আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দক্ষতা। কীভাবে বন্ধু তৈরি করতে হয় তাও শিখতে হয় তাদের, আরও শিখতে হয় পটভূমিকায় অঙ্গীভূত হওয়া, পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা, পর্যবেক্ষণ শনাক্ত করা, অ্যাসেটদের চালানো, সোর্সদের ব্রিফ ও ডিব্রিফ করা, রিপোর্ট লেখা, গোপনে যোগাযোগ করা, হুশিয়ারি সংকেত পর্যবেক্ষণ করা এবং গুপ্ত অভিযান পরিচালনা করা। মানব মনস্তত্ত্ব ও মানব দুর্বলতা, দূরত্ব ও উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য টপোগ্রাফি এবং সাইফারিং ও ডিসাইফারিং করার কৌশল ইত্যাদিও তাদের প্রশিক্ষণের অংশ। এসব ছাড়াও বিভিন্ন শহুরে ও গ্রামীণ লোকেশনে তাদের পর্বতারোহণ, সাঁতার ও প্র্যাক্টিক্যাল সেশনে অংশগ্রহণ করতে হয় ইউনিটের সঙ্গে।

অপারেটিভরা বিপদজনক জীবনযাপন করেন, সর্বক্ষণ ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। তাদের বীরত্ব থেকে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোনও পদক গেঁথে দেয়া হয় না ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভদের বুকে। তাদের ক্ষেত্রে শুরুর আগেই মারা পড়ে ভাবাবেগ। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম সফল আঘাত হেনেছিল যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত র-এর আশিজন ছদ্মবেশী অ্যাকশন অপারেটিভ। দলটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করেছিল, বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে ফিরেছিল। কিন্তু কয়েকজন নিহত হয়েছিল শত্রুর গুলিতে। তাদের নাম স্থান পায়নি শহীদের তালিকায়। টিভি চ্যানেলগুলো যখন প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিহত বীরদের সম্মান জানানোর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছিল, তখন গোয়েন্দা সংস্থাটির উচ্চপদস্থরা ভাবাবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলেন। কার্গিল যুদ্ধে বন্ধু ও সহকর্মী হারান অপারেটিভরা অসহায়ভাবে অনুষ্ঠানটা দেখেছিলেন। রেহমান ছদ্মনামধারী একজন অফিসার সংস্থার শীর্ষকর্তার কাছে অনুরোধ করেছিলেন, অপারেটিভদের আত্মত্যাগকে যেন স্বীকৃতি দেয়া হয় যারা আর কখনও ফিরে আসবে না। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

অটল বিহারী বাজপেয়ীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রধান সচিব ব্রজেশ মিশ্রকে একটা বার্তা দেয়া হয়েছিল এ ব্যাপারে। তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। যাই হোক না কেন, বার্তাটা পৌছেছিল বাজপেয়ীর কাছে। ৭ নং রেস কোর্স রোডে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনের এক রুদ্ধদ্বার সম্মেলন কক্ষে আঠারোজন র অফিসারের নাম শব্দ করে পড়া হয়েছিল, কার্গিল যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের বিশদ বিবরণসহ। র-এর ইতিহাসে প্রথমবার এইসব অন্তরালে থাকা যোদ্ধাদের বিশেষ পদক প্রদান করা হয়েছিল। বাজপেয়ী করমর্দন করেছিলেন শীর্ষস্থানীয় র অফিসারদের সঙ্গে এবং এই নেপথ্যের বীরদের চরম আত্মত্যাগের জন্য তার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এই মিটিংয়ের কোনও রেকর্ড রাখা হয়নি। পরের দিনের সংবাদপত্রের জন্য কোনও সরকারী প্রেস রিলিজ পাঠান হয়নি। কোনও আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়নি প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইটে। অনুষ্ঠানের পর অফিসাররা নিজেদের গোপনীয়তা নিজেদের সঙ্গে নিয়েই শান্তভাবে ফিরে গিয়েছিলেন তাদের অদৃশ্য জগতে।

## ১

# বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা

১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অধীনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিরোধের অন্য ক্ষেত্রগুলোয় নিজের শক্তিবৃদ্ধি ও প্রভাব বিস্তার শুরু করেছিল র। ভারত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে তার সেনাবাহিনী ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় এবং র-এর কাজ ছিল ভারতীয়দের দিল্লিতে ফেরত নিয়ে আসা। দক্ষিণ এশিয়ার সদা-পরিবর্তনশীল নিরাপত্তার গতি মোকাবেলায় নতুন জন্ম নেয়া দেশটিকে সাহায্য করতে নেপথ্যের আলোচনার জন্য ঢাকায় কেবলমাত্র কূটনীতিকদের রেখে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশকে উন্মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে আসার ভারতীয় সিদ্ধান্ত নিরাপত্তার দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে, যার ফলে কয়েক দশকের এক গোপন যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল র।

১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট, ভারত যখন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছিল, ঢাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল অফিসার মেজর ডালিমের নেতৃত্বে শেখ মুজিবের বাসভবনে আচমকা হানা দিয়ে সফল অভ্যুত্থান ঘটায়। তারা মুজিবকে ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে, তারা তার দুজন ভাগিনেয় *বাংলাদেশ টাইমস*-এর প্রভাবশালী শেখ মনি ও জাতীয় ছাত্র লীগের সেক্রেটারি শহীদুল ইসলাম এবং মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতকেও হত্যা করে, সেরনিয়াবাত ছিলেন দেশটির পানি উন্নয়ন মন্ত্রী। মুজিবের কন্যা ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেদিন ভাগ্যক্রমে জার্মানিতে ছিলেন, তাকে র-এর এজেন্টরা নিরাপদে দিল্লিতে নিয়ে এসেছিল। বহু দূরে পোল্যান্ডে ঘাঁটি গেড়ে থাকা স্পাইরা এ ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। সে বছর ১৫ থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেখ মুজিব ওয়ারস সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। পোলিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের

কর্মকর্তারা বুঝতে পারছিলেন না কেন ভারতীয় স্পাইরা অভ্যুত্থান সম্পর্কে আগেই জানতে পারেনি অথবা প্রভাবিত করতে পারেনি যে ঘটনায় মুজিবের পঁয়ষট্টিজন আত্মীয় ও অনুসারী নিহত হয়।

র-এর ধারণা, ১৯৭১ সালের একজন মুক্তিযোদ্ধা মেজর ডালিমের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ছিল শেখ মুজিবের প্রতি, তাকে ও আরও সাতাশজন সেনা কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ করছিলেন। এই ঘটনাটা ঘটেছিল যখন তারা কুখ্যাত দুর্নীতিবাজ গোলাম মোস্তফার একটা অপকর্ম সম্পর্কে শেখ মুজিবের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, গোলাম মোস্তফা ছিলেন বাংলাদেশ রেড ক্রসের চেয়ারম্যান এবং শেখের অন্যতম অনুগ্রহভাজন। মোস্তফার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি মুজিব এবং সেই কারণে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন ডালিম।

র-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আর. এন. কাও নিজেও হতভম্ব হয়েছিলেন পোলিশ কর্মকর্তাদের মতই। তিনি জানতেন না পরিস্থিতি কীভাবে বদলে গিয়েছিল মাত্র চার বছরেই। ঢাকা থেকে টেলিগ্রাম ও নোটের মাধ্যমে আসা রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, মুজিবের ব্যক্তিগত রক্ষীদের তরফ থেকে কঠিন প্রতিরোধ সত্ত্বেও দুইশোজন নিহত হয়েছিল প্রথম দিনের লড়াইতে। একটা অভ্যন্তরীণ গোপনীয় নোটে জানা গিয়েছিল, একদল মুজিব-অনুসারী তরুণ ঢাকার রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা যখন দেখতে পায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের দিকে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করছে তখন সরে যায়। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সেবা সীমিত রেখে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

ওই অভ্যন্তরীণ গোপনীয় নোটে বলা হয়: 'সাংবিধানিক সরকার ও শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথ ত্যাগ করে বাংলাদেশে একটি নতুন সরকারের অভ্যুদয় ঘটেছে যার হাত শেখ মুজিবের রক্তে রঞ্জিত, যিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিশীল চেতনা ও নায়ক এবং অবিসম্বাদিত নেতা।'

শেখ মুজিব ভারতের প্রতি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন, ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে ছিল তার অবস্থান। কিন্তু অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশটিতে সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সহিংসতা ও অরাজকতার কারণে তিনি আকর্ষণ হারাচ্ছিলেন।

ঢাকায় অবস্থানকারী র-এর স্পাইরা জানিয়েছিল যে অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিদেশী সহযোগীদের সরাসরি জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ ছিল না। যদিও

একটা বিষয় ছিল অর্থপূর্ণ: নতুন সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল পাকিস্তান এবং পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও পনের মিলিয়ন মিটার কাপড়ের বিপুল ত্রাণ সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল কালবিলম্ব না করে। এমনকি অভ্যুত্থানের পরপরই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল সৌদি আরব, যে স্বীকৃতি তারা দেয়নি মুজিবের চার বছরের শাসনামলে। ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করেছিল যে মাওপন্থীরা এই অভ্যুত্থানের ঘটনায় জড়িত, যারা দীর্ঘকাল ছিল মুজিব-বিরোধী। চীনের এতে হাত ছিল কিনা তা জানা না গেলেও দেশটি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিল, যার অর্থ ছিল এই যে এটা ছিল উপমহাদেশে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা উস্কে দেয়ার চীনা নীতির অনুকূল পরিস্থিতি। ঢাকায় অবস্থিত অন্যান্য কূটনৈতিক মিশনের ক্ষেত্রে না ঘটলেও ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে সারা বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা। ভারতীয় হাই কমিশন, অন্যান্য দপ্তর ও অফিসিয়াল বাসভবনের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল অভ্যুত্থানকালে।

ভারত সরকারের একটা নোটে বলা হয়: 'কুয়েতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওয়াসিউদ্দীন অভ্যুত্থানে জড়িত বলে জানা গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ বাঙালী অফিসার এবং তার বাকিবকেয়া পরিশোধ করতে অস্বীকার করায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন বলে জানা যায়। অবশেষে সেনাবাহিনী যখন নিজের সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করবে তখন আমরা হয়তো জড়িত হিসেবে ব্রিগেডিয়ার রউফের নামও জানতে পারব, তিনি ছিলেন ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সের সাবেক পরিচালক, লন্ডন থেকে ফিরেছিলেন ১৯৭৫ সালের ১৩ই অগাস্ট। বাংলাদেশ কিছু কালের জন্য অহরহ ব্যক্তি ও রাজনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে অশান্তি ও অস্থিরতায় পড়তে চলেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।'

ভারত সরকারকে যা আরও বেশি হতভম্ব করে দিয়েছিল তা ছিল ১৬ই অগাস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের বেতার ভাষণ। সেই ভাষণে ভারতের নাম উচ্চারণ করেননি আহমদ, কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে একটা 'নির্দিষ্ট শক্তি' মুজিব সরকারের আমলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক অপব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছিল। মোশতাক, যিনি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধানের পদে নিযুক্ত করেছিলেন, আরও ঘোষণা করেছিলেন যে তার সরকার ইসলামী দেশসমূহ, বড় শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যগ্র। বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের মাত্র দুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী

ইন্দিরা গান্ধী ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। রাজনৈতিক অশান্তি নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হওয়ার সঙ্গে দৃশ্যত একটা লৌহমুষ্টির শাসনে পড়ে গিয়েছিল ভারত।

জে. এন. দীক্ষিত এক সময়ে ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার। তাছাড়া দেশটির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হিসেবেও গণ্য হতেন। তিনি ধারণা করেছিলেন, ঢাকার পলিসি হবে সাম্প্রদায়িক, ইসলাম ও পশ্চিমাপন্থী। কিছু কাল ধরে বাংলাদেশে হাঙ্গামা চলবে বলে তিনি অনুমান করেছিলেন, যা অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দেবে দেশটিকে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, অনেক ভারতপন্থী বাংলাদেশী রাজনীতিক আছেন এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে অনুরূপ সম্পর্কের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন।

'আমরা একই রকম বিস্তৃত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে, আমরা তাদের যতদূর সম্ভব বিস্তৃত পরিসরে বিকশিত করতে পারি। আমাদের সার্বিক লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এমন একটা সরকারের পুনরাবির্ভাবে উৎসাহ জোগান যে সরকার হবে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন আর যে সরকার হবে সেই নীতি-আদর্শের প্রতি নিবেদিত যা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের চালিকাশক্তি,' দীক্ষিত লিখিতভাবে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে।

### অভ্যুত্থান ও শেখ মুজিবকে হত্যা

বাংলাদেশে নাক গলানোর সামর্থ্য সীমিত হয়ে পড়ায় র নিশ্চিত হতে পারেনি সেনা অভ্যুত্থানে সিআইএর ভূমিকা কী ছিল। তবে গল্পের আরেকটা দিক পাওয়া যায় মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স (এমইএ)-এর ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসের একটা টপ-সিক্রেট নোটে। ওই মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এস. চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৫ সালের ৯ই অক্টোবর কলকাতায় দীর্ঘ বৈঠক করেছিলেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের সঙ্গে। চট্টোপাধ্যায় তার নোটে উল্লেখ করেন:

> *মোশতাক আহমদ একেবারে শুরু থেকে অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন গভীরভাবে। যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ সেনা কর্মকর্তা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরাসরি জড়িত ছিল, পিছনের আসল মাথা ছিল পাকিস্তান ও সিআইএ। তিন বাহিনীর*

*তিনজন প্রধান এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সিনিয়র ও আস্থাভাজন কর্মকর্তার আত্মতুষ্টির কারণে অভ্যুত্থান ঘটতে পারত। ধরের মতে, মোশতাক আহমদ ছিলেন ধূর্ত ও কুচক্রী ব্যক্তি, কিন্তু শেখ মুজিবের মত ব্যক্তিত্ব তার ছিল না। ধর বলেন, ঘটনাপ্রবাহে পাকিস্তানপন্থীরা উল্লসিত হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক ও ভারতবিরোধী প্রচারণা জোরদার করেছিল। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে কিছু কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন ধর। তিনি প্রেসিডেন্ট মোশতাক আহমদকে বলেছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী শেখ মুজিবেরও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন, সুতরাং শেখ মুজিবের অধীনে বাংলাদেশে যাই ঘটে থাকুক সে সবের দায় তারা অস্বীকার করতে পারেন না। দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন, কিন্তু রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ঢালাওভাবে ডাইনি খোঁজা উচিৎ হবে না। জনগণের মন থেকে শেখ মুজিবের নাম আর 'জয় বাংলা' শ্লোগান মুছে ফেলা অত সহজ নয়।*

চীনাদের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সন্দেহ যতদূর ছিল তাতে কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠান একটা টেলিগ্রামে চীনা প্রতিনিধি বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। অভ্যুত্থানের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি গঙ্গার পানি ভাগাভাগির ইসুটি উত্থাপন করেছিল চীন। চীনা বিবৃতিতে বলা হয়:

*আমরা বাংলাদেশের পরিস্থিতির ব্যাপারে সহমর্মী এবং দেশটির ন্যায়সঙ্গত অবস্থান সমর্থন করি। গঙ্গা যেহেতু একটি আন্তর্জাতিক নদী, তাই উজান ও ভাটির অধিবাসীদের মধ্যে পানিসম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য সমতার ভিত্তিতে আলোচনা হওয়া দরকার। উজানে অবস্থিত রাষ্ট্রের (ভারত) এক তরফা পদক্ষেপে ভাটিতে অবস্থিত রাষ্ট্রের ক্ষতি হচ্ছে যা আন্তর্জাতিক বিধির লঙ্ঘন।*

পরবর্তী দিনগুলোয় নতুন দিল্লির হাতে অনুরূপ আরও কিছু টেলিগ্রাম আসে যা থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলোয় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ক্রমবর্ধমান সংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত মেলে।

র-এর উপপরিচালক এ. কে. ভার্মা, যিনি ১৯৮৭ সালে সংস্থাটির প্রধান হয়েছিলেন, জানান যে অভ্যুত্থানটি ছিল মেজর পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের হাতের কাজ। সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য সিনিয়র অফিসারকে আস্থায় নেয়া না হলেও ঢাকার আর্মি কমান্ডের অজ্ঞাতনামা কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার দৃশ্যপটে ছিলেন। ভার্মার তদন্তে উন্মোচিত হয় যে অভ্যুত্থানের প্রধান যন্ত্র ছিল বেঙ্গল ল্যান্সার ও এর কমান্ডিং অফিসার মেজর ফারুক রহমান, কিন্তু বাইরের কোনও সেনাদল বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়নি। চিত্তাকর্ষক বিষয়টা হল, স্পাইমাস্টার ভার্মা আবিষ্কার করেন যে অন্যান্য বড় ও ছোট শহরগুলোয় ক্ষমতার কেন্দ্র দখলের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ঢাকায় শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তারা, যারা অভ্যুত্থানের ঘটনায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, নতুন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদানে সম্মত হয়েছিলেন।

অভ্যুত্থানের এক মাস পর ভার্মা নয় পৃষ্ঠার একটা গোপন নোটের খসড়া তৈরি করেছিলেন ভারতের বিভিন্ন সরকারী সংস্থার জন্য যারা জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। ভার্মার বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুজিব নিহত হওয়ার পর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকারী মোশতাক অভ্যুত্থান পরিকল্পনার গোপন বিষয়টি জানতেন। ভার্মা আরও বলেন, অভ্যুত্থানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্রকারী মেজর ফারুক রহমান ছিলেন মোশতাকের ভাগিনেয় এবং যেভাবে তারা দেশটির প্রশাসনের ওপর দ্রুত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন আর মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তা থেকে জোরাল ইঙ্গিত মেলে যে তিনি এই পরিকল্পনায় নিজের ভূমিকা সম্পর্কে আগেই জানতেন, ষড়যন্ত্রকারীরা তার নেতৃত্ব মেনে নেবে সেটাও জানতেন। ভার্মা উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনায় একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকতে পারে। তিনি নোটে যা লিখেছিলেন তা এই:

> *অভ্যুত্থানের ফলপ্রসূ পরিকল্পনা এবং অভিযান শেষ হওয়ার পর ক্ষমতার মসৃণ পালাবদলে আরেকটি সংস্থার জড়িত থাকার সম্ভাবনা এখনও পুরোপুরি নাকচ করা যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা ঘটেছে যা এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়। প্রথমত, অভ্যুত্থানের পর সামরিক বা বেসামরিক ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে বড় কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি, এটা একটা মাস্টারমাইন্ডের অস্তিত্বের ইঙ্গিতবহ। দ্বিতীয়ত, বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে গঠন করা হয়েছে একটা সামরিক উপদেষ্টা পরিষদ, প্রেসিডেন্ট এই পরিষদের চেয়ারম্যান ও তার সঙ্গে আছেন অভ্যুত্থানে*

*জড়িত মেজর র‍্যাংকের দুজন কর্মকর্তা। তৃতীয়ত, অভ্যুত্থানে জড়িত মেজর র‍্যাংকের একজন কর্মকর্তা ঢাকায় অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের ২০শে অগাস্ট, যখন তিনি নিজের প্রতি কিছু বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন এবং আমেরিকান দূতাবাস তার হয়ে সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সফলভাবে মধ্যস্থতা করে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। অতীতে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে আমেরিকানদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাস ও সেনা কর্তৃপক্ষের মধ্যকার এই আকস্মিক সংযোগ এবং ষড়যন্ত্রকারীদের একজনের পক্ষ হয়ে আমেরিকানদের সমস্যা সমাধানের সহজসাধ্যতা নিশ্চিতভাবেই এই সন্দেহ সৃষ্টি করে যে একজন সৎ মধ্যস্থতাকারীর চেয়েও বড় কোনও ভূমিকা ছিল কিনা আমেরিকান দূতাবাসের।*

স্বাধীন হওয়ার চার বছরের মধ্যে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রবণতার শিকড় গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছিল। মোশতাক যেসব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে নির্বাচিত করেছিলেন তাতেই তার প্রতিফলন ঘটেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে নতুন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল ওসমানীকে, কর্মরত সবচেয়ে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে নিযুক্ত করা হয়েছিল চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ। মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান ও মুজিব অনুসারী, তাকে সরিয়ে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয় জিয়াউর রহমানকে। চট্টগ্রামে ৬৫ ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার দস্তগির, তাকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে বাংলাদেশ রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার করা হয়। এই অফিসাররা সবাই ভারতবিরোধী প্রবণতা দেখিয়েছিলেন অতীতে। স্পষ্ট যে প্রেসিডেন্ট মোশতাক ভারতবিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসাচ্ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও মোশতাক এই নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মাহবুব আলম চাষী এবং নতুন মন্ত্রীসভার সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত শফিউল আজম উভয়েই কোনও না কোনও কারণে ভারতের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। মুজিবের মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্যকে এক পাশে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল, এটা থেকে যে পলিসির ইঙ্গিত মিলছিল তা হল যারা ভারতের প্রতি আনুকূল্য দেখাতে পারে তাদের দূরে রাখা এবং যারা ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধ

তাদের নিয়ে আসা। নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল ক্ষীণ। কিছু বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল ঢাকা ও অন্যান্য শহরে। প্রতিবাদকারীরা অভ্যুত্থানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-কে দায়ী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল এবং মুজিবপন্থীদের সামান্য কিছু গোপন তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই এসব দমন করা হয়েছিল।

কর্মকর্তারা জানতেন, ভারতের অনিষ্ট করতে পাকিস্তান ও চীন পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবে। পাকিস্তান দ্রুত এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়, যদিও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর মুজিবের সরকারকে সেই স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল। মোশতাক ছিলেন চতুর, তিনি পাকিস্তানের স্বীকৃতি আর ত্রাণ গ্রহণ করে ঝামেলায় পড়তে চাননি, এতে ভারত অসন্তুষ্ট হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের তরফে এই অনিচ্ছা অনুধাবন করতে পেরেছিল। আপাতত তারা দুই দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার প্রকাশ্য আচরণ স্থগিত করেছিল। ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এই তথ্য পেয়েছিলেন যে, পাকিস্তানকে বন্যাকবলিত অঞ্চলে সহযোগিতা করার জন্য একটি বাংলাদেশী টিম পাঠানোর যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন মোশতাক অভ্যুত্থানের পরপরই তা কৌশলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভুট্টো। যাই হোক, এই সত্য অস্বীকার করা যাচ্ছিল না যে বাংলাদেশের ঘটনাবলী সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিল পাকিস্তানিরা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশটিতে পা রাখার জন্য তারা যা কিছু করতে পারে তার জন্য প্রস্তুত ছিল।

ইতোমধ্যে র অনুভব করেছিল যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভারতীয় ও সোভিয়েত স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হবে, লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান রুশ উপস্থিতি এবং বাংলাদেশের সমাজের সর্বস্তরে ও ক্ষমতার কেন্দ্রে রাশিয়ার অনুপ্রবেশ নিয়ে আমেরিকানরা আগেই উদ্বিগ্ন ছিল। ভার্মা তার গোপন নোটে উল্লেখ করেন:

> *বাংলাদেশে অধিকতর পশ্চিমাপন্থী, পাকিস্তানপন্থী ও চীনপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যা সৃষ্টি করবে যা শাখাবিস্তার করতে পারে এই উপমহাদেশের সীমান্তের বাইরেও। এই অঞ্চলে পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের সংঘাতে বাংলাদেশ যদি দাবার গুটিতে পরিণত হয়, তাহলে এই অঞ্চল অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে যার স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া এসে পড়বে আমাদের ওপর। ওই ধরনের পরিস্থিতিতে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বিস্তারে*

*উৎসাহ বোধ করতে পারে চীন ও পাকিস্তান। ভুট্টো সবসময় চিন্তা করতেন যে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থান ভারতের অস্থিরতাপূর্ণ অঞ্চলগুলোর নিকটবর্তী হওয়ায় সেটা পাকিস্তানের জন্য বিশাল সৌভাগ্য। সেটাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগান উচিৎ। এটা সম্ভব যে তিনি হয়তো একই লাইনে চিন্তা করেন যখন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান আবার পরস্পরের কাছাকাছি হবে। চীনাদেরও অনুরূপ আগ্রহ রয়েছে। একবার তারা বাংলাদেশে এলে নিজেদের পিছিয়ে পড়তে দেবে না।*

কিন্তু কূটনৈতিকভাবে সামাল দেয়া ছাড়া এই পরিস্থিতিতে ভারতের তেমন কিছু করার ছিল না।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও র সদরদপ্তরে পাঠানো এমইএর ১৯৭৫ সালের ২১শে অগাস্ট তারিখযুক্ত একটা গোপন নোটে বলা হয়:

*ভারত যতদূর অবগত তাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেমন নৃশংসতায় ক্ষমতা দখল করেছে সে সম্পর্কে আমাদের গুরুতর আপত্তি রয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে পারি না। ওই দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অন্যান্য দেশের মতই সমতা, পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে স্থাপিত। আমরা কখনই বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও প্রকার বিশেষ সম্পর্ক অন্বেষণ করিনি। যেকোনও দেশের মত বাংলাদেশেরও যত বেশি সম্ভব বন্ধুত্ব স্থাপনের অধিকার আছে। পাকিস্তান, চীন অথবা অন্য যে কোনও দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে বাংলাদেশের স্বার্থে এবং তার লক্ষ্য ভারতবিরোধী হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা উদ্বিগ্ন হব না। অন্যদিকে, বাংলাদেশ যদি ভারতের স্বার্থ পরিপন্থী বিদেশী প্রভাবের শিকারে পরিণত হয়, এবং যদি তার নতুন ইসলামপন্থী মনোভাব এমন পর্যায়ে পৌছায় যাতে সংখ্যালঘুরা সন্ত্রস্ত হয়ে দলে দলে ভারতে পালিয়ে আসে, তাহলে সেটা হবে আমাদের জন্য গভীর উৎকণ্ঠার বিষয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতির উদ্দেশে নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষণের সারমর্ম তুলে ধরে আমাদের কাছে একটি নোট পাঠিয়েছে। তাতে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তার সরকার সকল দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক, সদিচ্ছা, সমঝোতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে।*

কিন্তু ভারত ছিল উৎকণ্ঠিত। বাংলাদেশে বিদেশী শক্তির প্রভাব সম্পর্কেই নয় শুধু, সেই দেশে নন-স্টেট অ্যাক্টরদের অনুপ্রবেশের কারণেও ভারত উৎকণ্ঠিত ছিল যে দেশটিকে মুক্ত করেছিল ভারতীয় স্পাইরা। কিসে ভুল হয়েছিল, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করে তা বিশ্লেষণ করেছিলেন সরকারী কর্মকর্তারা একটি গোপন নোটে।

অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর:

(ক) ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে জরুরি অবস্থা ঘোষণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল অর্থনৈতিক ধস, গভর্নর নিয়োগ ও অন্যান্য কঠোর পদক্ষেপও গৃহীত হয়েছিল।

(খ) দ্রুত ফলাফল উৎপাদনে এসব পদক্ষেপের ব্যর্থতা। জেলা সদরদপ্তর থেকে তালুক সদরদপ্তরে ভরকেন্দ্র সরিয়ে নেয়ার আইডিয়া করেছিলেন শেখ মুজিব, সেটার ভিত্তি ছিল তার এই আশা যে শহর থেকে গ্রামে ভরকেন্দ্র সরে যাবে। এই মহৎ আশা অপূর্ণ রয়ে গেছে, যেহেতু শহুরে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীরা, প্রকৃত অর্থে সমগ্র অভিজাত শ্রেণী, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

(গ) জরুরি অবস্থা পরবর্তী পদক্ষেপও ছিল অকার্যকর এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর থেকে ভার সরানোর জন্য মুজিব সরকার কিছুই করেনি। পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে মুজিবের সামর্থ্য আছে কিনা সেটা নিয়েও দেখা দিয়েছিল গভীর সংশয়।

(ঘ) এই অপেক্ষাকৃত নরম প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ঘটনায় ভয়ঙ্কর অসন্তোষে পরিণত হয়েছিল যখন সাধারণ নিরপেক্ষ নাগরিকদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করেছিল ক্ষমতাধর বাহিনীগুলো। রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ব্যাপক জনসাধারণের বিরুদ্ধে মুজিবের সশস্ত্রবাহিনীর নির্যাতন অসন্তোষ উস্কে দিয়েছিল।

(ঙ) বহুদিনের ভারতবিরোধী মনোভাব কোনও ভাবেই নিরুৎসাহিত করতে পারেননি মুজিব। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সফর মুসলিমপন্থী গ্রুপগুলোকে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিল। মুজিব ইঙ্গিতটা গ্রহণ করেননি। (ভুট্টো ও পাকিস্তান হয়তো বা খোঁটা, যেখানে মুজিববিরোধী গ্রুপগুলো তাদের কোট ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। পাকিস্তান খুব সহজেই তার প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারত।)

(চ) যেসব গ্রুপ সরকার পরিবর্তনে আগ্রহী হতে পারে সেগুলো হচ্ছে:

(১) পেশাদার বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিশেষ করে যেসব যুদ্ধবন্দী পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেছে ভুট্টো ও বর্তমান পাকিস্তান সরকারের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে, কেননা তাদের সঙ্গে সেখানে ভাল আচরণ করা হয়েছিল।

(২) মুক্তি বাহিনী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দুর্নীতির বহর দেখে যাদের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

(৩) সাচ্চা আদর্শবাদ ও অসহিষ্ণুতা স্বভাবতই এই দুই বেপরোয়া গ্রুপকে সাময়িক জোট গঠনে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে।

(৪) মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে হিন্দু ভারত ও পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই আবেগে কিছু পরিমাণ অর্থনৈতিক শক্তি জুগিয়েছিল আবু ধাবির দেয়া ঋণ। সহজ কথায়, লাভজনক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল ধর্ম।

বৈদেশিক ফ্যাক্টর:

বাংলাদেশের ভিতরে যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে যার ফলে একটা অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে উঠেছিল, কোনও সন্দেহ নেই তাতে আরও উৎসাহ ও উস্কানি দেয়া হয়েছিল বিদেশ থেকে, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে। এটা মনে করা হয়েছিল যে এই ঘটনা ঘটতে পারত শুধুমাত্র যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশ-পাকিস্তানি মিশ্র জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে। বস্তুত, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাকিস্তানপন্থী মুজিববিরোধী সুসংগঠিত আন্দোলন বিদ্যমান রয়েছে বলে বহুদিন থেকেই জানা। পাকিস্তানি এজেন্টরা সক্রিয় ছিল লন্ডনে। বাংলাদেশ যতদূর অবগত, আসল অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি, সংবাদবাহকের ব্যবস্থা ইত্যাদি ষড়যন্ত্রমূলক কাজে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে অবশ্যই জড়িত ছিল যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী মুজিববিরোধী বাংলাদেশী আমলা ও সেনা কর্মকর্তারা। অল্প যে কয়েকটা রিপোর্ট আমাদের হাতে আছে তাতে আভাস মেলে, আসল অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল তরুণ সেনা কর্মকর্তারা। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা, বিশেষ করে কুয়েতে বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওয়াসিউদ্দীন, হয়তো জড়িত ছিলেন, কিন্তু চক্রান্তের পিছনে তাদের মস্তিষ্ক কাজ করেছে এমন কথা বলা যাবে না। এসব ঘটনায় স্বার্থের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জড়িত হওয়ার প্রয়োজনও দেখা যায় না। মজবুত প্রমাণ যেহেতু নেই, তাই এর দায়

বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। একই সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা উচিৎ যে ঢাকায় নিযুক্ত নেপালী উপরাষ্ট্রদূত একজন পাকিস্তানপন্থী। যোগাযোগের দিক থেকে তিনিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকতে পারেন। যেহেতু পাকিস্তান বা চীন সশরীরে উপস্থিত ছিল না ঢাকায়, সুতরাং বাংলাদেশে তাদের এজেন্সিগুলো সশরীরে হস্তক্ষেপ করেছে এমন উপসংহারও আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। সহানুভূতি আর আসল ষড়যন্ত্রের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে দুনিয়ায়।

গুপ্তচরদের যা বিমূঢ় করেছিল সেটা ছিল সময়নির্ধারণ: ১৫ই অগাস্ট তারিখটাকে বেছে নেয়া হয়েছিল সেদিন ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো অসতর্ক থাকার কারণে। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে দিনটাকে বেছে নেয়া হয়েছিল সেটা শুক্রবার ছিল বলে, কারণ তাতে মুসলিমদের আবেগ কাজে লাগান যেত। ১২ই অগাস্ট অজ্ঞাতনামা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির লন্ডন থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনও ছিল বিবেচনার বিষয়: অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল কি বিদেশের মাটিতে আর পাকিস্তান কি বিষয়টা জানত?

এমইএ মনে করেছিল ভারতের সন্ত্রস্ত হওয়া উচিৎ নয় এবং সরকারকে অবশ্যই 'স্বাভাবিক কাজকর্ম' চালিয়ে যেতে হবে। একটা নোটে এমইএ জানায়:

> *আমাদের ধরে নেয়া উচিৎ যে গোপনে ভারতবিরোধী নয় এমন ব্যক্তি আমাদের পক্ষে এবং বিপরীতটা নয়। বাংলাদেশী আমলা ও রাজনীতিকরা যা ধারণ করে না সেই রকম সদ্গুণ তাদের ওপর আরোপের ক্ষেত্রে কপটতার ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সতর্ক থাকতে হবে। পাকিস্তানিরা এখন এটাই করছে। আমাদের ধরে নেয়া উচিৎ যে বাংলাদেশের জনগণ আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অব্যাহত রাখবে আর আমাদের পক্ষে থাকবে যদি তাদের বড় বড় অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘোচান যায়।*

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে যখন ভারতীয়রা আলোচনা করছিল এবং খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারকে ত্রাণ সরবরাহের বিষয়টি নিয়ে এমইএ বিতর্ক করছিল, সেই সময় ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ফের আরেকটি অভ্যুত্থানে অপসারিত হন মোশতাক। এবার

অভ্যুত্থান সংগঠন করেন প্রভাবশালী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। খালেদের অ্যাকশন সম্পর্কে নানারকম গল্প থাকলেও সবচেয়ে প্রচলিত কথাটি ছিল এই যে তিনি মুজিবের মৃত্যুতে ব্যথিত ছিলেন। জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করেন খালেদ। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের পরিণতিতে আরও একটি অভ্যুত্থান ঘটে ১৯৭৫ সালের ৬–৭ নভেম্বর রাতে। আবু তাহেরের নেতৃত্বে একটি সেনা ইউনিট খালেদকে ক্ষমতাচ্যুত ও জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করে। একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। চিফ জাস্টিস আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম হন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, তার ডেপুটি হন জিয়া।

জয়েন্ট সেক্রেটারি স্তরের ইন্টেলিজেন্স অফিসার এন. এফ. সান্টুক ১৯৭৭ সালে র-এর প্রধান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার একটা নোটে। সান্টুক মনে করতেন, ইসলামী পরিচয়ের ব্যাপারে সাধারণ একটা ঝোঁক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের। এ ব্যাপারে তাদের ছায়া দিত 'ইসলামপসন্দ্' (ইসলামপ্রেমী) দলগুলো, যেমন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি। সান্টুক বলেন, বাংলাদেশের জনগণের মনে এটা কাজ করত যে শেখ মুজিবের সরকারের সঙ্গে ভারতের যোগ আছে এবং ওই সরকারের ব্যর্থতা ও অজনপ্রিয়তার ফলস্বরূপ ভারতও তাদের কাছে অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৭৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে যথার্থ পারম্পর্য তুলে ধরতে একটা নোট তৈরি করেন।

> *বাংলাদেশের অর্থনীতি অচল এবং আগামী পাঁচ বছরে বা ওই রকম সময়ের মধ্যে তা পুনরুদ্ধার করা সুদূর পরাহত। এর ফলে বাংলাদেশকে বাইরের অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, যা সে তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলো বা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করতে পারে। এই সমস্ত ফ্যাক্টর থেকে ভারতবিরোধী অনুভূতির একটা নির্দিষ্ট অন্তঃস্রোত উৎপন্ন হতে পারে, যার সঙ্গে যোগ রয়েছে অনেকের মনের এই ধারণা যে তাদের বিষয়টা নিয়ে মুসলিম বিশ্ব ও আমেরিকা উভয়ের কাছেই ওকালতি করার প্রয়োজনীয় ভূমিকাটা নিতে পারে পাকিস্তান। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বলতে গেলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দূর করাই হবে নতুন প্রশাসনের প্রথম বিবেচ্য। এখানে আবার বলতে হয়, সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে এক কাতারে দাঁড় করাতে এবং জাতীয়তাবাদের ওজস্বিতা জাগিয়ে তুলতে প্রশাসনের সুবিধাজনক*

হাতিয়ার হতে পরে একটা বাইরের হুমকির ছায়ামূর্তি। এটা আবারও কাজ করবে ভারতের অসুবিধাজনক অবস্থানের দরুণ, যেহেতু বাইরের হস্তক্ষেপ ওদিক থেকেই আসতে পারে বলে তাদের মনে আশঙ্কা থাকবে, এর কারণ হল ভারতের সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্য। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার কাঠামো যতদূর পর্যন্ত অবহিত, আজকের বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী সম্ভবত সবচেয়ে সংযোগশীল ও কার্যকর সংগঠন এবং তারা দেশের নিয়ন্ত্রণে থাকার চেষ্টা করবে বেসামরিক প্রশাসনের অগ্রভাগে থেকে কিংবা বেসামরিক প্রশাসনকে ছাড়াই। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে পাকিস্তানপন্থী পুনর্বাসিত ও জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন মূলগতভাবে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জিয়া এখনও পর্যন্ত তার জনপ্রিয়তার তুরুপের তাসটি ফলপ্রসূভাবে খেলেছেন অন্যান্য পদাধিকারীর সঙ্গে এবং ক্ষমতার হাল ধরার সুযোগ রয়েছে এমন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে সম্ভাব্য বিরোধীদের উপড়ে ফেলতে শুরু করেছেন। প্রথম ও তৃতীয় অভ্যুত্থানের পরিণতি স্বরূপ বিপুলসংখ্যক জ্যেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার অপসারিত হওয়ায় তাকে ব্যাক আপ করার মত খুব সামান্যসংখ্যক সিনিয়র অফিসারই অবশিষ্ট আছেন।

**প্রতিরোধ শক্তি**

ভারতীয় গুপ্তচররা জানত যে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাহিনীর হাতে। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হল মুজিব বাহিনী। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু ধীরে ধীরে জনসমর্থন হারাচ্ছিল এই বাহিনী। মুজিবের দর্শন ও লক্ষ্য–ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, জোট-নিরপক্ষেতা ও ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক–আবেদন হারিয়ে ফেলেছিল। র খুব ছোট পরিসরে কার্যক্রম শুরু করেছিল ঢাকায়। সংস্থাটি জানায়, ছাত্রদের মধ্যে মুজিব বাহিনীর কিছু সমর্থন ছিল, বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে, কিন্তু তাদের উগ্র তৎপরতা সেই স্তরে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল যা প্রশাসনের জন্য গুরুতর সমস্যার কারণ হতে পারে।

আবদুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কাদের বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এই কাদের বাহিনী অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে ছিল সবচেয়ে সক্রিয় উগ্র গোষ্ঠী। অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব ছিল দৃশ্যত জিয়াউর রহমানের হাতে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে অপারেশন চালাতে যদি স্থানীয়দের সমর্থন লাগে, সে জন্য নিজের শক্তি যাচাই করেছিল র। যাই হোক, কাদের বাহিনীর

অভিযানের কার্যকর পরিবেশ সীমাবদ্ধ ছিল ময়মনসিংহ অঞ্চলে এবং কিছুটা বিক্ষিপ্ত ভাবে পাবনা ও বগুড়া জেলায়। কাদের বাহিনীর শক্তিও ছিল সীমিত; এতে সশস্ত্র গেরিলার সংখ্যা ছিল এক থেকে তিন হাজার। র-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়:

> *তাদের অভিযানের সাধারণ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, বর্তমানে যেভাবে তারা সংগঠিত, তাদের সেই অস্ত্রপাতি বা প্রশিক্ষণ নেই যার সাহায্যে বাংলাদেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর কার্যকর মোকাবেলা করতে পারে। বরং উৎপাত চালিয়ে যাওয়ার একটা ভ্যালু রয়েছে তাদের। অতএব যেকোনও প্রকার গণবিদ্রোহের উপকরণ হিসেবে কাদের সিদ্দিকীর উপযোগিতা অত্যন্ত সীমিত রয়ে যাবে যতক্ষণ না জাতীয় পর্যায়ে একটা রাজনৈতিক বিরোধী দল গঠিত হচ্ছে যার সঙ্গে এই মিলিট্যান্ট গ্রুপ সংযুক্ত থাকবে। আরেকটা গ্রুপ ছিল মেজর জিয়ার, তৃতীয় অভ্যুত্থানের পর এর উত্থান, কিন্তু এই গ্রুপ প্রধানত সুন্দরবন অঞ্চলে সক্রিয়। মূলত প্রায় সত্তুরজন পলাতককে নিয়ে এই গ্রুপ গঠিত, তারা সম্ভবত অতিমাত্রায় খোলাখুলিভাবে সমর্থন দিয়েছিল খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে এবং প্রতিশোধের আশঙ্কায় সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের পূর্ণবিকাশের সংক্ষিপ্ত সময়কালে তাদের কর্মকাণ্ডকে মূলত জলদস্যুদের কাজ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ বা অঙ্গীকার দেখাতে পারেনি তারা। সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত বনবিভাগের বিচ্ছিন্ন কার্যালয়ে ও নৌযানে তারা ছুটকো হামলা চালানোয় জড়িত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি সমন্বিত অভিযানে–যেটির সাংকেতিক নাম ছিল অপারেশন পাইথন–ওই দলের পঞ্চাশজনের মত হয় বন্দী হয়েছে অথবা আত্মসমর্পণ করেছে। এটা সম্ভব যে এই দলের অবশিষ্টরা কাদের বাহিনীর মত প্রতিষ্ঠিত কোনও গ্রুপের ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করতে পারে, নতুবা তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের নেতা অন্তত বর্তমান প্রশাসনের কাছ থেকে কোনও রকম করুণা আশা করতে পারবে না। যাই হোক, একটা কার্যকর ফাইটিং ফোর্স হিসেবে এই দল সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে সমন্বিত অভিযানে এবং অবশিষ্ট পথভ্রষ্টদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে কাজে লাগান হচ্ছে পুলিশ বাহিনীকে। প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে আরেকটি মিলিট্যান্ট গ্রুপ শান্তি বাহিনী, চাকমা স্বায়ত্ত্বশাসন আন্দোলন জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা এটি। স্বায়ত্ত্বশাসন ও তাদের প্রথাগত*

*অধিকার সুরক্ষার দাবিতে এই গ্রুপ শেখ মুজিব সরকারেরও বিরোধী ছিল। ১৫ই অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর থেকে তাদের তৎপরতার মাত্রা বাড়েনি, তবে সময়ে সময়ে রিপোর্ট পাওয়া গেছে রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং বাড়িয়েছে তারা এবং বিদ্রোহীদের ওপর মনোযোগ জোরদার করেছে। যদি সন্তোষজনক মাত্রার স্বায়ত্বশাসন এবং অ-উপজাতিদের শোষণের বিরুদ্ধে নিশ্চিত সুরক্ষা প্রদান করা হয় তাহলে এই আন্দোলন সম্ভবত ব্যর্থ হয়ে যাবে। যাই হোক না কেন, শান্তি বাহিনীর কর্মকাণ্ডের রয়েছে সীমিত উপজাতীয় আবেদন এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব সামান্য। তাদেরও কর্মকাণ্ড ও সামর্থ্যের সুযোগ সীমিত এবং ওই অঞ্চলে মোতায়েন সেনাবাহিনীর দ্বারাই তা দমন করা যেতে পারে। চাকমা বিদ্রোহ মোকাবেলার জন্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক ৬৫ ব্রিগেড সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে।*

ভারতীয়রা জানত যে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ অভ্যুত্থানের পরপরই একটা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেননা টিকে যাওয়া অসংখ্য নেতা পক্ষ ত্যাগ করে নিজেদের প্রয়োজনে নতুন সরকারের সমর্থক বনে গিয়েছিল। শেখ মুজিবের সরকারের শেষ বছরগুলোয় আওয়ামী লীগ যথেষ্ট নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল, কারণ দলটির বেশির ভাগ অগ্রণী নেতা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্বাধীনতার আনন্দ-চঞ্চল অবস্থা টিকে ছিল মাত্র একটি বছর; পরবর্তী তিন বছর এই দলের ব্যাপারে মোহমুক্তি বেড়ে চলেছিল প্রায় ৮৫ শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে। কেবল শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব আর জাতির পিতা হিসেবে ক্যারিসমা এই মোহমুক্তিকে অকল্পনীয় পরিমাণে বেড়ে যাওয়া থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিল তার জীবদ্দশায়। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী সমাজও সম্ভবত শেখ মুজিব সরকারের প্রদত্ত স্থিতিশীলতা অনুভব করতে পারেনি, তার সরকারের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদেরও মোহমুক্তি ঘটেছিল। আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও এটা ছিল সমানভাবে সত্য। সেরা আমলারা হতাশ ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন শেখের রাজনৈতিক সমর্থকদের অবিরাম হস্তক্ষেপে এবং তাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আস্থাহীনতার কারণে। শেখের সরকারের আমলে অর্থনৈতিক পতন আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, ত্রাণসামগ্রী বিতরণে অদক্ষতা এবং জনগণের দুর্দশা লাঘবে সরকারের কোনও প্রকার বাস্তব প্রচেষ্টার অভাবের কারণেও দেশটির কৃষক-শ্রমিকদের মোহভঙ্গ ঘটেছিল মুজিব ও আওয়ামী লীগের ব্যাপারে।

বাংলাদেশে যেসব ঘটনা উন্মোচিত হচ্ছিল তাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিলেন র প্রধান আর. এন. কাও। অবিচক্ষণভাবে বাংলাদেশের ঘটনাবলী সামলানোর ব্যাপারে এমইএর ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট ছিলেন তিনি। এই দেশটির জন্ম হয়েছে র-এর ব্যাপক অবদানে আর এখন সেখানে ভারতের প্রভাব বিনাশ হতে চলেছে। কোথায় ভুল হয়েছে তার সঠিক ও বাস্তব মূল্যায়ন সন্ধান করছিলেন কাও। একজন অদমনীয় ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স গুরু হিসেবে তার ক্যারিয়ার তখনও অটুট ছিল এবং তার টিম বিস্ময়কর কাজ করেছিল ১৯৭১ সালে। সুতরাং ছদ্মবেশী যোদ্ধারা বাংলাদেশের মাটি ত্যাগ করার পর যা ঘটেছিল তা ছিল ভারতীয় কূটনীতিকদের জন্য জেগে ওঠার ডাক।

## কূটনীতিকদের অনৈপুণ্য

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল যোগ্য কুটনীতিক নির্বাচন করা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরও মজবুত করা। অভ্যুত্থান দেখিয়েছিল যে এমইএ ভুল জিনিসটা বেছে নিয়েছিল। ভারতীয় শাসকমহল যদিও জানত যে একটা রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের পর সেটা উচ্চচাপযুক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের ঝঞ্ঝাকেন্দ্রে পরিণত হবে, তা সত্ত্বেও ভারতের হাই কমিশনার হিসেবে ঢাকায় পাঠান হয়েছিল সুবিমল দত্ত নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে, অথচ অপেক্ষাকৃত তরুণ ও করিৎকর্মা কোনও ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি নিজের লো প্রোফাইল বজায় রেখেই সেখানকার চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি সম্ভবত কার্যকরভাবে সামলাতে পারতেন। কূটনীতিকদের ব্যর্থতা বিষয়ক একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে:

> *ভারতীয় কূটনীতিক মিশনে দুই ব্যক্তি ছিলেন যারা হাই কমিশনে তৃতীয় ও চতুর্থ পজিশন ধারণ করছিলেন, যাদের সিপিআইপন্থী ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সুপরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই শাসক দল আওয়ামী লীগের চেয়ে ন্যাপ ও সিপিবির সঙ্গে তাদের বেশি বন্ধুত্ব ছিল, আর এভাবেই বাংলাদেশে সরকারের উচ্চ মহল ও শাসক দলের মধ্যে প্রচুর ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। এতে ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন করে সন্দেহ জেগেছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরই মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স-এর বাংলাদেশ বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রতি ভীষণ*

সর্বনাশা মনোভাব দেখিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক খারাপ থেকে আরও খারাপে পর্যবসিত হবে এবং এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত দিল্লির ব্যক্তিটি যদি সবরকম কল্পনা আর চালনা বাদ দিতেন, তাহলে কেউ ঢাকায় ভাল ফলাফল আশা করতে পারত না। দিল্লি ও ঢাকায় ভারতীয় কূটনীতিকদের সাধারণ মনোভাব ছিল এই রকম: 'আমরা বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট করেছি। এবার তাদের পালা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা আর 'সুন্দর আচরণ' করা। এ ছাড়াও ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের বিবেচনায় বিশাল সুবিধা রয়েছে আমাদের। তারা যদি খারাপ আচরণ বেছে নেয়, তাহলে আমরা তাদের ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বেশি কিছু আর করার নেই।' অসংখ্য বিষয় বিবেচনায় নেয়ার কী রকম ভুল আর আত্মসন্তুষ্ট মনোভাব ছিল এটা, যখন অন্য বিদেশী শক্তিগুলো অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে কাজ করছিল সেখানে। ভারতীয় সেনারা কারখানাগুলো খুলে ভারতে নিয়ে যাচ্ছে বলে বাংলাদেশে অতিরঞ্জিত প্রচারণা থাকলেও এটা জানা কথা যে আসলে এ কাজ করা হয়েছিল মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও সক্রিয় সম্মতিতে। স্বাধীনতার পরপরই ভারত থেকে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিপুল পরিমাণ মালামাল চোরাচালান শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ও ভারতীয় অংশের নিরাপত্তা রক্ষীদের সক্রিয় মদদে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চোরাচালান চালাচ্ছিল। এ নিয়ে বাংলাদেশে প্রচুর শোরগোল হয়েছিল এবং এটা বন্ধ করতে সম্ভবত কিছু বিক্ষিপ্ত চেষ্টা করা হয়েছিল ভারতীয় পক্ষের ওপর, কিন্তু ফল মিলেছিল সামান্যই। চোরাচালানের কথা অস্বীকার করে ভারতীয় হাই কমিশন থেকে যেসব প্রেস রিলিজ দেয়া হয়েছিল সেগুলো ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিল বাংলাদেশের জনগণের কাছে। এতে ভারতীয় হাই কমিশনার ও তার সহকর্মীদের মর্যাদা নিচে নেমে গিয়েছিল। এ কথা সত্য যে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের এমন দীর্ঘ সীমান্তে কার্যকরভাবে চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সীমান্তের উভয় দিকেই প্রশাসন ও রাজনীতিকদের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ চোরাকারবারীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি করেছিল। এটা কেবল অর্থনীতির ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল তাই নয়, বাংলাদেশের রাজনীতিতেও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর প্রভাব ফেলেছিল। সহজে অর্থলাভের প্রলোভনে দূষিত হয়ে পড়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ

অংশ, জনমানসে দলটির ভাবমূর্তি কালো হয়ে গিয়েছিল। স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এসটিসিআই) যখন বাংলাদেশে ধুতি ও শাড়ি পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছিল তখন আরও বড় কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ তারা পাঠিয়েছিল বিপুল পরিমাণ বাতিল মাল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে এটা ছিল একটা আঘাত।

বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা ছিল দেশটির ভারতপন্থীদের প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা। ভারতীয় কূটনীতিকরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে এর কারণ বাংলাদেশে ওই ধরনের ভারতপন্থী কোনও অংশ ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টে বলা হয়:

> *এটা হবে ভুল বিবৃতি। আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে বিভিন্ন কারণে–রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আবেগগত–বাংলাদেশে জনগণের বড় একটা অংশ রয়েছে যারা দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ভারতীয় কূটনীতির নিছক উদাসীনতার কারণে এই অংশটির সংহতি নষ্ট হয়েছে। অচিরেই একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে যে ভারত তাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এটা সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে, কারণ যখন ভারতবিরোধী অনুভূতি বাড়তে ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল, তখন ভারতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হওয়াটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদজনক, সুতরাং তারা যে ভারতপন্থী ছিল সেটা জাহির করার ঝুঁকি নেয়ার চেষ্টা তারা করেনি। ভারত যদি তাদের প্রতি আগ্রহী না হয় তাহলে কেন তারা সে চেষ্টা করবে? এর সর্বনাশা ফল হল, এখন যখন বাংলাদেশ চরম বিভ্রান্তি আর তীব্র সংঘাতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, আর বিদেশী শক্তিগুলো এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে, তখন ভারত এমন কোনও প্রকৃত বন্ধু পাচ্ছে না যার সেখানে ঘটনাবলীর ওপর কার্যকর প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আছে। এটা সত্যি যে প্রধানত নিজেদের স্বার্থে কতিপয় বাংলাদেশী ভারতের দিকে ভিড়তে পারে, কিন্তু সেটাকে এমন সদিচ্ছার উদ্যোগ বলে মনে করা যাবে না যেটা ভারতের প্রতি বাংলাদেশের রয়েছে। এখন, বাংলাদেশের ওপর ভারতের কোনও দৃশ্যমান ও কার্যকর প্রভাব নেই। এই অঞ্চলে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এটা সাংঘাতিক এক বিপর্যয়।*

### হারানো দেশ পুনরুদ্ধারের প্লট

বাংলাদেশে হারানো ভূমি কীভাবে পুনরুদ্ধার করা যায় তা নিয়ে কূটনৈতিক ও গোয়েন্দা মহলে তীব্র বিতর্ক হয়েছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আগাগোড়া পুনর্মূল্যায়ন করার দরকার হয়ে পড়েছিল এবং বাংলাদেশের জন্য সরকারকে একটা দীর্ঘমেয়াদী বিদেশনীতি গ্রহণ করতে হত যা বাস্তবায়নের জন্য দরকার ছিল কার্যকর ও দক্ষ মেশিনারি। যেসব শীর্ষ কর্মকর্তা ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নীলনকশা প্রণয়নের আগে বাংলাদেশের মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাক্টরগুলো বিশ্লেষণ করেছিলেন, তারা উল্লেখ করেন যে স্বাধীনতার আগে প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশীদের মধ্যে ভারতবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী তীব্র প্রচারণা চালান হয়েছিল যখন দেশটি ছিল পাকিস্তানের অংশ। কর্মকর্তারা যুক্তি দেখান যে এই বিষয়টার কিছু অবশেষ বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমানের অবচেতন মনে রয়ে গেছে নিশ্চয়, যেহেতু পৃথক দেশ হিসেবে অভ্যুদয়ের আগে বহু বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের জনসমাজের মধ্যে খুব সামান্যই যোগাযোগ ছিল। একটা নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশীরা নিজেদের নতুন পরিচয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিল। একই সঙ্গে তারা ভারতের ব্যাপারে স্পর্শকাতর ও উদ্বিগ্ন, যে ভারত তাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বিপুল পরিমাণ সহযোগিতা প্রদান করেছিল। একটা স্বাভাবিক হীনমন্যতার বোধ ছিল। এটা নতুন কিছু নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমেরিকানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পশ্চিম ইউরোপে যতখানি অজনপ্রিয় হয়েছিল ততখানি অজনপ্রিয় আর কখনও ছিল না, যখন তারা তাদের লোকদের যুদ্ধে পাঠিয়েছিল এবং কয়েক বছর পর যখন তারা কোটি কোটি ডলার ঢেলেছিল যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপে।

ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল যে ভারতকে অবশ্যই পরিপক্ক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে যা বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় ব্যক্তিদের আচরণে প্রতিভাত হওয়া প্রয়োজন। মুজিব নিহত হওয়ার পর ভারতীয় কর্মকর্তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল এই যে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, এতে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং মুজিব-পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য একটা ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা সরকারী নোটে বলা হয়:

> *মনোভাব হওয়া উচিৎ এমন যে বাংলাদেশে আমরা যা করেছি তা আমাদের স্বার্থেই করেছি, পাশাপাশি দৈবক্রমে তা মিলে গেছে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের সঙ্গে। বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতির*

*সাফল্যের জন্য পারস্পরিক স্বার্থ ভাগাভাগি ও সমতার মনোভাব অতি অপরিহার্য। এই কারণে যারা আনুষ্ঠানিক ও অনানষ্ঠানিক পর্যায়ে এসব নীতি বাস্তবায়ন করবেন সেইসব ব্যক্তিদের বাছাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।*

কর্মকর্তারা মনে করতেন, বাংলাদেশের সমস্যায় ভারতীয় কূটনীতিকদের হাতে থাকা যাবতীয় শক্তি, মেশিনারি ও কন্ট্যাক্টের দরকার। বাংলাদেশ বিষয়ক নতুন পলিসির ব্যাপারে তারা নির্দিষ্ট পূর্বশর্ত নিয়েও আলোচনা করেছিলেন। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, কারণ দেশটি চীন-পাকিস্তান যৌথ অপারেশনের বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার সবরকম সম্ভাবনা ছিল, এতে মদদ জোগাত যুক্তরাষ্ট্র, যার ফলে ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যেত কয়েক বছরের মধ্যেই। বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়ার অর্থ ছিল এতে আরও বিপুল সংখ্যক লোকের সংশ্লিষ্টতা এবং বিপুল পরিমাণ আর্থিক ব্যয়। অধিকন্তু, বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে যারা কাজ করছিল তাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতীয় কর্মকর্তারা, যাতে জানতে পারা যায় যে নতুন পরিস্থিতি সামলানোর সামর্থ্য তাদের ছিল কিনা। শুধু অভিজ্ঞতা আর কর্মদক্ষতাই যথেষ্ট নয়, মনে করতেন কর্মকর্তারা। বাংলাদেশে নিযুক্ত কূটনীতিকদের যথাযথ মোটিভেশনও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত বেসরকারী লোকজনকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেত।

বাংলাদেশের জন্য ভারতের ছিল চারটি প্রধান লক্ষ্য, আগ্রাসী আমলাতন্ত্রের সহযোগিতায় যা অর্জন করা যেত:

১) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিমণ্ডলে ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ড চালানোর ঘাঁটি হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহারকারী ভারতবিরোধী বিদেশী শক্তিগুলোকে প্রতিহত করা।

২) বাংলাদেশে এমন পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা যে পরিস্থিতির ফলে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়।

৩) ঢাকায় একটা বন্ধুভাবাপন্ন সরকারকে পাওয়া।

৪) যত বেশি সম্ভব পারস্পরিক সুবিধাজনক সংযোগ স্থাপন করা এবং বাংলাদেশকে উত্তরোত্তর বেশি করে ভারতের সঙ্গে জড়িত করা।

মুজিব-পরবর্তী যুগে চীনা, পাকিস্তানি ও মার্কিন অনুপ্রবেশের ব্যাপারে চিন্তা করার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নিজের বন্ধন নিয়েও ভেবেছিল ভারত, বিশেষ করে যেখানে বাংলাদেশের বিষয় জড়িত ছিল। কর্তৃপক্ষের ভিতরে সর্বসম্মত অনুভব ছিল এই রকম যে বাংলাদেশে বড় ধরনের কোনও কিছু করার সোভিয়েত সামর্থ্য ছিল সীমিত। অন্য দিকে, বাংলাদেশে বড় সংখ্যায় সোভিয়েত উপস্থিতির ফলে ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারত। ইন্টেলিজেন্স অফিসার ও কূটনীতিকদের করা একটা নোটে বলা হয়:

> *বাংলাদেশকে যতদূর সম্ভব উপমহাদেশীয় অথবা দক্ষিণ এশীয় বিষয় হিসেবে রাখায় আমাদের আগ্রহী হওয়া উচিৎ। এটা অর্জন করা সম্ভব হবে না যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতও অধিক মাত্রায় চিহ্নিত হয়ে পড়ে বাংলাদেশে। ওই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ভারতীয় সামর্থ্য পুরোপুরি অচল হয়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে বাংলাদেশে বাদ্য বাজাতে হবে দ্বিতীয় স্তরে এবং তাদের সঙ্গে সমঝোতা যাই হোক তা প্রকাশ্যে রূপায়িত করা যাবে না। অল্প সংখ্যক লোকজন যারা আদর্শগতভাবে পাকিস্তান, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ তারা ছাড়া এটা মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাদের দেশটাকে বৃহৎ শক্তিগুলোর যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত হতে এবং আবারও বিপর্যস্ত হতে দেখতে চায় না। এই শঙ্কাটিকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু ফলপ্রসূভাবে এটা করা যাবে না যদি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতও অতিমাত্রায় চিহ্নিত হয়ে পড়ে বাংলাদেশে। একই সঙ্গে এতে অবশ্যই জোর দিতে হবে যে এই পলিসি সফল হবে না যদি ভারতের দিক থেকে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতার সামান্যতম ইঙ্গিতও থাকে। ঢাকায় ভারতীয় কূটনীতির অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা হতে হবে এটা যে, ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা যে সন্দেহ ও শঙ্কা অনুভব করে তা দূর করা। এই সন্দেহ দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত কৌশল অবলম্বন করতে হবে। অধিকন্তু, মনে রাখতে হবে যে, ঢাকায় ভারতীয় কূটনীতির কাজ করতে হবে উচ্চতর রাজনৈতিক আবহে। সুতরাং এটা সেই ধরনের কাজ নয় যা সাধারণভাবে কূটনীতিকরা করে থাকেন কার্যকরভাবে। গভীরভাবে রাজনীতি সচেতন কূটনীতিক কিংবা প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক দক্ষতাসম্পন্ন রাজনীতিকরা এই চ্যালেঞ্জিং কাজ করতে পারেন প্রকৃত অর্থে।*

গুপ্তচর সংস্থাটির আরও কিছু পরামর্শ ছিল, যেমন দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশী ছোট ছোট শহরগুলোর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রের প্রভাবশালী নেতাদের ভারতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা, যাতে তারা একটা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ দেখতে পায় যেখানে মুসলমানরা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে, ফলে তারা ফিরে গিয়ে ভারতবিরোধী প্রচারণার প্রতিবাদ করতে পারবে। গুপ্তচর মহল অনুভব করেছিল যে সিনেমা, থিয়েটার, সঙ্গীত ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করে বাংলাদেশে 'সাংস্কৃতিক দখল' অভিযানের জন্য ইতোমধ্যেই যথেষ্ট ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য ক্ষতি এড়াতে র পরামর্শ দিয়েছিল, ইন্দিরা সরকার যেন বাংলাদেশের শাসকদের হুশিয়ার করে দিয়ে জানায় যে সংখ্যালঘু হিন্দুরা ভারতে দেশান্তরিত হলে সেটাকে অবন্ধুসুলভ ও শত্রুতামূলক আচরণ বলে বিবেচনা করা হবে। সংস্থাটি মনে করেছিল, ঢাকার যেকোনও সরকারের ওপর এ ধরনের হুশিয়ারি যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। ১৯৭১ সালে ভারতের সক্রিয় সামরিক অভিযানের অবিশ্বাস্য স্মৃতির ফলে তাদের এ ধারণা হয়েছিল, যে অভিযানের সাহায্যে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ।

### ভগ্নহৃদয় গুপ্তচররা

কলকাতা নগরকেন্দ্রের সর্পিল গলি থেকে বাংলাদেশের জন্ম দেখেছিলেন বলদেব কৃষ্ণ। সে সময় তিনি ছিলেন র-এর একজন তরুণ গুপ্তচর। তার মনে আছে, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তখন কলকাতার রাস্তায় উদযাপনের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। যদিও ভারতের পদক্ষেপ ছিল ইন্দিরা গান্ধী সরকারের দিক থেকে এক ধরনের পলিটিক্যাল অ্যাডভেঞ্চারিজম, তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীকে হতাশ করেনি র। সেনাবাহিনীর সাহায্যে একটা নতুন দেশ মুক্ত করার মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক স্পাই এজেন্সি ছায়াবিশ্বে নিজের আগমন ঘোষণা করেছিল।

১৯৭০ সালে কলকাতার একটা সেফ হাউজ থেকে অপারেশন শুরু করেছিলেন কৃষ্ণ, একটা ভুয়া এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট কোম্পানি ছিল তার প্রটেক্টিভ কভার। 'আমি ভেবেছিলাম আমরা অদৃশ্য, কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোয় কূটনীতিকরা তালগোল পাকিয়ে ফেলায় আমরা অরক্ষিত হয়ে পড়েছিলাম। আর এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল যে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারত,' তিনি বলেছিলেন আমাকে।

উদ্বিগ্ন কৃষ্ণ দিল্লিতে উড়ে গিয়েছিলেন ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে, তার বস আর. এন. কাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। র প্রধান নিজের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে পাকিস্তান ও চীন স্থিরতার সঙ্গে বাংলাদেশী সরকারের ভিতরে অনুপ্রবেশ করছে এবং প্রশাসনের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভারতীয় প্রভাব তখনও যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে এবং এই ব্যাপারে তিনি উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

'লেফটেন্যান্ট জেনারেল গোলাম জিলানী খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) বাংলাদেশে নতুন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করার আগেই সমন্বিত অ্যাকশন নেয়ার প্রয়োজন ছিল। সর্বোপরি, আশঙ্কা ছিল যে পাকিস্তান অচিরেই বাংলাদেশী জীবনের সর্বত্র প্রবেশ করতে পারে আর ভারতকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক মূল্য দিতে হবে। একটা গুরুতর হুমকির ব্যাপারে কাও একমত ছিলেন যে হুমকি উপেক্ষা করতে পারত না স্পাই এজেন্সিটার কেউ,' কৃষ্ণ স্মরণ করেন।

র কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের হুমকি বিশ্লেষণ করে একটি নোট তৈরি করে এবং সে হুমকি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। 'বাংলাদেশের সমগ্র উপকূল ও স্থল সীমান্ত অঞ্চলে নতুন ইনফর্মার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। নির্ভুল গোয়েন্দা তথ্য আহরণের জন্য আমরা বাংলাদেশে তৎপর বিভিন্ন ভারতীয় সরকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডের নিবিড় সমন্বয় নিশ্চিত করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যাতে তাদের অফিসগুলো লিসেনিং পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যায়,' কৃষ্ণ খোলাখুলি বলেন এ কথা।

বাংলাদেশ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্যে জানা গিয়েছিল, ঢাকায় দূতাবাস খোলার পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান এবং সম্ভবত বড় পন্থায় কার্যক্রম চালাবে বাংলাদেশে। পাকিস্তানি মিশনের লোকবল একশো থেকে দেড়শোর মধ্যে হবে বলে আশা করা হচ্ছিল, এছাড়াও চট্টগ্রামে থাকবে ছোট একটা কন্সুলেট। প্রতিবেদনে বলা হয়:

*পাকিস্তানি দূতাবাস একবার চালু হয়ে গেলে খুবই সম্ভব যে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও সরকারী দপ্তরে অনুপ্রবেশমূলক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে, বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। পাকিস্তানি দূতাবাসের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের দাপ্তরিক পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারবে। ১৯৭১ সালে ভেঙে যাওয়া পুরনো আমলাতান্ত্রিক সম্পর্ক আবার নতুন করে স্থাপিত হবে এবং পাকিস্তান পুরনো বন্ধুদের নেটওয়ার্কে কার্যক্রম চালাতে সক্ষম*

*হবে। এভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ঘটনা জানতে পারবে পাকিস্তান। যেহেতু তাদের শক্তি প্রধানত কেন্দ্রীভূত করবে তারা ভারতের ওপর, সুতরাং বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সমস্যার আদ্যোপান্ত সবকিছু জানতে পারবে পাকিস্তান। পর্দার আড়ালে থেকে বাংলাদেশের ওপর প্রভাব খাটানোর তৃতীয় অদৃশ্য পক্ষ হবে পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রচেষ্টা হবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তফাৎ বাড়ান এবং এ দুই দেশের মধ্যে মসৃণ সম্পর্কের পথে সম্ভব সবরকম বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের সব ধরনের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে চাইবে পাকিস্তান এবং হয়তো বিভিন্ন স্তরে পাক-বাংলাদেশ মৈত্রী সংঘ স্থাপিত হবে। পাকিস্তান বিশেষ করে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর ওপর। তাদের পলিসির প্রধান উদ্দেশ্য হবে ইসলামপন্থী, পাকিস্তানিপন্থী মনোভাব উস্কে দেয়া আর ভারতবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী মনোভাব উৎসাহিত করা। বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ যদি তাদের অনুকূলে যায়, তাহলে পাকিস্তান হয়তো দুই দেশের মধ্যে কনফেডারেশন গঠনের আইডিয়া হাজির করবে।*

কৃষ্ণের মতে, বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম চালিয়ে ভারতের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টির পাকিস্তানের পরিকল্পনা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন র অফিসাররা। বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর-পূর্বের সংঘাতপূর্ণ উপজাতীয় অঞ্চল লাগোয়া, এছাড়া নেপাল, ভুটান ও সিকিমেরও নিকটবর্তী। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়:

*জুলফিকার আলী ভুট্টো এতদূর বলেছেন বলে জানা যায় যে আরেকটা ভিয়েতনামে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই অঞ্চলের। সুতরাং এটা সম্ভব যে পাকিস্তান নাগা ও মিজোদের পাশাপাশি নকশালদেরও মদদ দেবে ও উৎসাহ জোগাবে। পাকিস্তান হয়তো ভারতের বিরুদ্ধে নেপালীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়ানোর প্ররোচনা দেবে এবং নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক জটিল করে তোলার চেষ্টা করবে। পাকিস্তান অতীতে ভারতের মুসলমানদের রক্ষক বলে দাবী করেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই দাবী অন্তর্নিহিত রয়েছে দ্বি-জাতি তত্ত্বে। সুতরাং বাংলাদেশে উপস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারলে পাকিস্তান তার কর্মকাণ্ডের নেটওয়ার্ক প্রসারিত করবে বাংলা, বিহার, ত্রিপুরা ও আসামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পর্যন্ত।*

## অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাহীনতা

ভারতের আশঙ্কা ছিল যে বাংলাদেশ সম্ভবত চরমভাবে ভঙ্গুর দশায় পড়বে বিদেশী চাপের কাছে, প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র ও তেলসমৃদ্ধ প্রতিক্রিয়াশীল আরব দেশগুলোর কাছে, মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার আইডিয়া চুকিয়ে ফেলবে। পরিণামে সংখ্যালঘুদের অবস্থান হয়তো দুর্বল হয়ে যাবে, তারা ভারতে দেশান্তরিত হবে দলে দলে। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ ভাগ করা হয়েছিল, সেই সময় বিপুল পরিমাণ হিন্দু রয়ে গিয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, বিপরীতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশির ভাগ হিন্দু চলে এসেছিল ভারতে। ভাষাগত ও জাতিগত সম্বন্ধ এবং উত্তম অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতের প্রতি টান অনুভব করে। অতএব অবস্থা যখনই অনুকূল ছিল তখনই তারা ভারতে দেশান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। বাংলাদেশ থেকে ভারতে কিছু অননুমোদিত স্থানান্তরের ঘটনা সীমান্তে সবসময়ই ঘটত, কখনও কখনও এমনকি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরাও জমির সন্ধানে আসাম ও মেঘালয়ে স্থানান্তরিত হত। মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স (এমএইচএ)-এর ১৯৭৫ সালের তথ্য মতে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় সাতচল্লিশ লাখ মানুষ ভারতে চলে এসেছিল। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে এই দেশান্তর প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশীকে আটক করেছিল ১৯৭৪ সালের অগাস্ট থেকে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে। অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী আগমনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স সোর্সগুলো উদ্ঘাটন করেছিল যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আসতে তখনও বাকি। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করতে কিছু পক্ষ চেষ্টা করছিল, যার পরিণতিতে ওই সম্প্রদায়ের আরও বিশাল সংখ্যায় দেশত্যাগ ছিল সময়ের ব্যাপার। এমনকি বিহারী মুসলমানরাও ভারতে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল, যারা এরই মধ্যে বাংলাদেশে গুছিয়ে নিয়েছিল। এমএইচএর একটি নোটে বলা হয়:

> *শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপস্থিতির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন স্লোগান ও পোস্টার সাঁটা হয়েছে।*

*নিগ্রহের দৃষ্টান্ত নৈমিত্তিক ঘটনা। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম প্রভৃতি ধর্মান্ধ ইসলামী সংগঠন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। এই সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সংখ্যালঘুর দেশত্যাগের ঘটনা ঘটতে পারে। বাংলাদেশে যেহেতু প্রায় নব্বই লাখ হিন্দু রয়েছে, ভারতকে বাংলাদেশ থেকে তাদের চলে আসার সমস্যা মোকাবেলা করতেই হবে।*

বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থাটি মনে করত, বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের আগমনের নিহিতার্থ বিশ্লেষণ করা দরকার। ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যায় বাড়তি চাপ যোগ করা ছাড়াও ওই ধরনের অভিবাসন থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আসাম ও পশ্চিম বঙ্গে, আইন-শৃঙ্খলার গুরুতর সমস্যা তো সৃষ্টি হবেই, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিও বিপন্ন হয়ে পড়বে। র জানায়ঃ

*দলে দলে দেশত্যাগ শুরু হয়ে গেলে উদ্বাস্তুদের শক্তি প্রয়োগ করে সীমান্তে থামিয়ে দেয়ার যেকোনও নীতি পালন করা হবে দুঃসাধ্য এবং আমরা অপরিহার্যভাবে ওই উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করতে বাধ্য হব শুধুমাত্র মানবিক কারণেই নয়, জন-আবেগের চাপেও, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের কারণে যেখানে ওইসব মানুষের অনেকেরই আত্মীয়-স্বজন বাস করে।*

এমএইচএর জয়েন্ট সেক্রেটারি সি. জি. সোমিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে অভিন্ন রাষ্ট্রীয় সীমান্তের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছিলেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের অবৈধভাবে ভারতে আগমন বন্ধের দায়িত্ব ভারত একাই নিতে পারে না এবং বাংলাদেশ থেকে আসা সকল অবৈধ অভিবাসীকে শনাক্ত করে পুশ ব্যাক করার সম্ভব সমস্ত পদক্ষেপ নিতে হবে রাজ্য সরকারগুলোকে। সোমিয়া জানতেন, রাজ্য সরকারগুলোর কাছে তাদের অঞ্চলের অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিকদের সঠিক তথ্য নাও থাকতে পারে। সুতরাং রাজ্যগুলোয় বিদ্যমান গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর সমীক্ষা প্রয়োজন, যাতে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত ও উচ্ছেদ করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্যভাণ্ডার সৃষ্টি করা যায়। তিনি সীমান্ত অঞ্চলে জনগণনা অভিযান পরিচালনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই অভিযানে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও রেভিনিউ কর্মকর্তাদের বিশেষ পুলিশী ক্ষমতা দেয়ার

কথা বলেছিলেন তিনি, যে ক্ষমতাবলে তারা অবৈধ অভিবাসী উচ্ছেদের কাগজে সই করতে পারতেন। সোমিয়ার নির্দেশনা পরিস্থিতির গুরুত্ব স্পষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি বলেন:

*রাজ্য সরকারকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জন্য সহযোগিতামূলক চৌকি বসাতে হবে যা আটক করার দ্বিতীয় লাইন হিসেবে কাজ করবে। এসব চৌকির অবস্থান হবে উপযুক্ত চেকপয়েন্টের পশ্চাদ্ভাগে, যেমন রেলওয়ে স্টেশন ও সীমান্ত অভিমুখী স্পর্শকাতর সড়ক। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অভিবাসী আগমন ও বেআইনী অস্ত্রের পাচার রোধ করতে সুন্দরবন অঞ্চলের নৌপথে টহল জোরদার করা প্রয়োজন। সীমান্তে কী ঘটছে সে সম্পর্কে বিএসএফ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং রাজ্য সংস্থাগুলোর মধ্যে সময়মত তথ্য বিনিময় করা আবশ্যক। বাংলাদেশের ঘটনাবলী এবং সেখান থেকে সংখ্যালঘুদের প্রস্থানের ফলে ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশী নাগরিকদের দলে দলে ভারতে চলে আসার পিছনে হয়তো কিছু এজেন্ট থাকতে পারে। ওই ধরনের এজেন্টদের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা কাজের হতে পারে, তাদের তৎপরতার ওপর নজরও রাখতে হবে। সীমান্ত এলাকায় পুলিশের কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক জরুরি ভিত্তিতে উন্নত করা প্রয়োজন। সীমান্তের সমস্ত থানায় অবিলম্বে অয়্যারলেস নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। পুশ ব্যাক অভিযানের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীদের জড় করতে হবে তাদের অবৈধ বসবাসের স্থান থেকে এবং সীমান্তে নিয়ে যেতে হবে দলবদ্ধ করে। তাদের কিছু সময়ের জন্য ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখার প্রয়োজন হতে পারে, যেহেতু পুশ ব্যাক করা হতে পারে কেবল ছোট ছোট দলে।*

সীমান্তে বিএসএফের শক্তি সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন ছিল এমএইচএ: বিপুল পরিমাণ অবৈধ অভিবাসীর আগমন মোকাবেলার মত যথেষ্ট বড় ছিল কি এই বাহিনী? ১৯৭৫ সালে সীমান্তের অতন্ত্র বাহিনীর আঠারটি ব্যাটেলিয়ন মোতায়েন করা হয়েছিল, তিনটি ছিল রিজার্ভ। একই সঙ্গে যদিও রিজার্ভ ব্যাটেলিয়নগুলোকেও সীমান্তে মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মন্ত্রণালয়, কিন্তু বুঝতে পেরেছিল যে এসব সম্পদ তখনও ছিল অপর্যাপ্ত। সেইসব দিনে সুন্দরবন অঞ্চলের আটান্ন মাইল নৌ সীমান্ত পর্যবেক্ষণের জন্য বিএসএফের ছিল চারটি টহল বোট। সরকার আরও বোট ও সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত

নিয়েছিল, পাশাপাশি বিএসএফের সঙ্গে কার্যকর লিয়াজোঁর জন্য চার ব্যাটেলিয়ন সীমান্ত শাখা হোম গার্ড গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এমএইচএ জানায়:

*অবৈধ আগমনের ব্যাপ্তি ও এই সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে নিয়মিত সমীক্ষা চালানোর জন্য মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে রাজ্য স্তরে সমন্বয় কমিটি গঠন করা আবশ্যক। মাসে অন্তত একবার এ ধরনের বৈঠক করতে হবে। রাজ্য স্তরের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হবে বিএসএফের সেক্টর ইন্সপেক্টর জেনারেলকে এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও র-এর প্রতিনিধিদের। জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় মোতায়েন বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডান্ট এবং ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও র-এর স্থানীয় প্রতিনিধিরা এসব বৈঠকে সহযোগিতা করবে। বাংলাদেশ থেকে অবৈধ আগমন সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য দ্রুত ও নিয়মিত আদানপ্রদান করতে হবে কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহ ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও একত্রীকরণের বর্তমান ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে এবং যেখানে প্রয়োজন শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্বাস্তুদের আগমনে হয়তো সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হবে নানাপ্রকার আর্থ-সামাজিক কারণে। রাজ্য সরকার ও জেলা কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজন হবে সতর্ক প্রহরা জারি রাখা, যাতে যেকোনও ঝামেলা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যায়।*

ইতোমধ্যে এমইএ, যার কাজ অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভাল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল যে ভারতীয় পদক্ষেপে বাংলাদেশ সরকারের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে নতুন দিল্লি তার ব্যাপারে নাখোশ। ওই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে. আর. নারায়ণন যুক্তি তুলে ধরেছিলেন যে নতুন সরকার যদিও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে, তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি শীতলতা দেখানোর কিংবা হতাশার মেজাজে বাংলাদেশকে খরচের খাতায় লিখে রাখার কোনও কারণ নেই ভারতের। এমইএর মধ্যে এমন মজবুত অভিমতও ছিল যে ঢাকা মিশনে নিযুক্ত যেসব কর্মকর্তা অভ্যুত্থানের পর ফেরত এসেছিলেন তাদের আবার ঢাকায় পাঠান হোক, কেননা নতুন দিল্লিতে তাদের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে ভারত এখনও নতুন সরকারের প্রতি নাখোশ। এ ছাড়াও অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের

ক্ষমতায় আসা নতুন শক্তি ও নতুন ব্যক্তিদের সম্পর্কে সরাসরি তথ্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দরকার ছিল ভারতের। নারায়ণন বলেন:

> *আমার যা মনে হয় তা হল এই, বাংলাদেশের নতুন শাসকগোষ্ঠী অবিলম্বে ভারতকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবে যে সরকার পরিবর্তনের ফলস্বরূপ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তিত হবে না। এমনকি পাকিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব অধিক বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশ সম্ভবত পাকিস্তান ও ভারতের থেকেও নিজের স্বাধীন সত্তা অক্ষুণ্ন রাখবে। এটা হবে একটা জটিল পরিস্থিতি, ভবিষ্যতে যা কঠিনভাবে আমাদের স্নায়ুর পরীক্ষা নেবে। যাই হোক, কূটনৈতিক বিমানের আরোহী হিসেবে এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত গতিপথ হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করা, নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া আর আমাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখা।*

বৈদেশিক স্পাই এজেন্সির বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ছিল তখনও ছোট, সেখান থেকে আসত সংক্ষিপ্ত তথ্য। অভ্যুত্থানের পর উপ-সূত্রগুলো বা অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত চররা কাজ ছেড়ে দিয়েছিল কিংবা ধরা পড়লে শাস্তির আশঙ্কায় গা ঢাকা দিয়েছিল। যাই হোক না কেন, ভারতীয় স্পাই এজেন্সি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের শিকার করা অব্যাহত রেখেছিল যারা বদলে দিতে পারত দেশটির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের গতিপথ।

স্পাই এজেন্সি কি ভেবেছিল, একটা নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকার গঠনের ন্যূনতম সম্ভাবনা আছে? হয়তো এমনকি ভারতের বাইরে থেকে কার্যক্রম চালাতে সক্ষম? বাংলাদেশ থেকে যেসব নেতা পালিয়ে এসেছিলেন তাদের ব্যাপারে হতাশ ছিলেন সিনিয়র র অফিসার এন. এফ. সান্টুক। তিনি মনে করতেন, এইসব লোকের নির্বাসিত সরকার গঠনের কোনও যোগ্যতা নেই। তিনি ঠিকই মনে করতেন। অভ্যুত্থানের পরপরই যারা চুপিচুপি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল আওয়ামী লীগপন্থী বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সদস্য (কলেজ ছাত্র)। কতিপয় সংসদ সদস্যও সীমান্ত অতিক্রম করে এসেছিলেন, কিন্তু নির্বাসিত জাতীয় সরকার গঠনের জন্য মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার মত যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য তাদের কারুরই ছিল না। সান্টুক লিখেছিলেন:

*দুজন বিশিষ্ট নেতা যারা এখন বাংলাদেশের বাইরে, যথা জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী ও কামাল হোসেন, ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাবলীর পক্ষে নন, কিন্তু বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতে জড়ানোর কোনও মানসিকতা দেখাননি তারা।*

রাজনীতির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ খেলায় মিত্র ও শক্ররা রঙ পাল্টায় রাতারাতি। চৌধুরীকে বাংলাদেশের নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল আর নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন তিনি। একজন র অফিসার যার সাংকেতিক নাম ছিল শিব তার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এক বৈঠকে চৌধুরী বলেছিলেন, কামাল হোসেনকে ভারত বন্ধু মনে করলেও আসলে তিনি ছিলেন বিপরীত। হোসেন যদিও বাইরে ভারতের অনুকূলে ভাবাবেগ প্রকাশ করতেন, তিনি পাকিস্তানের স্বার্থ বাড়ানোর কাজ করতেন ভারতের মূল্যে। চৌধুরী ভারতের প্রকৃত বন্ধু হিসেবে নিজেকে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন। 'তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি হয়তো অনুকূল কথা বলে থাকতে পারেন, কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক জোরদার করার কাজ সবসময় করে যাবেন তিনি হৃদয় থেকে,' শিব বলেছিলেন আমাকে।

চৌধুরী শিবকে এ কথাও বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক ফোরামে চীন ও পাকিস্তানের সমালোচনা না করার পরামর্শ দিয়েছেন তাকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট; বস্তুত, যখনই সুযোগ আসে তখনই এ দুই দেশের অনুকূলে রেফারেন্স দিতে বলা হয়েছিল তাকে।

তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব কেওয়াল সিংয়ের সঙ্গে চৌধুরীর সাক্ষাৎ হয়েছিল লিমায়, সেখানে চৌধুরী তাকে বলেছিলেন যে শেখ মুজিব তার ক্যারিসমা হারিয়েছিলেন আগের তিন বছরে এবং শেখ মুজিব বিধিবহির্ভূত ভাবে ইচ্ছামত সংবিধান পরিবর্তন করেছিলেন যেটা ছিল মারাত্মক ভুল, নিজেকে তিনি পার্লামেন্টের উর্ধ্বে স্থাপন করেছিলেন, বৈধতার ভিত্তিই হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কেওয়াল সিং একটা নোটে উল্লেখ করেন:

*শেখ মুজিব ছিলেন একজন মহান নেতা যিনি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্য কাজ করেছিলেন, এ কথা স্বীকার করে চৌধুরী মত প্রকাশ করেন যে ভারতের প্রতি তার উপদেষ্টাদের সদর্থক অনুভূতি ছিল না এবং এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ করে কামাল হোসেনের নাম উল্লেখ করেন। চৌধুরী বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে চান ভারতের সঙ্গে*

*নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকুক, কিন্তু এ জন্য তাকে সুকৌশলে কাজ করতে হবে। চৌধুরী আরও বলেন, তিনি কখনও কখনও শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিয়ে বলতেন যে বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে আর এ জন্য তাকে মূল্য দিতে হবে। কিন্তু শেখ মুজিব উত্তর দিতেন, পরিস্থিতি কীভাবে সামলাতে হয় আর ঝামেলাবাজদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তিনি তা জানেন। চৌধুরী অনুভব করতেন যে শেখ মুজিব অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং উপলব্ধি করতে পারতেন না, এমনকি তার শেষ দিন পর্যন্তও, যে তার নিজের ও তার সরকারের সামনে ভয়াবহ বিপদ। সেনাবাহিনীর তরুণ অংশের মধ্যেও বলাবলি হত যে ভারতের পরামর্শে শেখ মুজিব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ছোট ও দুর্বল করে রেখেছিলেন। শেখ মুজিব এমনকি তার সহচরদের কাছেও সচরাচর উল্লেখ করতেন, সমস্যায় পড়লে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ডাকবেন। তিনি ভারতের পরামর্শে ভুল কাজ করছেন–এই গুজব তাতে আরও বেগবান হয়েছিল।*

বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান বিরোধী অংশ তাদের জেল্লা হারিয়ে ফেলায় উৎকণ্ঠিত হয়েছিল র, যদিও বীরপূজা অমরত্ব দিয়েছিল শেখ মুজিবকে। ঢাকার নতুন সরকার দুর্নীতিবিরোধী ও অস্ত্র উদ্ধার অভিযান কাজে লাগাচ্ছিল অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় মুজিব অনুসারীকে দৌড়ের ওপর রাখার জন্য। সান্টুক মনে করতেন, মুজিব অনুসারী অংশটা নির্বাসিত জাতীয় সরকারকে সমর্থন করবে না। যাই হোক, তিনি এটাও অনুভব করেছিলেন যে মেজর জলিলের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) হতে পারে জিয়াউর রহমান ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে কার্যকর শক্তি, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কিছু পরিমাণে এই দলের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। র জানত, জিয়ার সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাত আছে জেএসডির এবং বাংলাদেশে সম্ভবত এই দলটিই সবচেয়ে সংগঠিত ও সবচেয়ে সংযোজক রাজনৈতিক শক্তি। সশস্ত্র বাহিনীতে জেএসডির ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুগামী। ব্যাপক বিশৃঙ্খলায় উৎসাহ জোগানোর জন্য এই দলটিই দায়ী, সে ব্যাপারেও সচেতন ছিল র। একটি রিপোর্টে র জানায়:

*অন্যান্য র‍্যাংকের ক্ষোভ দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার যে প্রতিশ্রুতি জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে কিছু পরিমাণে এই বিশৃঙ্খলা দমিত হয়েছে, কিন্তু দাবী এতদূর পর্যন্ত গেছে যে বর্তমান প্রশাসন তা পূরণ করতে সক্ষম হবে না। অতঃপর সশস্ত্র*

বাহিনীতে আরও ক্ষোভের বীজ সঞ্চারের বিদ্যমান রয়েছে। জেএসডির নেতাদের গ্রেফতারের পর জেলা ও মহকুমা স্তরেও জেএসডির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতারের অভিযান জোরদার করেছে প্রশাসন। বেশ কিছু গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু সরকার এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙতে সক্ষম হয়েছে বলে ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে কঠোর দমন অভিযানের ফলে আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য হয়েছে জেএসডি যাতে তার ক্যাডারদের পুনরায় সংগঠিত ও সক্রিয় করতে পারে। এই দলের নেতৃত্বের দর্শন যদিও মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগের সম্পূর্ণ বিরোধী, তা সত্ত্বেও আমরা রিপোর্ট পাচ্ছি বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ বিরোধী পক্ষ গঠনের জন্য শীর্ষ নেতাদের সাথে সুবিধাজনক জোট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে জেএসডি। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী দলগুলো যেমন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল, ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি ও পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি বর্তমান সরকারের প্রতি এখনও পর্যন্ত সক্রিয় সমর্থনের কোনও আভাস দেয়নি। তাদের রয়েছে সেক্টর-ভিত্তিক সুসংগঠিত আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাডার এবং সরকারের বিরোধিতায় প্রত্যন্ত থানা, পল্লী অঞ্চলের ব্যাংক ইত্যাদি স্থাপনায় বিক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট ছোট হামলা চালাতে সক্ষম। তাদের অনুপ্রেরণা হচ্ছে মাওবাদ এবং চীনের মনোভাব পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনও সংকট সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে অসম্ভব।

শেখ মুজিবের জামানা শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ওপর একটা চোখ রেখেছিল র, বাংলাদেশে জিয়ার প্রাক-বৈশিষ্ট্যের ক্রমশ উদীয়মান চ্যালেঞ্জার হিসেবে বিমানবাহিনী প্রধান এ. ওয়াই. এম. তোয়াবকে শনাক্ত করেছিল সংস্থাটি। তিনি ছিলেন একজন প্রত্যাবাসিত অফিসার, পশ্চিমাপন্থী ও পাকিস্তানপ্রেমী বলে প্রকাশ্যে পরিচিত ছিলেন। সরকারে থাকলেও দেশের বর্তমান রাজনীতিতে নাকগলানো নেতাদের মতই একই লাইনে ছিল তার ভাবনাও। গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে তিনি পর্দার আড়াল থেকে জিয়ার পজিশন খর্ব করার চেষ্টা করছিলেন এবং সরকারকে আরও বেশি মাত্রায় পাকিস্তানপন্থী অবস্থানের দিকে চালিত করতে চাইছিলেন। র জানতে পেরেছিল, তোয়াব লিবিয়া থেকে কিছু অফিসারকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন যারা অভ্যুত্থানের পর সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, জিয়াউর রহমানের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের বিপরীতে ক্ষমতাশালী বিরোধী পক্ষ সৃষ্টির দিকে নজর ছিল তার।

যদিও তিনি জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আশ
করেছিলেন, সান্টুকের বিশ্বাস সশস্ত্র বাহিনী কোনও নির্দিষ্ট দলকে সমর্থনের
অনুকূলে ছিল না, যে কারণে কোনও সামরিক নেতা জনসমক্ষে মতামত
প্রকাশ করেননি যে নির্বাচনের জন্য ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের যে
ডেডলাইন ঘোষণা করা হয়েছে তা বিলম্বিত করা হোক। র অনুধাবন
করেছিল, ক্ষমতায় থাকা সশস্ত্র বাহিনী একটা পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে পারে
বলে আশা করা যায় যদি তারা অনুভব করে নির্বাচনে এমন সরকার আসবে
যে সরকার তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। সান্টুক বলেন:

*জিয়া শঙ্কিত জেএসডির মত দলগুলোর ব্যাপারে, সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যে দলগুলো ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, কিংবা রাজনীতিকদের ব্যাপারে যারা নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করছে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ইউনিটের মধ্যে যেমন বাংলাদেশ ল্যান্সার্স। অতএব খুব সম্ভবত তার প্রচেষ্টা পরিচালিত হবে একটা বিন্দু পর্যন্ত তার অবস্থান সুদৃঢ় করার দিকে, যেখান থেকে তিনি ক্ষমতায় আসা সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবেন, যার ফলে কার্যকরভাবে নেপথ্যের নিয়ন্ত্রণ তার হাতেই থেকে যাবে। অস্থিতিশীলতা ও বিশৃঙ্খলা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে বর্তমান কর্তৃত্ববাদী সরকার ও সামরিক আইন বজায় রাখার সুবিধাজনক অজুহাত পাবেন তিনি এবং নির্বাচন স্থগিত রাখার সুযোগ পাবেন এমন একটা সময় পর্যন্ত যা তার লক্ষ্যের জন্য অনুকূল বলে তার মনে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বর্তমানে বিভাজন থাকায় এটা সম্ভব নয় যে জিয়ার গ্রুপ কিংবা তার বিরোধীদের গ্রুপ একটা দল গঠন করবে বিএসপিপির লাইনে। তবে জিয়া যদি বিরোধীদের দূর করতে সক্ষম হন, তাহলে ওইসব লাইনের বিকাশ আর বেসামরিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জিয়ার উত্থান নাকচ করে দেয়া যায় না। যে কাঠামো আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেটা হবে একটা রাজনৈতিক ফ্রন্ট পার্টি, তাতে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে থাকবে কার্যকর ক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা বা প্রত্যাবাসিতদের মধ্যে যে পক্ষের আধিপত্য থাকবে তাদের ওপর নির্ভর করবে সরকারের বৈশিষ্ট্য ও নীতি।*

সান্টুকের মূল্যায়ন ছিল একেবারে স্ফটিক স্বচ্ছ। বাংলাদেশে অনিশ্চয়তা ও ভারতবিরোধী মনোভাব দূর করা সহজ ছিল না। যদিও বাংলাদেশের

অভ্যন্তরেই একটা স্পষ্ট ফাটল ছিল, তবু সামরিক শাসন ও জিয়ার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কোনও শক্তি ছিল না। বাংলাদেশী সশস্ত্র বাহিনী বিভক্ত ছিল দুই শিবিরে–একদিকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা এবং অন্যদিকে সাধারণভাবে পাকিস্তানপন্থী প্রত্যাবাসিতরা। কিছু পরিমাণে এই বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয়েছিল যে ঘটনায় তা হল, বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ায় মুক্তিযোদ্ধারা নির্দিষ্ট সুবিধা পেয়েছিল আর প্রত্যাবাসিতরা কিছু অসুবিধায় পড়েছিল। যাই হোক, সিনিয়র অফিসারদের স্বতন্ত্র মত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই লাইনটাকে ঝাপসা করে রেখেছিল কিছু পরিমাণে। ইউনিট ও ফর্মেশনগুলোর ব্যক্তিগত আনুগত্যও পরিস্থিতিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। জেএসডির মত রাজনৈতিক দলগুলোর ও সাবেক মুসলিম লীগারদের মত ইসলামাবাদ ফ্যাকশনগুলোর প্রভাব এবং তাদের স্থানিক ও আঞ্চলিক আনুগত্য এই সমীকরণে যোগ করেছিল আরেকটি ফ্যাক্টর।

র উপলব্ধি করেছিল, পুনরায় জোরাল হয়ে ওঠা ইসলামী পরিচয়ের প্রভাব বাংলাদেশী সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও শক্তিশালী হয়ে উঠবে দেশের অবশিষ্ট অংশের মতই। স্পাইরা ধারণা করেছিল, সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে কোন্দল জেগে ওঠায় সশস্ত্র বাহিনীর আনুগত্য প্রভাবিত হতে পারে কোনও রাজনৈতিক দলের দ্বারা। এটা অতিশয় পরিষ্কার ছিল যে ক্ষমতার প্রতিযোগীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রভাবশালী ছিলেন জিয়াউর রহমান, তার অনুগামীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি, এবং রাজনৈতিক দলের উস্কানিতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দূর করতেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে পারঙ্গম।

ভারতীয় স্পাইরা, যারা বাংলাদেশীদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে নিরলস কাজ করে চলেছিল, স্মরণ করে একটা উষ্ণ ভোরের জন্য সারা রাত অন্ধকারে ও ঠাণ্ডায় অপেক্ষায় থাকার যন্ত্রণার কথা। নির্বাসিত সরকার গঠন যেহেতু সম্ভব ছিল না, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে, র অফিসাররা জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ লোকদের চর হিসেবে নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই অপারেশন ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। প্রতিবেশী দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনেই সীমিত ছিল ভারতীয় স্বার্থ। বাংলাদেশী সংবিধানে এমনভাবে কয়েকটি সংশোধন করছিলেন জিয়া যাতে সেনাবাহিনী লৌহমুষ্টিতে শাসন চালাতে পারে, ভারতীয় স্পাইরা আশ্বস্ত ছিল যে ওই ধরনের আয়োজন চিরস্থায়ী হবে না। বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, যিনি

১৯৭৫ সালের নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর জিয়ার আশীর্বাদে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, তিনি রাজা মান সিং সাংকেতিক নামের একজন ভারতীয় স্পাইয়ের সঙ্গে আলাপকালে স্বীকার করেছিলেন যে বাংলাদেশের উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। সায়েমের উপদেষ্টা আবদুস সাত্তারও বহুদলীয় পদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

রাজা মান সিং বলেন, জিয়ার উদ্দেশ্য ছিল দেশে যেকোনও গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন অনুমোদন করার আগে সমস্ত বিরোধীপক্ষকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। সায়েমকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে উন্নীত করার পর তার প্রথম টার্গেট ছিল জেএসডি ও এর নেতারা।

'পরবর্তী চার মাস, ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৭ সালের মার্চ পর্যন্ত, নিজের খেলাটা নিখুঁতভাবে খেলেছিলেন জিয়া। ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান ছিল পরিকল্পিত, গণনালব্ধ এবং নির্ভুলভাবে নিষ্পন্ন। সঞ্জয় গান্ধীর পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন জিয়া, জন্মনিরোধের এই মডেল তিনি বাংলাদেশে প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এতে কিছু হৈচৈ হয়েছিল, কিন্তু সেসব তিনি দমন করেছিলেন। প্রায় একই সময়ে ভারতে জরুরি অবস্থার পর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সমাপ্তি ঘটে। স্পাই এজেন্সিতে এর ঢেউ এসে পড়েছিল। শীর্ষ ব্যক্তিকে অপসারণ করেন নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই, এবং বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত সান্টুক হন র-এর নতুন প্রধান, স্মরণ করে এ কথা বলেন রাজা মান সিং।

১৯৭৭ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটের পর বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় আবদুস সাত্তারকে। তার প্রধান কাজ ছিল সামরিক সরকারের জন্য একটা রাজনৈতিক ফ্রন্ট চালু করা। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি একক রাজনৈতিক ছাতার নিচে নিয়ে আসার যে চেষ্টা করছিলেন সাত্তার, ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দলের উত্থান ছিল তার সেই চেষ্টারই ফল। এই দলটি পরে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের সঙ্গে মিশে যায় ১৯৭৮ সালের মে মাসে, জিয়াউর রহমান ছিলেন এর নেতা। সে বছরই সেপ্টেম্বরে জিয়ার ঘনিষ্ঠ সমস্ত রাজনৈতিক ফ্রন্ট বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)-এর জন্ম হয়। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনটা নিজেদের ঘরে নিয়ে যায় বিএনপি, তিনশোটি আসনের মধ্যে তারা জয়ী হয়েছিল দুইশো সাতটি আসনে। সিআইএ একটা

রিপোর্টে জানায়, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের থেকে আরও দূরে সরে এসেছিলেন জিয়া, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করছিলেন। ভারতের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ এরশাদ।

রাজা মান সিং বলেন, একজন রাজনীতিক হিসেবে জিয়াউর রহমান ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ যিনি কিনা শেখ মুজিবের ছাঁচে নিজেকে একজন গণনেতায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন, ভারত তখন বাংলাদেশে আইনের শাসন ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জিয়াকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারতের বন্ধুত্বমূলক প্রস্তাবে তিনি সন্দেহ করেছিলেন।

'জনসমস্যা মোকাবেলায় তার সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেনা-সহকর্মীদের প্রতি তার নিষ্ঠুরতা তার অবস্থানকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্রোধ জ্বলছিল ধিকিধিকি এবং আমরা জানতাম বাংলাদেশে আরেকটি ভূমিকম্পের আঘাত কেবল সময়ের ব্যাপার। আমরা সেটার জন্য ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম,' রাজা মান সিং আমাকে বলেছিলেন।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে চট্টগ্রামে একদল সেনা কর্মকর্তার হাতে নিহত হন জিয়াউর রহমান। এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যায় চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসলামী দেশগুলো, কিন্তু, সিংয়ের মতে, বিস্মিত হয়নি ভারত।

'বিএনপি ও এর সমর্থকরা দুর্নীতিপরায়ণ ও মৌলবাদী হয়ে উঠেছিল অল্প সময়ের মধ্যে। জিয়ার অধীনে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনও স্থান ছিল না এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে লড়াই করা একটা সেনাদলের মোহভঙ্গ হয়েছিল তার শাসনের ব্যাপারে,' বলেন রাজা মান সিং।

জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার, সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেন হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ। সাত্তার প্রতিশ্রুতি দেন শীগগিরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৮১ সালের নভেম্বরে বিএনপি বিপুল বিজয় অর্জন করে নির্বাচনে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে, ১৯৮২ সালের মার্চে, মোহাম্মদ এরশাদ রক্তপাতহীন অভ্যুত্থান ঘটান, জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকারের যবনিকাপাত ঘটে। র-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর থেকেই এ ধরনের একটা পদক্ষেপ ঘনায়মান হয়ে উঠেছিল। রিপোর্টে বলা হয়:

সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের ঘটনার চিহ্ন চূড়ান্তভাবে পাওয়া যেতে পারে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডে। ওই ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অংশটির অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নেতা অপসারিত হন, অবশিষ্ট দুই-একজন সিনিয়র জেনারেল যারা ছিলেন তাদেরও অবসর দেয়া হয়েছিল দুই বা তিন সপ্তাজের মধ্যে, ফলে নেতৃত্ব পুরোটাই চলে যায় প্রত্যাবাসিত গ্রুপের হাতে। ১৯৮১ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়টা ব্যবহার করা হয়েছিল জিয়ার দল বিএনপিকে দেশ চালানোর যোগ্য একমাত্র শক্তি হিসেবে তুলে ধরার জন্য, তখন সাত্তার ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অধিকাংশ অফিসারের বিচার ও শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এই সময়ে সাত্তারের অধীনে বিএনপি আবির্ভূত হয় ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে। সেনাপ্রধান এরশাদকেও মনে হয়েছিল সহযোগিতাপূর্ণ। পরিস্থিতিকে বিপদের দিকে ঠেলে দেয় নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। শেখ হাসিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত বয়সে ছিলেন না, সুতরাং কামাল হোসেন দাঁড়িয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে। উভয় পক্ষই কারচুপির অভিযোগ তোলে। নির্বাচনী প্রচারণা ছিল সহিংস। সরকার ও শিল্পের নানাখাতে ধর্মঘট হয়–সব মিলিয়ে নির্বাচন ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতাহীন। যাই হোক, সাত্তারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভেজাল বলেই প্রতীয়মান হয়। বৈধকরণের প্রক্রিয়া সাত্তারকে সাহায্য করেছে বলে মনে হয় না। তার প্রথম মন্ত্রীসভা ছিল একটা দুর্বল আপসরফা যেখানে বিএনপির ডান ও বাম পক্ষের মধ্যে ভারসাম্যের ঘাটতি ছিল। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ডান পক্ষের সঙ্গে যুক্ত, তিনি মূলত মুসলিম লীগের লোক। এটা ছিল বিয়াল্লিশ সদস্যের বিশাল মন্ত্রীসভা। অধিকাংশ মন্ত্রী দুর্নীতিবাজ হিসেবে পরিচিত। যাই হোক, আওয়ামী লীগের চীনপন্থী গ্রুপের সেখানে জায়গা হয়নি, অথচ পার্লামেন্টে তারা আসন পেয়েছে ছিয়াত্তরটি। একদিকে মন্ত্রীসভা গঠনে চরম ব্যর্থতা দেখা গিয়েছিল, অন্যদিকে আরও লক্ষনীয় একটা ঘটনা ঘটেছিল–ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ নিয়ে বিএনপি সদস্যদের সঙ্গে সাত্তারের চরম মতবিরোধ। নিজের অসংখ্য সমর্থকের বিপরীতে গিয়ে সাত্তার সিদ্ধান্ত নেন, রাজনৈতিক পরিচয়হীন মির্জা নূরুল হুদাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত করবেন। পরের তিন মাস–১৯৮১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৮২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত–বিএনপির বামপক্ষের

*দুর্নীতিবিরোধী গ্রুপ ও প্রধানমন্ত্রীর গ্রুপের মধ্যে অব্যাহত সংঘাত চলতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল একটা অশোভন বিতর্ক, দলের সভাপতি পদে জিয়ার বিধবা স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্বাচন নিয়ে। সাত্তার তাকে এই পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন, যিনি নিজের প্রতিশ্রুতি থেকে হটে এসেছিলেন মধ্য-জানুয়ারিতে, স্পষ্টতই প্রধানমন্ত্রীর চাপে। বেগম জিয়া লুকোচুরি না করে বাইরে বেরিয়ে আসেন, আরও ভারসাম্যপূর্ণ মন্ত্রীসভার কথা বলেন তিনি। শাসক দলের মধ্যে চলমান এসব ঘটনার সমান্তরালে একটা বিতর্ক দেখা দিয়েছিল প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর মধ্যে। এরশাদ সরকারে অংশ নেয়ার আনুষ্ঠানিক দাবী সামনে আনেন এবং মন্ত্রীসভার দুর্নীতিবাজদেরও সমালোচনা করেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা গ্রুপ গঠনেরও দাবী জানান তিনি। জবাবে সাত্তার গঠন করার কথা বলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, দশজনের এই পরিষদে তিনজন বাহিনী প্রধান হবেন সংখ্যালঘু। সেনাবাহিনী সম্ভবত এটা প্রত্যাখ্যান করেছিল যার ফলে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থা। দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীসভা নিয়ে কাজ চালাতে অপারগ সাত্তার ভিন্নমতাবলম্বী নেতাদের দ্বারস্থ হন, ১৩ই ফেব্রুয়ারি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয় এবং আঠার সদস্যের অনেক ছোট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। এর আশু কারণ ছিল ১৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা বর্জন প্রতিরোধ করা। সাত্তার পুরনো সিকিউরিটি কাউন্সিল বাতিল করে ছয় সদস্যের নতুন কাউন্সিল গঠন করেন, এতে ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানরা, তিনি নিজে, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী আর এভাবে তিনি সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সাত্তারের আত্মসমর্পণের একটা ফ্যাক্টর ছিল খাদ্য ঘাটতি। এই সময় অনেক দেশ, এবং ভারতও, দ্রুত চাল সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছিল দেশটিকে, যেখানে দাম বেড়ে যাচ্ছিল রকেটের গতিতে।*

ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মনে করেন, বাংলাদেশে এরশাদের উত্থান ছিল প্রধানত তিনটি সমান্তরাল সমস্যার কারণে–শাসক দলের ভিতরে মতবিরোধ, বিদেশ থেকে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের পর আওয়ামী লীগের ভিতরে মতবিরোধ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রত্যাবর্তন। তারা আরও মনে করেন, যেসব ঘটনা সাত্তার সরকারের বিরুদ্ধে

অভ্যুত্থান ঘটাতে সহায়তা করেছিল সেগুলো ছিল জটিল। তারা যুক্তি দেখান যে তিনটি বিষয় ছিল প্রাসঙ্গিক–সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রহমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, জাতীয় পুনর্গঠনে সেনাবাহিনীর ব্যবহার বিষয়ক এক পাঠক্রমে অংশ নিতে অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে একদল সেনা কর্মকর্তার ইন্দোনেশিয়া সফর এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হুদার পদত্যাগের আগে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ যিনি নিজের পজিশন নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। র-এর বিশ্লেষণে এরশাদের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, যিনি অভ্যুত্থান সমন্বিত করেছিলেন ফলপ্রসূভাবে:

*অভ্যুত্থানের দিকে অগ্রসর সময়টায় এরশাদের আচরণ হয়েছে অত্যন্ত সোজাসাপ্টা। তার বিশাল রাজনৈতিক অর্জন হচ্ছে একজন খাঁটি নির্বাসিত ব্যক্তির ভাবমূর্তি ত্যাগ করা। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় তিনি এটাকে সুচিন্তিত নীতি হিসেবে নিয়েছেন সেনাবাহিনীর মধ্যকার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্যা সমাধানের জন্য। এতে তার ভিত্তি আরও প্রশস্ত হবে, অন্যদিকে একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর বিশাল অংশের আনুগত্যও ধরে রাখতে পারবেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে ১৯৭১ সাল থেকে যাদের রয়েছে পেশাদার রেকর্ড। এটা পরিষ্কার নয় যে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য আওয়ামী লীগ কিনা, ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনা ও কামাল হোসেন কিনা। সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক তৎপরতার পথপ্রদর্শন কিংবা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কোনও নির্দিষ্ট সুসঙ্গত দর্শন যদি এরশাদ ও তার সহকর্মীদের থেকে থাকে, তাহলে হয়তো আমরা একটা সংক্ষিপ্ত সময়কাল দেখতে পাব যখন সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকবে পাকিস্তানের মত, এরপর পুনরুত্থান ঘটবে দলগুলোর। এই সম্ভাবনা কম যে সেনাবাহিনী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপগুলোর পক্ষে থাকবে সম্পূর্ণরূপে, যদিও তাদের যোগাযোগ আছে বিএনপিতে থাকা ডানপন্থী মুসলিম লীগ গ্রুপের সঙ্গে।*

র এটাও মনে করে যে এরশাদের ভারতবিরোধী বিশেষ কোনও রেকর্ড ছিল না।

*দিল্লির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে তাকে মনে হত দারুণ প্রফুল্ল একজন অফিসার, ১৯৭৫ সালের সেই ক্রান্তিকালে যখন শেখ মুজিব নিহত হয়েছিলেন, যদিও অনেক সময় প্রশ্ন করা হলে তিনি তার ভারতীয়*

*সহকর্মীদের সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে সে কথা গোপন করেননি। তাকে মনে হয় একজন পেশাদার সৈনিক যিনি একটা দক্ষ পেশাদার সেনাবাহিনী গঠনে উদগ্রীব। শেষের ছয় মাসে তার বিবৃতি হয়েছে যুক্তির দিক থেকে সুসঙ্গত, এই অভিমত তা সামনে এনেছে যে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং দেশকে আজ যে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীকে বিশুদ্ধ পেশাদার ক্ষেত্রের বাইরে সাংবিধানিকভাবে বৈধ একটা ভূমিকা পালন করতে হবে।*

যাই হোক, এরশাদ ও তার সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ভারতের প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একটা ঘটনা দেখিয়েছিল যে ঢাকায় ভারতীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতির ব্যাপারে বাংলাদেশীরা প্রায় প্যারানয়েড হয়ে পড়েছিল। হাই কমিশনে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিকদের ওপর নজরদারী বাড়ান হয়েছিল। ১৯৮২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশী নিরাপত্তা রক্ষীরা ঢাকার রাস্তায় ভারতীয় হাই কমিশনার মুচকুন্দ দুবের গাড়ির পিছু নিয়েছিল। বিরোধী পক্ষের দ্বারা বাধ্য হয়ে এ ব্যাপারে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাও। ১৯৮২ সালের ৪ঠা মার্চ পার্লামেন্টে রাও বলেন:

*এটা দুঃখের বিষয় যে আমাদের হাই কমিশনার তার স্বাভাবিক ও বৈধ কাজে যখন ঢাকা শহরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তার ওপর আপত্তিকরভাবে নজরদারী করতে পারে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। হাই কমিশনার (দুবে) তার গাড়ি থামান, তার নিরাপত্তা রক্ষীকে বলেন তাকে অনুসরণকারী গাড়ির লোকজনকে অনুরোধ করতে যেন তারা সেটা না করে। এর ফল হয় তর্কবিতর্ক, যা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের সংবাদপত্র। ভিত্তিহীন অভিযোগও করা হয় যে হাই কমিশনার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছিলেন।*

নিবিড় নজরদারীর বিষয়টি উঠেছিল বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে এবং এরশাদ হুশিয়ার করে দেন যে অনুরূপ আর কোনও ঘটনা ঘটলে দুই দেশের সম্পর্ক বিপন্ন হতে পারে। একজন র অফিসার বলেন, ভারতীয় কর্মকর্তাদের পিছু নেয়া কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু ফের শুরু হয়েছিল কয়েক মাস পর।

১৯৮২ সালের ২৫শে মার্চ সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন এরশাদ, পার্লামেন্ট ও বেসামরিক প্রশাসন বিলুপ্ত ও সামরিক আইন জারি করেন। তিনি কার্যত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকে পরিণত হন। দেশের ও অর্থনীতির সংকটজনক অবস্থার কারণে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল বলে যুক্তি দেখান। বাংলাদেশের রেডিওতে প্রচারিত তার ভাষণে এরশাদ প্রতিশ্রুতি দেন, পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

## দুর্বলতার সুযোগ নেয়া

'বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে বাংলাদেশের আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ,' একবার সিআইএর একটা রিপোর্টে এ কথা বলা হয়েছিল। আমেরিকান বিশ্লেষকরা ঠিক বলেছিলেন। একদা সর্বময় ক্ষমতাধর বিএনপির জন্য দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল একটা বজ্রঝড়, আর বৃষ্টিপাত এরশাদকে সাহায্য করেছিল প্রচুর ফসল ফলিয়ে। এই সময় নাগাদ বাংলাদেশে হিউম্যান সোর্স সংগ্রহ ও মোতায়েন জোরদার করেছিল র। গোপন অ্যাকশনের চেয়ে অস্বচ্ছ সামরিক প্রশাসনের ভিতরকার গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল এই অপারেশনের লক্ষ্য। বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল সিআইএও, এর স্পাইরা দেশটির ওপর বেশ কয়েকটি রিপোর্ট লিখেছিল। ওই রকম একটি রিপোর্টে বলা হয়, নিজের অবস্থান মজবুত করতে এরশাদ রাজনীতি ও ব্যবসা থেকে দুর্নীতি সমূলে উৎপাটন করতে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিযান চালান, ঘুষ নেয়া ও সরকারী অর্থ পাচারের জন্য অনেক মন্ত্রীকে আটক করা হয়। আমেরিকানরা মনে করত, এরশাদের অভ্যুত্থান ছিল প্রয়োজনীয় বালাই, যদিও তার ক্ষমতায় থাকাটা ছিল ভঙ্গুর ও তার টিকে থাকাটা একটা বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের ব্যাপারে সাবধান ছিল আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স। সেইসব গোলমেলে দিনগুলোয় সিআইএর অধিকাংশ গোয়েন্দা বিশ্লেষণে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এরশাদের অভ্যুত্থানের পর প্রস্তুত করা সিআইএর একটা রিপোর্টে বলা হয়:

> *অধিকাংশ বাংলাদেশী ভারতের উদ্দেশ্য নিয়ে অতিশয় সন্দিহান। নতুন দিল্লির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনও সমস্যাকে এমন লক্ষণ হিসেবে দেখার ঝোঁক রয়েছে তাদের যে ভারত গোপনে তাদের সরকারের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। একটা নির্বাচিত বেসরকারী প্রশাসনই পছন্দনীয়, এ কথা স্বীকার করে নিলেও ভারতের সামনে সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ*

*করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। নতুন দিল্লি যদিও ঢাকায় আরও নমনীয় সরকারের অভ্যুদয়ের পক্ষে, তবু এ কথা স্বীকার করে যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের নগ্ন হস্তক্ষেপ ভারতের জন্যই ক্ষতিকর হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিবাদে ভারতের কঠোর অবস্থান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দীর্ঘকালীন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায় যে ভারত হচ্ছে উপমহাদেশের কর্তৃত্বকর শক্তি এবং ভারতের স্বার্থের সঙ্গে এর প্রতিবেশীদের অবশ্যই মানিয়ে চলতে হবে। এরশাদের প্রশাসন বলেছে, দুই দেশের মধ্যকার অনিষ্পন্ন দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হবে না। এ ধরনের ভঙ্গিমা হচ্ছে বুলিসর্বস্ব, যেহেতু এসব মন্তব্য বাস্তব করে তোলার মত ঠেকনো বাংলাদেশের নেই। ভারত তার ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রতিবেশীর সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক চায় সেই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে সমাধান, এবং দুর্বল অবস্থান থেকে আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ যে কূটনৈতিক দক্ষতা কাজে লাগাতে পারবে তার ওপর। বাংলাদেশের পলকা রাজনৈতিক অবস্থা যেহেতু বাইরের চাপ প্রতিরোধের সামর্থ্য হ্রাস করে দিয়েছে, কাজেই গুরুত্বপূর্ণ ইসুতে ভারতের প্রতি যেকোনও প্রকার বশ্যতা ঢাকার যেকোনও সরকারকে বিপদে ফেলে দেবে।*

ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগের লাইন খুলে দিয়ে এবং পরিস্থিতি সমাধানের চেষ্টা করে ভারত কূটনৈতিক স্তরে বিশাল-হৃদয় প্রতিবেশীর আচরণ করেছিল। এরশাদ সামরিক আইন জারির কয়েক মাস পর পররাষ্ট্র মন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাওকে ঢাকায় আমন্ত্রণ জানান। ১৯৮২ সালের ২২শে মে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন রাও। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮২ সালের অক্টোবরে নতুন দিল্লিতে পৌঁছান এরশাদ। তার এই সফরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দুই দেশের সম্পর্ক প্রগাঢ় করার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে দেখা হয়েছিল। ঢাকার সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটা যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠনে সম্মত হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী ও এরশাদ। বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা নদীর পানি ভাগাভাগির একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ভারত, কিন্তু ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক অনুপ্রবেশের মত গুরুত্বপূর্ণ ইসুগুলো উদ্বেগের কারণ হয়েই রয়ে যায়।

এমইএর নথি থেকে জানা যায়, ইন্দিরাকে এরশাদ বলেছিলেন, 'আমাদের অবশ্যই বন্ধু হতে হবে–মানে, ভাল বন্ধু। আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিৎ সদিচ্ছা আর প্রতিবেশীসুলভ সহৃদয়তা, বিশাল হৃদয়গত আবেগসম্পন্নতা আর সমঝোতা, প্রাক-স্বাধীনতা ও পরম্পরাগত বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত, এবং সার্বভৌমত্বের নীতির ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।'

এরশাদকে ইন্দিরা স্মরণ করিয়ে দেন যে বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার আগে ভারতীয় শহীদের রক্তে গাঁথা হয়েছিল দেশটির ভিত্তি। একটা লক্ষ্যের জন্য জনগণকে এত চড়া মূল্য দিতে ইতিহাস কখনও দেখেনি।

ইন্দিরা আরও বলেন: 'আমরা ভারতে আমাদের নিজেদের জন্য যা চাই, তাই চাই আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্যও–জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য রাজনৈতিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য। আপনাদের স্থিতিশীল ও শক্তিশালী দেখতে চাওয়াই আমাদের নীতি। আমরা অবিরত ও আন্তরিকভাবে আপনাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।'

এসব বিবৃতি ইন্দিরা ও এরশাদ উভয়ের উপলব্ধিকে বাঙ্ময় করেছিল। দুই দেশেই উত্তেজনা প্রশমিত করতে তাদের প্রয়োজন ছিল জোরদার কূটনৈতিক তৎপরতা। ১৯৮৩ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পি. ভি. নরসিমা রাও ঢাকায় উড়ে গিয়েছিলেন একটা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে।

একজন র এজেন্ট, যার কোডনেম ইয়াসিন মোহাম্মদ, আমাকে বলেছিলেন যে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর জামায়াতে ইসলামীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে বিশেষ করে চিন্তিত ছিল র। জামায়াতের ক্যাডার বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং ভারতবিরোধী প্রচারণা মৌলবাদীদের আকর্ষণ করছিল।

ইয়াসিন বলেন, 'আমাদের মধ্যে আশঙ্কা ছিল যে জামায়াত নিজেকে মূলধারার শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে এবং বাংলাদেশে যখনই নির্বাচন হোক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। দেশের জন্য জামায়াতের মত একটা দলের বিপদ এরশাদ যদিও দ্রুত দেখতে পেয়েছেন, তবু ভারতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে নির্দিষ্ট কিছু তৎপরতায় একেবারে নীরব রয়েছেন তিনি।'

১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসের কোনও সময়ে ঢাকায় অবস্থিত আমেরিকান দূতাবাস রিপোর্ট করে যে এরশাদ ভারতীয় আধিপত্যের বাস্তবতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নরমপন্থায় দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তার এই বক্তব্যের কারণ হল কিছু বাংলাদেশী তাকে 'ভারতের ব্যাপারে নরম' বলে বিবেচনা করে। সম্ভবত এই

ধারণা নস্যাৎ করতে প্রকাশ্যেই নতুন দিল্লির সমালোচনা করেছিলেন এরশাদ। রিপোর্টে আরও বলা হয়:

*আমাদের মতে, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে আসার অনুকূলে কাজ করবে ভারত তাতে কোনও সন্দেহ নেই, ভারতের সহযোগিতা নিয়েই এই দল বাংলাদেশের স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দিয়েছিল। যাই হোক, ভারত স্বীকার করে যে এটা সম্ভবত ঘটবে না। তবে আমাদের সন্দেহ, ভারত চায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা পর্যায় পর্যন্ত ধসে যাক যার নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে চরমপন্থী মৌলবাদী দলগুলোর হাতে।*

*আমরা মনে করি, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিবাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে, বাংলাদেশকে তা অস্থিতিশীল করে তুলবে এবং উপমহাদেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর সমস্যা হচ্ছে পানিবণ্টন সমস্যা। বাংলাদেশে মৌসুম অনুযায়ী পানির স্বল্পতা ও বন্যা দীর্ঘকালের সমস্যা, এবং জনবহুল ও বিপুল পরিমাণে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রচণ্ডভাবে নির্ভর করে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর, যেগুলো এই দেশটির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। দুটো নদীই ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করার কারণে এগুলোর প্রাযুক্তিক ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইসু হয়ে রয়েছে। আমরা মনে করি, নতুন দিল্লি স্বীকার করবে যে বাংলাদেশ অস্থিতিশীল হলে তার প্রভাব পড়বে গোটা অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ওপর।*

বিভাস সাংকেতিক নামের একজন স্পাই কাজ করেছিলেন বাংলাদেশে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ঢাকার ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন ছিল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়ান অনুপ্রবেশ নিষ্ক্রিয় করতে সিআইএ গুপ্ত লোকবল নিযুক্ত করেছিল। সেটা ছিল তীব্র ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপক কমিউনিস্ট প্রচারণা চালাচ্ছিল অনমনীয়রূপে। সিআইএর একটি বিশ্লেষণে বলা হয়:

*এরশাদের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা বাড়াতে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সোভিয়েতরা বাংলাদেশের তরল রাজনৈতিক পরিস্থিতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। আমাদের মতে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মস্কোর নাক গলানোর কারণ তার এই উপলব্ধি, যে এরশাদ যেহেতু তার*

*নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত করেননি তাই বাংলাদেশের পশ্চিমা বিশ্বে ও ইসলামী দেশগুলোর দিকে ভেসে যাওয়া ঠেকানোর এবং বামপন্থীদের অবস্থান মজবুত করার সুযোগ পেয়েছে সোভিয়েতরা। যাই হোক, সোভিয়েতরা সম্ভবত স্বীকার করে যে স্থানীয় সোভিয়েতপন্থী বামপন্থীরা দুর্বল, বহু দলে বিভক্ত এবং বড় কোনও ইসুর অবদান ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন ছাড়া এরশাদ সরকারের পতন ঘটাতে পারবে না। বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতা উপমহাদেশে আরও সোভিয়েত অনধিকারচর্চার সুযোগ করে দিতে পারে।*

বিভাস আমাকে বলেন: 'আমেরিকান স্পাইরা ভীত ছিল এটা ভেবে যে বাংলাদেশে সোভিয়েতের পোক্ত আসন দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকান স্বার্থকে প্রান্তে ঠেলে দেবে। আন্তর্জাতিক মিত্র হিসেবে বাংলাদেশ ছিল খুবই গৌণ, কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে, সোভিয়েতকে কাউন্টার দিতে গেলে, আমেরিকান নীতিনির্ধারকদের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে শক্ত মুঠোয় পুরে রাখাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।'

এরশাদ পররাষ্ট্র বিষয়ক নির্দিষ্ট কিছু ইসুতে প্রকাশ্যে নতুন দিল্লির সমালোচনা করে থাকতে পারেন, কিন্তু ১৯৮৩ সাল নাগাদ র-এর অ্যাসেটদের সাহায্য নিয়ে ভারত পুনরায় প্রভাব ও দুর্দান্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল খুবই সহজ, 'ঢাকাকে যারাই শাসন করুক, ভারতের প্রতি অনুকূল থাকতে হবে তাদের অবশ্যই।'

'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় থেকেই র এই নীতি চর্চা করে এসেছে,' বিভাবস আমাকে বলেন। 'বড় ধরনের নীতি পরিবর্তনের জন্য ১৯৭৫ সালের বিপত্তিই যথেষ্ট ছিল। ওই ঘটনা রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের একটা মূলগত শিক্ষা দিয়েছিল, যে প্রতিবেশীর জটিল সমস্যা সমাধান করা যাবে না অনভিজ্ঞ কূটনীতিকদের দিয়ে। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন এবং ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা জানতেন যুদ্ধ হতে চলেছে দীর্ঘ ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ।'

১৯৮৪ সালের অক্টোবরে নিহত হওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নেন–মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল কো-অপারেশন (সার্ক)-এর বৈঠকে–বাংলাদেশসহ ভারতের নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে প্রায়োগিক কার্যক্রম জোরদার করা হবে। ১৯৮৫ সালের শেষ দিকে ঢাকায় পরবর্তী বৈঠকে সমবেত হতেও অন্যান্য দেশের

নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয় ভারত। রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে তার প্রথম প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্পষ্ট করে দেন, বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলো থাকবে সরকারের টপ প্রায়োরিটিতে। ১৯৮৫ সালে ২রা জুন ঢাকা সফর করেন গান্ধী, তার আগে দেশটিতে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এই সফর দুই দেশের মধ্যকার দৃশ্যমান ফাটল জোড়া লাগাতে সাহায্য করেছিল, এরশাদকে ঘূর্ণিঝড় কবলিত অঞ্চলে ভারতের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন গান্ধী। ১৯৮৫ সালেই আরও দুইবার বৈঠক করেছিলেন রাজীব গান্ধী ও এরশাদ। অক্টোবরে তারা সাক্ষাৎ করেছিলেন বাহামায়, আলোচনা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল গঙ্গার পানি স্বল্পতা বিষয়ক দীর্ঘকালীন সমস্যার ওপর। এই ইসু নিয়ে আলোচনার জন্য মন্ত্রী পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠনে রাজী হয়েছিলেন তারা, যথারীতি নতুন দিল্লিতে একটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার জন্য সে বছরই ডিসেম্বরে ঢাকায় ফের সাক্ষাৎ করেন গান্ধী ও এরশাদ। সেই সময় এমইএ একটা বিবৃতি জারি করেছিল যাতে বলা হয়:

*কিছু সমস্যা স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অভিবাসীর অব্যাহত আগমন। এ বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের সরকারের মধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে, বর্ডার সিকিউরিটি গার্ডের ডাইরেক্টর জেনারেল ও বাংলাদেশ রাইফেলসের মধ্যেও বৈঠক হয়েছে। সম্ভব যেকোনও উপায়ে আমরা এই প্রবাহ বন্ধ করতে চাই আর সে কথা বাংলাদেশকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।*

বিভাস আমাকে বলেছিলেন, র জানত এরশাদ পশ্চিমাদের থেকে বেশ উষ্ণতা পাচ্ছিলেন, বিশেষ করে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির তরফে। সোভিয়েত প্রভাবের বিরুদ্ধে তাদের সেরা টোপ হিসেবে তারা ব্যবহার করছিল একনায়ককে। ১৯৮৬ সালের মে মাসে এরশাদ-নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি জয়লাভ করলে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল সিআইএ। সম্পূর্ণ জালিয়াতির নির্বাচনে ফলাফল কী হবে বিশ্ব তা আগেই জানত; যাই হোক, সিআইএ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল যে এরশাদকে কিছুটা বৈধতা দেবে এই নির্বাচন। সিআইএর একটি রিপোর্টে বলা হয়:

*এরশাদের পরিকল্পনা হল, পার্লামেন্টে সরকারপন্থী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি সংশোধনী পাস করা, যাতে চার বছরের সামরিক শাসনের সময় গৃহীত তার পদক্ষেপগুলো অনুমোদন লাভ করে। আমরা আশা করি সংশোধনী অনুমোদিত হবে; বামপন্থী আওয়ামী লীগ প্রয়োজনীয় আসন পেতে ব্যর্থ হওয়ায় এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছিল এবং অসহযোগ আন্দোলনে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে। সরকারপন্থী দল আরও বেশি আসনে জয়লাভ না করায় সেনাবাহিনী নাখোশ, কিন্তু এরশাদকে নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েই যাবে। তিনি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে কয়েক মাস বিবাদ করার পর অবশেষে নির্বাচন করতে পেরেছেন। আমেরিকান দূতাবাসের মতে, সামরিক আইন শিথিল করা ও নির্বাচনে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে এরশাদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার অংশগ্রহণের সম্মতি আদায় করেছিলেন।*

তিনশো আসনের মধ্যে এরশাদ জয়ী হয়েছিলেন একশো তিরাশিটাতে, এবং জালিয়াতির ভোট নিয়ে হৈচৈ হলেও দ্রুত প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেরও পরিকল্পনা করেছিলেন এরশাদ। সিআইএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এরশাদ দাবী করেন, বাংলাদেশ থেকে সামরিক আইন পুরোপুরি তুলে নেয়া হবে না যতক্ষণ না নির্বাচনের মাধ্যমে বা সামরিক আইন অনুযায়ী ডিক্রি জারি করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত হয়। এসব ঘটনায় ভারত সরকার বিচলিত ছিল। এরশাদ যখন আবার দিল্লি সফরে আসেন, প্রেসিডেন্ট জৈল সিং তাকে বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনে ভারতের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এমইএর নথি থেকে জানা যায়, সিং এরশাদকে বলেছিলেন যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যত বেশি অভিন্নতা রয়েছে ততটা অভিন্নতা পৃথিবীর খুব কম দেশের মধ্যেই দেখা যায়। 'মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আমরা যে এক সঙ্গে রক্ত দিয়েছি তাই নয়, আমরা ইতিহাস ও সংস্কৃতির অভিন্ন সূত্রেও গাঁথা,' প্রেসিডেন্ট জৈল সিং বলেছিলেন এরশাদকে।

নেতায় পরিণত হওয়া বাংলাদেশী একনায়ক নির্বিকার ছিলেন। তার মনোযোগ ছিল দুই দেশের মধ্যকার অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর ওপর। 'ভারতের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের প্রায়ই জিজ্ঞাসা

করা হয়, দেশে ও বিদেশে। জনগণ চিন্তা করে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এখনও অমীমাংসিত, এ অবস্থায় আমরা কীভাবে অর্থপূর্ণ ও স্থায়ী সম্পর্ক অর্জন করতে পারি।' এমইএর নথিতে বলা হয়:

*যেকোনও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেন্দ্রগত প্রশ্ন হচ্ছে, অবশ্যই, ওই ধরনের সমস্যা কিংবা পার্থক্য কতটা সুন্দরভাবে সমাধান করা যেতে পারে। এর উত্তর কি নিহিত রয়েছে সংঘাত, আক্রমণ অথবা চাপের মধ্যে? নাকি সৌহার্দ্য ও সমঝোতার কার্যকর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে? নিশ্চিতভাবেই, দ্বিতীয় অপশনটির ব্যাপারে কোনও দ্বিমত হতে পারে না।*

ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের বিহ্বল করেছিল এরশাদের মন্তব্য। বৈদেশিক স্পাই এজেন্সি হতভম্ব হয়েছিল। বিভিন্ন কাগজপত্রে তাদের জবাব ছিল স্পষ্ট: 'এরশাদের সাংঘর্ষিক মনোভাব যদি অব্যাহত থাকে, তাকে চলে যেতে হবে।'

### শ্যাডো অপারেটরদের প্রত্যাবর্তন

১৯৮৮ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় আসার কয়েক দিনের মধ্যেই র স্টেশন প্রধান, যার সাংকেতিক নাম কৃষ্ণ পটবর্ধন, জুনিয়র এজেন্টদের নিয়ে একটা মিটিং করেন। পটবর্ধন প্রথম যে বিষয়টা জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাংলাদেশের একনায়কত্ব যেভাবে নজরদারী জোরদার করেছে তার মধ্যে এজেন্টরা নিজেদের ছদ্মাবরণ ঠিক রাখতে পেরেছে কিনা। উত্তর ছিল না। মিশনে কর্মরত স্থানীয় লোকজন ছিল এরশাদের চর, ঢাকায় একজন ভারতীয় স্পাইও লৌহ মুখোশ বজায় রাখতে পারেনি।

সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো নতুন নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন করছিল, তাতে বিশাল চাপের মধ্যে ছিলেন এরশাদ। যাই হোক, ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। তার সরকার নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগে পর্যন্ত জরুরি অবস্থা জারি করেন। একনায়ক ঘোষণা করেছিলেন যে নির্বাচন হবে ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, পরে মার্চ পর্যন্ত স্থগিত করেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী ভোট বর্জন করে, ফলে পার্লামেন্টের তিনশো আসনের মধ্যে দুইশো একান্নটি আসন দখল করে এরশাদের রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করতে থাকে এবং ঢাকায় কর্মরত ভারতীয় কর্মকর্তাদের কঠোর নজরদারীর মধ্যে রাখা হয়।

ঢাকায় কার্যক্রম চালানোর আরও কিছু দুর্বলতা আবিষ্কার করেছিলেন পটবর্ধন। এরশাদের বিরোধীদের টার্গেট করে একটা মানসম্পন্ন কার্যপ্রণালী গঠন করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গভীর বিভাজন নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রধান উদ্বেগের বিষয় ছিল বিএনপির বেগম খালেদা জিয়া ও আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনার মধ্যে বহুল-প্রচারিত বিভাজন। উভয় নেত্রীর কাছে যে সাংকেতিক বার্তা দিয়েছিলেন পটবর্ধন সেটা ছিল পরিষ্কার। এরশাদ ছিলেন তাদের অভিন্ন শত্রু, এবং তাদের তিক্ত প্রতিপক্ষকে বর্জন করা ও পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলানোর সময়টা পেকে উঠেছে। বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনা সম্মত হয়েছিলেন যে এরশাদের অপসারণ তাদের প্রধান লক্ষ্য, অন্য ইসুগুলো কিছু সময়ের জন্য অগ্রাহ্য করা হবে। পটবর্ধন মনে করতেন, একনায়কের বিরুদ্ধে এই রাজনৈতিক নেত্রীদ্বয় কার্যকর শক্তি। তাদের মধ্যে সমঝোতা আরও অধিক চাপের মধ্যে ফেলে দেয় এরশাদ সরকারকে, যে সরকার অবৈধ শাসনকে সফলভাবে বৈধ শাসনে রূপান্তর করেছিল।

ইতোমধ্যে, কূটনৈতিক স্তরে, এরশাদ ও ভারত সরকারের মধ্যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার সবরকম প্রয়াস চালান হচ্ছিল। পটবর্ধনের মতে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিল ভারত সমস্যা সৃষ্টিকারী নয় এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে তার একমাত্র অভিপ্রায় হল সেখানে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

'আমি স্টাফদের বলেছিলাম, সোর্স ও ভাড়াটে ইনফর্মারদের সঙ্গে মিটিংয়ের বিবরণ লিখে রাখার চর্চা বন্ধ করতে হবে। কেননা টাইপিস্ট ও যে ব্যক্তি তা ফাইল করে রাখে তারা তথ্য ফাঁস করে দিতে পারে। যেকোনও নথিকরণ বন্ধ করতে হবে। তার পরিবর্তে তথ্যের ভ্যালু বিবেচনা করে হাতে লেখা সংকেত ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমাদের বেশির ভাগ পরিকল্পনা আমরা জমা রাখতাম মাথায়। ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে ভারতে সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু আমাদের অপারেশন চলতেই থাকে কোনও রকম ত্রুটি ছাড়াই। আমরা ছাত্র সংগঠনগুলোর বেশির ভাগ নেতাকে রিক্রুট করেছিলাম, বেগম জিয়া ও শেখ হাসিনাকে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছিলাম এবং নিশ্চিত করেছিলাম যাতে এরশাদ ও তার গুপ্তচররা আমাদের অপারেশন সম্পর্কে কিছু না জানতে পারে,' পটবর্ধন স্মৃতিচারণ করেন।

পটবর্ধনের জন্য ১৯৯০ সালের জানুয়ারির চেয়ে ভাল শুরু আর হতে পারত না। র-এর এই স্পাইমাস্টার বাংলাদেশ সরকারযন্ত্রের মধ্যে ইনফর্মারদের একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এই নেটওয়ার্ক কাজে লাগাতেন সিস্টেমের ভিতরে থাকা ভারতবিরোধীদের ধ্বংস করার জন্য। এক মাস পর পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ঢাকায় পৌঁছান, তিনি কাজ করছিলেন ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংয়ের অধীনে। ভারতীয় প্রতিনিধি দল গঙ্গার পানিবণ্টনসহ দ্বিপাক্ষিক সমস্ত তিক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এদিকে পর্দার আড়ালে পটবর্ধন ও তার টিম এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার তৎপরতা জোরদার করে তোলে, এরশাদ ইতোমধ্যে ভারতের প্রতি ক্ষুব্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠছিলেন। ১৯৯০ সালের প্রথম দিকে একটি ভারতীয় গোয়েন্দা পর্যালোচনায় তাকে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য দীর্ঘমেয়াদী হুমকি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল, পর্যালোচনায় বলা হয়েছিল যে এই ব্যক্তি পশ্চিমা স্পাই এজেন্সিগুলোর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছেন এবং ওই এজেন্সিগুলো এখন গভীরভাবে গেঁড়ে বসেছে ঢাকার প্রশাসনে। এরশাদের সরকারের ভিতরে থাকা একজন ইনফর্মারকে ধরা হয়েছিল পারিতোষিকের বিনিময়ে, ভারতীয় নেটওয়ার্কে তাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল, তার সাংকেতিক নাম ছিল ইসমাইল। তাকে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য একটা আন্দোলনের অগ্রবাহিনী গড়তে রাজনৈতিক নেতাদের রিক্রুট করতে হবে।

ইসমাইল ও পটবর্ধন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের একটা অনন্য পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। পটবর্ধনের জুনিয়র সহকর্মী রাকেশ দীক্ষিত ছিলেন ইসমাইলের কন্ট্রলার। ইসমাইলের যেদিন তথ্য পাচারের প্রয়োজন হত, সেদিন রাকেশ দীক্ষিতকে সরবরাহকৃত দৈনিক সংবাদপত্রের মতামতের পৃষ্ঠা অর্ধেক ছেঁড়া থাকত। এর অর্থ ছিল, ঢাকা নগরপ্রান্তে বুড়িগঙ্গাতীরে একটা পুরনো পাটগুদামে সাক্ষাৎ প্রয়োজন। ১৯৯০ সালের মার্চে পটবর্ধন ও তার টিম আরেকটি বড় সাফল্য অর্জন করে, এরশাদের অধীনে কর্মরত একজন শীর্ষ আর্মি কমান্ডার আইএসআই ও সিআইএর সেইসব অফিসারের নাম র-কে জানিয়ে দেন যারা বাংলাদেশ সরকারের ওপর প্রভুত প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। এরশাদের পশ্চিমাপন্থী নীতি আগামী দশকগুলোতেও যাতে অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে জলের মত টাকা খরচ করেছিল সিআইএ। আইএসআই-এর তৎকালীন প্রধান ছিলেন শামসুর রহমান কালুয়ী, তিনি ছিলেন বেনজির ভুট্টোর অনুগত, আমেরিকানদের সহায়তায় পাকিস্তানি

নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি এবং দুইয়ের যোগসূত্র ভয়ানক হুমকি হয়ে উঠেছিল র-এর অভিযানের জন্য। ১৯৯০ সালের মে মাসের কোনও সময়ে ইসমাইল একজন ক্ষমতাশালী রাজনীতিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন রাকেশ দীক্ষিতকে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক দমন ও এরশাদের শাসন অবসানে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন ওই রাজনীতিক।

'এই ক্ষমতাধর রাজনীতিকের সাংকেতিক নাম ছিল আমির। তিনি আমাদের বলেছিলেন, এরশাদকে অপসারণ এবং আইএসআই ও সিআইএর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ব্যাপক গণ-আন্দোলন। আমি তার এই বক্তব্যে একমত হই। আমাদের প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে আমরা সবসময় উত্তম সম্পর্ক চেয়েছি এবং এরশাদ যতক্ষণ নিরপেক্ষ ছিলেন ততক্ষণ তাকে সহ্য করেছি। কিন্তু আমার ধারণা, অভ্যুত্থানের পর থেকেই তিনি ভারতবিরোধী ঘৃণার বীজ লালনপালন করে আসছিলেন। তাই সচেতনভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যেকোনও উপায়ে তাকে থামাতে হবে,' বলেন পটবর্ধন, এরশাদের সাপোর্ট বেজ ভেঙে দেয়ার ব্যাপারে র-এর গুপ্তচরদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের স্মৃতিচারণ করছিলেন তিনি।

ঢাকায় র-এর বিশ্লেষকরা অপারেশন ফেয়ারওয়েল-এর জন্য সম্পূর্ণ হাতে লেখা একটা মূল্যায়ন প্রস্তুত করেছিলেন। অপারেশন ফেয়ারওয়েল কার্যকর করার জন্য ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে চারজন ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে টাকাসহ প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করা হয়। এই এস্পিওনাজ টিম থেকে বহু দূরে রাখা হয়েছিল কূটনীতিকদের। ইসমাইল ও আমিরের নেটওয়ার্ককে র-এর হয়ে আড়িপাতার কাজে লাগান হয় এবং তাদেরও দেয়া হয় অফুরন্ত টাকা ও অন্যান্য রিসোর্স। সিআইএ যদিও এরশাদ সরকারকে সমর্থন করত, তবু একনায়কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এর গোয়েন্দা মূল্যায়ন ছিল বাস্তবসম্মত। একটি আমেরিকান গোয়েন্দা স্মারকে অকপটে স্বীকার করা হয়েছিল যে এরশাদের কোনও রাজনৈতিক বৈধতা নেই, এমনকি তার তথাকথিত রাজনৈতিক দলেরও জন-সমর্থনের অভাব রয়েছে। সিআইএ উদ্বিগ্ন যে সম্ভাব্য গণ-অভ্যুত্থানের কারণে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলায় এরশাদ নির্দেশ দিলেও হয়তো মানবে না বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

সে বছর অগাস্টের শেষ দিকে ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরে একটা প্রত্যাশিত দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। পরোক্ষভাবে র-এর সমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক

দল, ছাত্র সংগঠন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আরম্ভ করে অপারেশন ফেয়ারওয়েল-এর প্রথম পর্ব। এরশাদের পদত্যাগ এবং জাতিসংঘের অধীনে দেশে নতুন নির্বাচনের দাবীতে রাস্তায় নেমে আসে বিক্ষোভকারীরা। সমস্ত রাস্তা ভর্তি হয়ে যায় জনতার ঢলে। ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে পটবর্ধন ও রাকেশ দীক্ষিত সহ উচ্চপ্রশিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত র অফিসাররা এরশাদের প্রশাসনের ওপর পর্বতসম চাপ বাড়িয়ে অসাধারণ কৌশলগত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন। অক্টোবরের শুরুতে এরশাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জোরদার হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

'এরশাদ শুধু নিজেই নন, এমনকি সিআইএ ও আইএসআই পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে,' স্মরণ করে বলেন পটবর্ধন। 'আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া নেটওয়ার্ক কাজে লাগাই যাতে তারা আগুনে ঘি ঢালতে পারে। সংবাদপত্রের পাতায় জনগণের ক্ষোভ তুলে ধরা হয়, বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর এরশাদের নিদারুণ আঘাত। যদিও এরশাদ চাপ ছুঁড়ে ফেলতে তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, কয়েকজন নেতার বাড়িতে হানা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। দেশটিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আমরা যে স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে আগুন ধরে গিয়েছিল জনগণের চেতনায়। আমাদের পক্ষে এটা ছিল শুধুই আরেকটা কাজের দিন, যদিও আমাদের কয়েকজন জুনিয়র সহকর্মীর সন্দেহ ছিল সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক চলবে কিনা।'

র স্পাইদের লৌহমুখোশ দুর্ভেদ্য রাখা নিশ্চিত করতে অপারেশন ফেয়ারওয়েলে জড়িত সকল ইন্টেলিজেন্স অফিসারের জন্য টেলিফোন যোগাযোগ ও সর্বজনীন দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পটবর্ধন বলেন, তিনি এরশাদকে ও পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোকে নজরদারী ও আড়িপাতার সুযোগ দিতে চাননি। ১৯৯০ সালের ১লা অক্টোবর অপারেশন ফেয়ারওয়েল আবার একটা মোমেন্টাম অর্জন করে যখন শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে একত্রিত করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠন করে এবং এরশাদের সরকারের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন চাপ সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সামরিক একনায়কত্ব বিরোধী আবেগ সফলভাবে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক গণসমাবেশ ঘটায়। পরবর্তী এক সপ্তাহ পটবর্ধন ও তার অভিজ্ঞ স্পাইদের টিম এরশাদের বিক্ষোভবিরোধী পদক্ষেপের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অপারেশনের দ্বিতীয় পর্বের ওপর মনোযোগ

কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। সরকার কী ধরনের সামরিক অ্যাকশন নিতে চলেছে সে সম্পর্কে আগাম জানতে পারায় তারা নতুনভাবে পরিকল্পনা সাজিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ইসমাইল ও আমির একটা গণ-আন্দোলনের জন্য সমর্থন জড় করতে বিভিন্ন সংগঠনে পরীক্ষিত চর নিয়োগ করেন। বড় প্রচেষ্টা ছিল, পটবর্ধন স্মরণ করে বলেন, এটা নিশ্চিত করা যে ওই ধরনের যেকোনও আন্দোলনে ভারতের পদচ্ছাপ যেন দৃশ্যমান না হয়।

'শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় হস্তক্ষেপের চিহ্ন রেখে আসার সামর্থ্য আমাদের নেই। আমরা ছিলাম একা। শীর্ষ পর্যায়ে খুব সামান্য কয়েকজন জানতেন, ভারতীয় স্পাইদের ছোট একটা দল শত্রু এলাকায় কাজ করছে,' পটবর্ধন বলেন।

যাই হোক না কেন, পটবর্ধন তার সহকর্মীদের বলেন আন্দোলনের নেতা ও ইনফর্মারদের আশ্বস্ত করতে যে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত না পর্যন্ত ভারতের অবিচল সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। অপারেশন ফেয়ারওয়েল পরিচালনাকারী টিমের এখন দরকার পরিকল্পনার শেষ পর্বের জন্য টেকসই ও চরম চাপযুক্ত আন্দোলন। টিম ১৯৯০ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ হাতে লেখা সমস্ত নোট ধ্বংস করে ফেলেছিল, যাতে কোনও কারণে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেলেও গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নির্ণয় করা না যায়। ইতোমধ্যে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন এরশাদ। তিনি জেনে গিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর নিরঙ্কুশ সমর্থন অসম্ভব এবং যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের ওপর আশা রাখা বৃথা। ইসমাইল ও আমিরকে রাকেশ দীক্ষিত জানান, যুদ্ধ এখন রাস্তা থেকে সরে গেছে মনে এবং এরশাদ বেশি সময় সরকারকে ধরে রাখতে পারবেন না। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কখন ও কীভাবে যাবেন।

বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তাবাহিনীর একটা অংশের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয় নভেম্বরের শেষ দিকে এবং এরশাদের প্রশাসন নির্মমভাবে মিডিয়ার ওপর সেন্সর চালায়। ইসমাইল দীক্ষিতকে জানান, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ছাড়াও এক ডজনেরও বেশি রাজনৈতিক দল এরশাদের দুর্নীতি ও অবৈধ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

১৯৯০ সালের ২৫শে নভেম্বর পটবর্ধন ও তার টিম ছায়ার অন্তরালে চলে যান। দুই দিন পর সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এরশাদ এবং বড় শহরগুলোয় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত গোয়েন্দা অভিযান বহু-প্রতিক্ষিত ফল দেয় পর দিন। ছাত্ররা ও রাজনৈতিক দলগুলো

সান্ধ্য আইন লংঘন করে এবং, আসন্ন দিনগুলোয় যদিও অনেকের প্রাণ যায়, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে। আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন একনায়ক, ১৯৯০ সালের ২রা ডিসেম্বর ঘোষণা করেন যে পরের বছর প্রথম দিকে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এরশাদের সর্বশেষ পদক্ষেপের খবর যখন টিমের কাছে পৌছায়, তখন স্পাইদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল হাসির ফোয়ারা। তারা জানতেন, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আবার প্রতিক্রিয়া দেখাবেন এরশাদ। এবং তিনি দেখিয়েছিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর প্রায় এক লাখ লোক ঢাকায় মিছিল করে, এটা ছিল এরশাদের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন প্রতিবাদ। অবিলম্বে তার পদত্যাগ দাবী করছিল তারা। কয়েক ঘন্টা পর এরশাদ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তার পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেবে। পটবর্ধন ও টিমের বাকিরা দারুণ উৎফুল্ল ছিলেন, যদিও তারা আতশবাজির উৎসবে মেতে উঠতে পারেননি যেমনটা মেতে উঠেছিল রাস্তার জনতা।

কয়েক দিন পর ভারতীয় সরকার সতর্কভাবে লিখিত এই বিবৃতি প্রকাশ করে:

> *ছাত্রদের দ্বারা সূচিত ও বাংলাদেশী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাপক অংশগ্রহণে দুই মাসের বিরতিহীন আন্দোলনে ৬ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করেছেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমেদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন, যিনি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।*

পরবর্তী সময়ে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, ভারতীয় সরকার বিবৃতি দেয়:

> *পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা অভিনন্দন জানানোর মত ঘটনা এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য ভারত উন্মুখ হয়ে আছে।*

পটবর্ধন বলেন, ১৯৯০ সালের ১১ই ডিসেম্বর এরশাদকে গৃহবন্দী করা হয়, এর আগে পর্যন্ত এরশাদ অপারেশন ফেয়ারওয়েল সম্পর্কে কিছু জানতেন না। অন্তর্বর্তী সরকারের এই আকস্মিক পদক্ষেপে এরশাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাও বিপাকে পড়েন। সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী।

'আমার মনে হয়, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডার নাসিরুদ্দীন আহমেদ র-এর অপারেশন সম্পর্কে এরশাদকে জানিয়েছিলেন। অল্প কয়েকদিন পর আমি জানতে পারি, এরশাদ এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন অপারেশন কীভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং তার রাষ্ট্রপতিত্বের আমলে কাউন্টারএস্পিওনাজ ইউনিট সম্পূর্ণ অকেজো ছিল কিনা। তার পক্ষে আসলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে আমরা খেলাটা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে খেলেছি আর অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। আমরা পরে জানতে পারি, বাংলাদেশে সক্রিয় ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের সম্পর্কেও এরশাদ জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তার আস্থাভাজন লেফটেন্যান্টদের কারও কাছেই তাদের কোনও নাম কিংবা অবয়ব ছিল না,' পটবর্ধন বলেন।

'তিনি কি কখনও আপনার পরিচয় সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন?' আমি জিজ্ঞেস করি পটবর্ধনকে।

'আমার তা মনে হয় না। কিন্তু যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এবং বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলেন, আমি বেশ কিছু ফিলার পেয়েছিলাম জেনারেল এরশাদের সঙ্গে একটা মিটিংয়ের ব্যাপারে। আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, কিন্তু আমার মনে নিশ্চিত সন্দেহ ছিল, তিনি জেনেছিলেন বা সন্দেহ করেছিলেন যে আমিই সম্পন্ন করেছিলাম অপারেশন ফেয়ারওয়েল,' মুখ টিপে হাসেন পটবর্ধন।

২

# একজন যোদ্ধা আর অনেক যুদ্ধবাজ

'আইয়ে, আশফাক সাহিব (স্বাগতম, আশফাক সাহেব),' বলল একটা ভরাট কণ্ঠস্বর, বিলাসবহুল হোটেল সুইটের ছায়ার ভিতর থেকে। হোটেল মারমারা তাকসিম। ইস্তানবুলের একদম মাঝখানে অবস্থিত। আশফাক খান ভিতরে ঢুকছেন, ছয় ফুট লম্বা একজন পাঠান একটা কালাশনিকভের নল ঠেকাল তার বুকে।

'*নাহি, কোই জরুরৎ নাহি। ইয়ে দোস্ত হ্যায়* (কোনও দরকার নেই, উনি একজন বন্ধু),' কণ্ঠস্বরটা বলল, তাতে পাঠানের জন্য খানিকটা তাচ্ছিল্য। পাঠান লোকটার বয়স চৌত্রিশ বছর। এসেছে মাজার-ই-শরীফ থেকে।

স্পষ্টতই, খান সেই দুর্লভ ব্যক্তিদের একজন যাকে দেহতল্লাশি না করেই ২০৯ নম্বর কামরায় ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

'কেমন আছেন, মির্জা সাহেব?' খান তার হোস্টকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। বিশালবপু মানুষটা যিনি খানকে ওই রকম অনুরাগের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন, তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের কিংবদন্তীতুল্য যুদ্ধবাজ নেতা মির্জা মুরাদ রুস্তম। বর্তমানে তিনি তার অবস্থান আফগান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

খানের পিঠ চাপড়ে দেন মির্জা। '*আচ্ছা হ্যায়, হামকো থোড়া বহুৎ হিন্দি আতা হ্যায়, আপ লোগো সে হি সিখা হ্যায়, ঘাবরাইয়ে নাহি* (আমি খুব ভাল আছি, আপনার লোকদের কাছ থেকে একটু হিন্দি শিখেছি, চিন্তা করবেন না)।'

র এজেন্ট আশফাক খান ১৯৯৭ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই অধরা জেনারেলকে খুঁজে ফিরছিলেন, ওই সময় মির্জা নিজেরই লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল মালিক পাহ্‌লাওয়ানের বিশ্বাসঘাতকতার পর মাজার-ই-শরীফে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদা পরম আস্থাশীল পাহ্‌লাওয়ান শান্তভাবে মির্জাকে ও তার দুর্গটাকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন তালিবানের মোল্লা ওমরের কাছে। বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ছিল ব্যক্তিগত।

পাহ্লাওয়ানের একজন আত্মীয় সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে খুন হয়েছিল এবং তিনি মনে করতেন মির্জা ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইসমাইল খানের হাত রয়েছে এর পিছনে। ১৯৯৭ সালের ২৫শে মে মাজার-ই-শরীফে গোপনে ঢুকে পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছিল তালিবান যোদ্ধাদের, সে সময় অল্পের জন্য মৃত্যু থেকে বেঁচে যান মির্জা। যদিও পাহ্লাওয়ান উপলব্ধি করেছিলেন যে তিনি একটা ভুল করে ফেলেছেন এবং তালিবান যোদ্ধাদের খতম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মির্জা ও তার প্রিয় নগরের পক্ষে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

মির্জাকে ১৯৭৯ সালের কোনও এক সময়ে রিক্রুট করেছিল ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র। তিনি তখন ছিলেন মাঝারি র‍্যাংকের আর্মি অফিসার। র যখন মাজার-ই-শরীফে তালিবানের ঢুকে পড়ার খবর জানতে পারে, তখন বিস্মিত হয়। মির্জার পলায়নের সময় একজন ভারতীয় স্পাই প্রাগ সফর করছিলেন, তার সাংকেতিক নাম এস. রেড্ডি। মির্জার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছিল তাকে। মির্জার অবস্থান জানতে তুরস্কে র-এর অ্যাসেটরা তৎপর হয়ে ওঠে। আফগান অভিবাসীদের ভিতর অনুসন্ধান করেও কোনও ফল মেলে না। কয়েক দিন পর রেড্ডি জানতে পারেন, ইস্তানবুলের একটা পাঁচ তারকা হোটেলে ছদ্মনামে অবস্থান করছেন মির্জা। অভিজ্ঞ অপারেটিভ আশফাক খান ছিলেন ফ্রাংকফুর্টে। মির্জাকে খুঁজে বের করতে বলা হয় তাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইস্তানবুলে এসে উজবেক যুদ্ধবাজ নেতাকে খুঁজতে শুরু করেন খান। পাহ্লাওয়ানের বিশ্বাসঘাতকতায় ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে মির্জা ছিলেন পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধার একটা বাহিনীর কমান্ডার এবং উত্তর আফগানিস্তানে তার অধীনে ছিল একটা মুক্ত অঞ্চল।

তালিবানের হাতে কাবুল পতনের পর ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে মির্জার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আশফাকের। কিন্তু সেই সাক্ষাৎ ছিল মাত্র পাঁচ মিনিটের। তার কাজ ছিল মির্জার কাছে সাহায্য পৌঁছে দেয়া। যতদূর সম্ভব মির্জাকে সাহায্য করার কাজ পেয়েছিলেন তিনি আরও একবার। স্পাই ও যুদ্ধবাজ নেতার মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তালিবানের উত্থান ও তাদের প্রতি পাকিস্তানের নীরব সমর্থন যা ভারতের স্বার্থের জন্য হুমকি।

'আফগানিস্তানে আপনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারবেন না,' রেড্ডি আমাকে বলেন। 'যুদ্ধবাজ নেতাদের কাছে গোপন কিছুই নেই। সোভিয়েত অভিযানের সময় দুটো কার্যকর রিক্রুটমেন্ট করেছিল র, প্রতিটা বিপরীত

শিবিরে। একজন মির্জা, যিনি যুদ্ধ করছিলেন মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে। অন্যজন আহমদ শাহ মাসুদ, যিনি ছিলেন বুরহানুদ্দীন রব্বানীর বিশ্বস্ত সহযোগী ও জামায়াত-ই-ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নেতা, যুদ্ধ করছিলেন সোভিয়েত ও আফগান বাহিনীর বিরুদ্ধে। সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান হলেও দুজনই ছিলেন আমাদের মুকুটমণি।'

একটু থেমে রেডিড বলেন: 'আফগানিস্তানে মাসুদ ছিলেন একমাত্র যোদ্ধা। বাকিরা সবাই ছিলেন যুদ্ধবাজ।'

### আফগান রঁদেভুর শুরু

সঙ্কট কবলিত পার্বত্য দেশ আফগানিস্তান যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে, তখন সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) ও পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) নামক সংস্থা দুটির স্পাইদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানে র-এর গুপ্তচররাও ছিল। এমন এক পরিস্থিতিতে ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা কাজ করছিল যেখানে যুক্তরাষ্ট্র অকাতরে পাকিস্তানকে নগদ টাকা ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছিল ওই অঞ্চলকে সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত করতে এবং ভারতের ক্ষতি করার জন্য পাকিস্তান সেসব অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করছিল সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোকে।

কিন্তু ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের কয়েক মাস আগেই আফগানিস্তানে সৃষ্ট হুমকি দেখতে পেয়েছিল র। যথারীতি ওই অঞ্চলে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের তৎপরতাও বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুজাহিদীন ও আইএসআই-এর সখ্য প্রতিহত করতে এবং আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে যুদ্ধে ভারতের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেটা নিশ্চিত করতে মিত্র প্রয়োজন ছিল র-এর। আইএসআই সবসময়ই শত্রু এবং সিআইএর সঙ্গে এর অংশীদারিত্বের ফলে গুরুতর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তানি সংস্থাটি তীব্র ক্ষোভ পোষণ করত র-এর ব্যাপারে, ১৯৭১ পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি এবং বেলুচিস্তানে হস্তক্ষেপের জন্য র-কে দায়ী করত সংস্থাটি। আফগানিস্তানের ব্যাপারে যখন সোভিয়েত, পাকিস্তানি ও আমেরিকানদের উৎসাহ ক্রমবর্ধমান, সেই রকম পরিস্থিতিতে ক্ষতিকর অংশগুলোকে পরীক্ষা করার একমাত্র উপায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে শত্রুব্যূহের পিছনে থাকা অ্যাসেটদের ওপর বিশ্বাস রাখা।

আফগানিস্তানে ভারতীয় স্পাই এজেন্সির লক্ষ্য ছিল দুটো। প্রথমত, আইএসআই-এর মদদপুষ্ট মুজাহিদীনের প্রভাব ক্ষুণ্ন করতে ভারতপন্থী অংশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তৃত করা ও গোয়েন্দা তথ্যের শূন্যতা পূরণে মানব অ্যাসেট উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ান। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য দেশটির প্রতিটা শক্তিশালী গ্রুপে সোর্স নিয়োগ করা।

এস. রেড্ডি, বেদ আস্থানা ও আস্থানার জুনিয়র আশফাক খান সাংকেতিক নামের তিন র অফিসার প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন আফগানিস্তানের ভিতরে অ্যাসেটদের পরিচালনায়। এসব অ্যাসেটকে রিক্রুট করা হয়েছিল সঙ্কটপূর্ণ দেশটির বিপর্যয়ের নানা পর্যায়ে, কিন্তু প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়েছিল। অসংখ্য ইনফর্মার নিযুক্ত করেছিল র, তাছাড়াও মদদ দিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ আফগান নেতাদের—আহমদ শাহ মাসুদ, মির্জা মুরাদ রুস্তম ও আবদুল জলিলকে। বিনিময়ে পেয়েছিল অমূল্য তথ্য। এটা ছিল একটা ইন্টেলিজেন্স কু। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছিল ১৯৯৬ সালে তালিবান কাবুল আক্রমণ করলে, তখন অ্যাসেটরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। পাল্টাবিদ্রোহের একটা সফল কৌশল গঠনে কোয়ালিশন বাহিনীকে সাহায্য করতে র-এর তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তালিবানের উত্থান।

আফগানিস্তানে র-এর জড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় চালিকা ছিল চরম বৈরী অঞ্চলটির ইতিহাস এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অরাষ্ট্রীয় ক্রীড়নকের পদ্ধতি প্রয়োগ। আফগানিস্তানে র-এর চালান গুপ্তচরবৃত্তির অভিযানগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করতে সময়মত ফিরে যাওয়াই শ্রেয়।

গুপ্তচররা আসার বহুদিন আগের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পৃথক পাখতুনিস্তানের দাবী। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, পাখতুনদের জন্য একটা স্বায়ত্তশাসিত কিংবা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। পাখতুনরা হল পশতুভাষী উপজাতি, আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ও এখন পাকিস্তানে তাদের বাস। এই আন্দোলনের দাবীকৃত ভৌগোলিক অঞ্চল সময়ে সময়ে বদলে গেছে। মূলগতভাবে তিনটি স্টেট চিত্রল, পীর ও সোয়াত এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও ডুরান্ড লাইনের মধ্যবর্তী উপজাতি অধ্যুষিত ছয়টি এজেন্সি অন্তর্ভূক্ত ছিল প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে। ডুরান্ড লাইন ছিল ব্রিটিশ ভারত ও আফগানিস্তানের সীমা নির্দেশক রেখা। ১৯৪৭ সালের অগাস্টে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর পাখতুন, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয় পাখতুনিস্তান।

আফগানিস্তান ও নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে করাচিতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে আফগানরা কোনও অঞ্চলগত বা জনসংখ্যাগত দাবী করেনি, কিন্তু সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদানের দাবী জানিয়েছিল। ইতোমধ্যে 'সীমান্ত গান্ধী' হিসেবে পরিচিত খান আবদুল গফফার খান ১৯৪৮ সালের মার্চে পাকিস্তান পিপল'স পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির লক্ষ্যগুলোর একটি ছিল, স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী ছেড়ে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ভিতরেই স্বায়ত্ত্বশাসিত পাখতুনিস্তান প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৪৮ সালের জুন মাসে গফফার খানকে গ্রেপ্তার করেন সীমান্ত প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী। যদিও গভর্নর রিপোর্ট করেছিলেন যে সেই সময় পাখতুনিস্তান সীমান্ত প্রদেশের কারুরই গুরুতর দাবী ছিল না এবং এ নিয়ে তর্কবিতর্কও ছিল না। এই আন্দোলনের একমাত্র যেটুকু বাস্তবতা অবশিষ্ট ছিল তা হল পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে জনসাধারণের অনীহা। আফগান সরকার খোলাখুলি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল পাখতুনিস্তান আন্দোলনকে, বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সহায়তাও দিয়েছিল।

১৯৫৫ সালে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাব নিয়ে একটি ইউনিট গঠন করা হয়। এটাকে পাঠানদের স্বাধীন পরিচয় ধ্বংস করার পাকিস্তানি উদ্যোগ বলে বিবেচনা করেছিল আফগান সরকার। সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আফগান সরকারের আলোচনার উদ্যোগ ভেস্তে যায় ১৯৫৯ সালে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক ধসে পড়ায় ১৯৬১ সালে আফগানিস্তান থেকে নিজেদের দূতাবাস প্রত্যাহার করে নেয় পাকিস্তান। যাই হোক, দুই বছর পর, ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা চরমে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে, ইরানের শাহ্-এর মধ্যস্থতায় পাকিস্তান আবার সম্পর্ক স্থাপন করে আফগানিস্তানের সঙ্গে।

পাকিস্তানের মধ্যেই পাখতুনিস্তানের দাবীদাররা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আবদুল ওয়ালী খানের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি চেয়েছিল পাখতুনিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, কিন্তু অন্যান্য নেতারা যেমন মোহাম্মদ আইউব খান ও আবদুস সামাদ আচাকজাই চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। আবদুল গফফার খান স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু পশতু ও বেলুচভাষী অঞ্চলগুলোর ঐক্যবদ্ধ থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পাখতুন ও বেলুচদের মধ্যে সমন্বয় ঘটলে সাগরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটা বহির্গমন পথ পেয়ে যেত পাখতুনিস্তান, স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানের জন্য সেটা হত একটা আশীর্বাদ।

১৯৭১ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে যখন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে পাকিস্তান সরকার, সেই সময় কিছু সংখ্যক পাখতুন নেতা সেটাকে তাদের দাবী সামনে তুলে ধরার সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তবে আফগান সরকার উপলব্ধি করেছিল, পাখতুনিস্তানের জন্য প্রকৃত আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানি নেতারা আচমকা আফগানিস্তান সফরে যান, পাখতুনিস্তানের পক্ষে প্রপাগান্ডা না চালানোর অনুরোধ করেন আফগান সরকারকে। এ ব্যাপারে তারা কোনও প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হন। পূর্ব পাকিস্তান বিলুপ্ত হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ায় এক নতুন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশে, এবং পাকিস্তান উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল নিজের অখণ্ডতা, স্থিতিশীলতা ও ঐক্য নিয়ে। এর পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও প্রতিবেশী দেশ ইরান। ১৯৭৩ সালের মে মাসে ইরানের শাহ্ বিবৃতি দেন যে পাকিস্তানের আর কোনও বিভাজন ইরান মেনে নেবে না, বিশ্বকে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে হবে যে যেকোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না ইরান, যে ধরনের ঘটনা হয়তো সৃষ্টি হতে পারে বেলুচিস্তানে।

কিন্তু আফগানিস্তানের নতুন প্রজাতান্ত্রিক সরকার, ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের পর, আবার নতুন করে পাখতুনিস্তান আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বিবেচনা করলেও, আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলনে আফগান প্রতিনিধিরা পাকিস্তান কর্তৃক পাখতুন ও বেলুচ নেতাদের আটক করার বিষয়টি উত্থাপন করেন।

আফগান নেতারা জানতেন, পাখতুনিস্তান যদি আফগানিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হয়, তা হলে স্থলপরিবেষ্টিত আফগানিস্তানকে সামুদ্রিক পথে ট্রানজিটের জন্য পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করতে হবে না। ভারত এই পদক্ষেপকে স্পষ্টভাবে সমর্থন দিয়েছিল, কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে আফগানিস্তানের এত জোর ছিল না যে পাকিস্তানের একটা অংশকে টেনে বের করে নেবে, যেমনভাবে পূর্ব অংশটাকে বের করে নিয়েছে ভারত। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের পদক্ষেপ অনুমোদন করত না। উভয় দেশেরই আগ্রহ ছিল এ অঞ্চল নিয়ে। বাইরের সমর্থনের অভাব ও অভ্যন্তরীণ সংযোগপ্রবণতার কারণে পাখতুনিস্তান

আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণের সম্ভাবনা তেমন ছিল না, তবে টিকে ছিল সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সচেতনতা আর আফগানিস্তান ও ভারতের কিছুটা সাহায্যে। ভারত সরকার জানত, সেখানে চোখ-কান রাখলে তার সুবিধা আছে। ওই অঞ্চলে র-কে একটা দুর্দান্ত ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশনে পরিণত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সেখানে ভাড়া করা হয় শত শত ইনফর্মার ও ফিল্ড এজেন্টকে। র-এর নথি অনুসারে, আফগানিস্তানের খাল্‌ক্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারি যখন চৌদ্দতম বার্ষিকী উদযাপন করছিল, ভারতীয় স্পাই এজেন্সির চিফ এন. এফ. সান্টুক ওই অঞ্চলে তখন অপারেশন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। র অফিসারদের সেখানে উজবেক ও শিয়া যুদ্ধবাজদের রিক্রুট করতে বলা হয়েছিল। তারা বাছাই করেছিল মির্জাকে। তিনি তখন উত্তরাঞ্চলীয় আফগানিস্তানের জওজান প্রদেশে এক আফগান আর্মি ব্যাটেলিয়নে মোতায়েন ছিলেন। ক্ষমতার প্রতি তীব্র ক্ষুধা ছিল তার। 'তিনি ডানামেলা পাখি, খাঁচায় বন্দী কর তাকে,' ভারতীয় গুপ্তচরদের বলা হয়েছিল।

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর মুহাম্মদ তারাকী তার সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট ছিলেন। পার্টির ক্যাডার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংহত করছিলেন তিনি এবং কিছু হাঙ্গামা সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে আইন পাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তারাকীকে সমর্থন দিয়েছিল র, কিন্তু অ্যাসেটদের পরিধি বাড়াতে অন্যান্য গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরও রিক্রুট করেছিল। দিগন্তে একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মেঘ উঁকি দিচ্ছে, সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না তারাকী। র-এর একটি ডিসপ্যাচ থেকে জানা যায়, ১৯৭৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি কাবুলে হত্যা করা হয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত অ্যাডল্ফ ডাব্‌সকে। সেটাই ছিল যুদ্ধের প্রথম চিহ্ন। র-এর স্পাইরা বলেন, শহুরে গেরিলা আর আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ে নিহত হন ডাব্‌স, গেরিলারা তাকে অপহরণ করেছিল। ভারতীয়দের বিশ্বাস করার ভাল কারণ ছিল যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের জীবনের কথা যথেষ্ট বিবেচনা না করেই সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেছিল আফগান নিরাপত্তা বাহিনী।

১৯৭৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তান জুড়ে শিয়া ও সুন্নী মোল্লাদের ধরপাকড় করা হয়। আটক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহিম মুজাহিদী ওরফে শোর বাজারের হজরত সাহেব, একজন শীর্ষস্থানীয় সুন্নী নেতা। র-এর ফিল্ড এজেন্টরা রিপোর্ট করেছিল যে মীর ইউসুফ, আবদুর রহমান ও নূর ইকবাল সহ তার প্রায় চল্লিশজন অনুগামীকে আটক করা

হয়েছিল। আটককৃত শিয়া নেতাদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ কিয়ান, শেখ মোহাম্মদ ওয়াইজ, ইউসুফ বিনিশ ও মজিদ রিয়াসী। এসব ধরপাকড়ের অনিবার্য পরিণতিতে রক্ষণশীল জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতীয় স্পাইরা একদিকে যখন যুদ্ধবাজদের দলে ভেড়াচ্ছিল, তখন সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে বিপুল সংখ্যক আফগান রাজনীতিক ও সক্রিয়কর্মীকে আটক করে কারাগারে ঢোকান হয়েছিল। তারাকী-বিরোধী দুইশোরও বেশি লোককে আটক করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন সীমান্ত প্রদেশ সংক্রান্ত সাবেক মন্ত্রী নিজামুদ্দীন তেহ্‌জিব, বাদাখশানের সাবেক গভর্নর উসমান রাসিখ, জনস্বাস্থ্যের সাবেক সভাপতি ডা. ফারুক প্রমুখ। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের কারাগারে পাঠান হয়। স্পাইদের মতে, কাবুল ও কাবুলের আশেপাশে তারাকীপন্থী ও তারাকীবিরোধী আর্মি অফিসারদের মধ্যে হানাহানি নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। আফগান ইন্টেলিজেন্সকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট, যাতে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ১৯৭৯ সালের মার্চে আফগান বেসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ইউনিটগুলোকে নিয়ে গঠিত হয় একটা সংগঠন আগসা (ডিপার্টমেন্ট ফর সেফগার্ডিং ইন্টারেস্টস অফ আফগানিস্তান)। বিমানবাহিনীর সাবেক পাইলট ও তারাকী অনুগত মেজর আসাদুল্লাহ্‌কে এই নতুন গোয়েন্দা সংগঠনের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ ও হত্যার প্রতিবাদে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, তা দাঁড়ায় প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার। এর আগে তা ছিল বার্ষিক প্রায় ১৫ মিলিয়ন ডলার।

অকুস্থল থেকে ভারতীয় এজেন্টরা জানায় যে তারাকী সরকারের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীতে দ্রুত গতি সঞ্চারিত হচ্ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছিল এতটাই দ্রুত ও বিশাল সাফল্যের সঙ্গে যে সরকারও তা আশা করতে সাহস পায়নি। কিন্তু বামপন্থী পিপল'স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ আফগানিস্তান (পিডিপিএ) দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল–খাল্‌ক ও পার্‌চাম। খাল্‌কের প্রধান ছিলেন তারাকী, পারচামের নেতা বাবরাক কারমাল। একটি উপদল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল অন্য উপদলটির ওপর।

'ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স যখন আফগানিস্তানের ভিতরে অ্যাসেটদের সন্ধান

করছিল, তারা দেখতে পায় সরকার কয়েকটি সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে সামনে এগোচ্ছে, তার মধ্যে দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে সাক্ষরতাও ছিল, এবং ১৯৭৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি কাবুলে একটি বিজ্ঞান একাডেমিও উদ্বোধন করা হয়। সোভিয়েত প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী ভাসিলি আর্খিপভের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কাবুল সফর করে, সংক্ষিপ্ত সফরটি ছিল ১৯৭৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১লা মার্চ পর্যন্ত। অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যাই হোক, আফগানদের মধ্যে স্বাধীন ও খানিকটা দ্বন্দ্বপ্রিয় মনোভাবের ক্রমবর্ধমান আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, অন্যদিকে সোভিয়েত মনোভাব ছিল দুই দেশের মধ্যে সার্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। কিন্তু আমাদের হিসাব হয়তো ভুল ছিল,' রেড্ডি বলেন।

ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের জন্য ভারতীয় এজেন্টরা যে ডিসপ্যাচ তৈরি করেছিল ১৯৭৯ সালের মার্চে, তাতে দেখা যায় তারাকীর জন্য পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত খারাপ। গত কয়েক মাস ধরে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে প্রসারিত হয়েছিল সরকারবিরোধী বিদ্রোহ। মার্চের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় সবগুলো প্রদেশে সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়েছিল, যা ছিল গুরুতর ও সহিংস। এই পরিস্থিতি চরম সীমায় পৌঁছায় ১৯৭৯ সালের ১৫ই মার্চ, পশ্চিমাঞ্চলীয় হেরাত নগরী সেদিন যেন আগুনে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ধর্মীয় অংশের ওপর সরকারের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক নগরবাসী শান্তিপুর্ণ প্রতিবাদ করছিল, মুহূর্তের মধ্যে তা রূপ নেয় সাধারণ গণ-অভ্যুত্থানের। হেরাত নগরী বিদ্রোহীদের হাতে ছিল ছত্রিশ ঘণ্টা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সেখানে নতুন করে সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি-সমাবেশ ঘটায় বিপুল পরিমাণে। এসবের মধ্যে ছিল সীমান্তের ওপার থেকে আনা সোভিয়েত বিমান। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে সরকার সেখানে আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় ২০শে মার্চ। চার থেকে দশ হাজার মানুষ নিহত হয় এই গণ-অভ্যুত্থানের সময় এবং প্রায় তিনশো সোভিয়েত পুরুষ, নারী ও শিশু আহত হয়েছিল। এমনকি মাসের শেষেও হেরাত ও আশপাশের এলাকা উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্বাভাবিক ছিল, সরকারের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও।

গণ-অভ্যুত্থানের পর আফগান সরকার শীর্ষ স্তরে কয়েকটি পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল হোমল্যান্ড হাই ডিফেন্স কাউন্সিল (এইচএইচডিসি) গঠন। তারাকীর সরকারের মধ্যেই একটা সরকার হিসেবে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এই কাউন্সিল। যাবতীয়

প্রকৃত ক্ষমতা নিহিত ছিল প্রেসিডেন্ট তারাকী ও প্রথম মন্ত্রী হাফিজুল্লাহ্ আমিনের হাতে, এইচএইচডিসির ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন আমিন। র-এর ভারতীয় স্পাইদের মির্জা ও অন্যান্য অ্যাসেটরা তথ্য দিয়েছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শে তারাকী এসব সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বেসামরিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে হাফিজুল্লাহ্ আমিনের ক্ষমতা সীমিত করার একটা উদ্যোগ ছিল স্পষ্ট। এবং ব্যাপাকভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, তারাকী সরকারের গণবিদ্রোহ বিরোধী পদক্ষেপ ছিল কঠোর ও নির্যাতনমূলক। একটা ইন্টেলিজেন্স ডিসপ্যাচে বলা হয়:

*আফগানিস্তানে '৭০-এর দশকে যা বিপ্লব হিসেবে শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা নির্বোধ স্বৈরশাসনে পরিণত হয়েছে। শাসকরা জনসাধারণকে কাবু করতে সম্ভবত সর্বোচ্চ শাস্তিদানের এই নীতি প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু এই নীতি বিদ্রোহীদের সঙ্কল্প আরও কঠিন করেছে এবং নমনীয় না করে তাদের আরও সহিংসতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধীপক্ষের ক্রমবর্ধবান বেগমাত্রার মধ্যে এই দেশটির পাকিস্তানবিরোধী বিবৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমবারের মত তারা এখন খোলাখুলি অভিযোগ করছে, এদেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধীপক্ষকে প্ররোচিত করছে পাকিস্তান এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক, এ অবস্থায় আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইরান ও পাকিস্তানকে সাবধান করে দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আফগানিস্তানে ক্রমবর্ধমান হারে অস্ত্র সরবরাহের মাসে এ ধরনের ইঙ্গিত ছিল।*

১৯৭৯ সালের এপ্রিলে ভারত সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল র, যে আফগানিস্তানে গণবিদ্রোহ গুরুতর রূপ নিয়েছে। দেশটির অধিকাংশ প্রদেশে হাঙ্গামা হচ্ছিল, সশস্ত্র বাহিনী পরিত্যাগ ও নৈতিক অবক্ষয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। তারাকী সরকার বেসামরিক পার্টি ক্যাডার ও স্কুলের বালকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছিল, আফগান ভূখণ্ডে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধন আগ্রাসনের ফলে।

রেড্ডি বলেন, পাকিস্তানি ভূখণ্ডের পাখতুনরা তারাকীর ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল দুটো কারণে–তারা সরকারের মৌখিক সমর্থন পাচ্ছিল না এবং আফগান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপজাতীয় ধর্মীয় নেতাদের নিপীড়নের ফলে দেশ ছেড়ে

বেলুচিস্তানে গমন ক্রমশ বাড়ছিল। পাকিস্তানের জন্য এই পরিস্থিতি ছিল আদর্শ, তারা তারাকীর বিরুদ্ধে দেশান্তরী আফগানদের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আফগান নেতারা যে পাখতুনিস্তানকে মদদ দিয়েছিলেন সে কথা পাকিস্তান ভুলে যায়নি বা তাদের ক্ষমাও করেনি। ওই আন্দোলন সফল হলে পাকিস্তান আবার ভেঙে যেত। আগে পাকিস্তানই তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলাতে আফগান নেতাদের সাবধান করে দিয়েছিল, এবার আফগানিস্তানের পালা ছিল তার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অভিযোগ করার।

১৯৭৯ সালের ২৭শে মে তারাকী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্বেগ শিথিল করতে আফগান উলেমাদের সঙ্গে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেন। রেড্ডি বলেন, আলোচনা ছিল প্রধানত পাকিস্তানকে বার্তা দেয়া যে তার আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলান ঠিক হবে না এবং মুজাহিদীনের অনুপ্রবেশ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে যারা হামলা চালাচ্ছে গ্রামে, গণহত্যা চালাচ্ছে এবং এসব ঘটনাকে ইসলামী রঙ দিচ্ছে।

১৯৭৯ সালের জুনে, ভারতের শিল্প প্রতিমন্ত্রী আভা মাইতির সফরের পর, আফগানিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা নিবিড় করে তোলে ভারত। যেসব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ভারত সহযোগিতার প্রস্তাব দেয় সেগুলোর মধ্যে ছিল কোয়ালিটি কন্ট্রোল, ইস্পাত প্রকল্প, রেশম শিল্প, কাগজ ও কোমল মণ্ড শিল্প, সিমেন্ট ও সিমেন্ট পণ্য, পল্লী বিদ্যুৎ সিস্টেম, ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন, কৃষি ও সেচ সহায়ক একটি ম্যানুফ্যাকচারিং কমপ্লেক্স, বাষ্পশোধন কেন্দ্র, রাইস মিল ও দ্রাবক নিষ্কাষণ এবং শিল্পাঞ্চল স্থাপন। প্রেসিডেন্ট তারাকী ও তার ডেপুটি আমিনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মাইতি। ভারতের ৩০তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সে বছর আরও আগে নতুন দিল্লিতে এসেছিলেন আমিন।

ইতোমধ্যে, যখন পাকিস্তানের প্রভাব মুছে ফেলতে যুদ্ধবাজদের টোপ দিচ্ছে ভারত গুপ্ত অবস্থায় থেকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানের সম্পর্ক নতুন মোড় নিয়েছিল। একটি কূটনৈতিক ডিসপ্যাচে বলা হয়, ১৯৭৯ সালের জুন মাস নাগাদ আফগানিস্তান প্রচণ্ডভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকতে থাকে এবং চারটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি প্রস্তুত করা হয় স্বাক্ষরের জন্য।

১) কাবুল ও মস্কোর মধ্যে সরাসরি টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ সংযোগ স্থাপন। চুক্তি অনুসারে ট্রান্সমিটার, রিসিভার ও ফোর-চ্যানেল টেলিগ্রাফিক লিংক সহ একটি সম্পূর্ণ অয়্যারলেস স্টেশন স্থাপন করা হবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

২) আফগান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় কমিটির মধ্যে 'পারস্পরিক সহযোগিতা'।
৩) কাবুলে একটি আফগান-সোভিয়েত মৈত্রী ভবন নির্মাণ।
৪) উত্তরাঞ্চলীয় আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সীমান্ত পর্যন্ত যৌথভাবে তিপ্পান্ন কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ। খাজা গোগারদাকে একটা কম্প্রেসর প্রকল্প নির্মাণেও সম্মত সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই দুটি প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে কুড়ি মিলিয়ন রাশিয়ান রুব্‌ল।

১৯৭৯ সালের ১২ই জুন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী চৌধরী চরণ সিং যখন মস্কো সফরে ছিলেন, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লেওনিদ ব্রেঝনেভ আফগানিস্তানে পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ সম্পর্কে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। চরণ সিংয়ের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ব্রেঝনেভ এটা স্পষ্ট করে দেন যে আফগানিস্তানকে প্রতিরক্ষাহীন ছেড়ে আসার কোনও আকাঙ্ক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই।

এতে র স্পাইরা সচকিত হয়ে ওঠে। তারা এক মাস পর দেখতে পায় পাকিস্তানের প্রতি তারাকীর কথার সুর কিছুটা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। ১৯৭৯ সালের ১৯শে জুলাই ফারাহ্ ও নিমরোজ প্রদেশ সফরকালে তারাকী বলেন, আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিপদজনক কাজ করছে পাকিস্তান, যার অর্থ আসলে আগুন নিয়ে খেলা, তাতে কেবল পাকিস্তান আর ইরানই ছারখার হবে না, 'সারা দুনিয়ায় সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে।'

'আমাদের ওপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই,' তারাকী বলেন। এই বিবৃতিকে অনুসরণ করে আমিন সরাসরি আক্রমণ করেন সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ইরানকে, পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়া আফগান উদ্বাস্তুদের অস্ত্রের জোগান দেয়ার জন্য।

### ভদ্‌কা ও একটি অভ্যুত্থান

রেড্ডি আমাকে বলেছিলেন, যে আফগানিস্তানের লোকজন সত্য কথা কেবল তখনই শোনে যখন তা চিৎকার করে বলা হয় সর্বোচ্চ কণ্ঠে: 'যা বলা হচ্ছে তা সত্য, কেননা সত্যই কেবল অতটা জোরাল হতে পারে।'

প্রেসিডেন্ট তারাকীর জন্মদিনে সত্য ছিল ইতিবাচকভাবেই কানে তালা লাগান। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে নতুন দিল্লিতে পাঠান একটা গোয়েন্দা

ডিসপ্যাচে বলা হয়, ‘সোভিয়েত-আফগান মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক’ লেবেল সাঁটা একটা বিশেষ রাশিয়ান ভদ্‌কা পরিবেশন করা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট তারাকীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। কয়েক দিন পর আফগান সরকার পাকিস্তানি দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা সৈয়দ সিদ্দিকী শাহ্‌কে উপস্থাপন করে, তাকে কূটনীতিক হিসেবে বর্ণনা করে ঘোষণা করা হয় যে তিনি আফগানিস্তানে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। শাহ্‌ টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রকাশ করেন যে তিনি স্বেচ্ছায় আফগান নাগরিকত্ব চাইছেন, ‘গুপ্তচরবৃত্তি, ধ্বংস ও সশস্ত্র আগ্রাসনের মাধ্যমে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তানের সরাসরি হস্তক্ষেপের’ বিপরীতে এই দেশটির প্রগতিশীল শ্রেণী বিপ্লব ও নজরকাড়া সাফল্যের কারণে। তিনি বলেন, কাবুলে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত অন্য পাকিস্তানি কূটনীতিকদের নামও তিনি প্রকাশ করে দেন।

তারাকী সরকার এরপর আরও একটা বিস্ময়কর কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে কাবুল থেকে ইউএসএইড কর্মীদের প্রত্যাহার করে নিতে বলা হয়। প্রায় একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করে আফগানিস্তান, যে চুক্তি অনুসারে সিভিল এভিয়েশন ফোরকাস্টিং স্টেশনের জন্য প্রাযুক্তিক সহযোগিতার জোগান দেবে রাশিয়ানরা এবং কাবুল ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের রেডিও স্টেশনগুলোর সাউন্ড কোয়ালিটি উন্নত করবে।

তারাকী জানতেন না যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, পর্দার আড়ালে, তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ১৯৭৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি মস্কো থেকে ফিরে আসেন এবং কার্যত প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বন্দী হয়ে পড়েন। তিন দিন পর ১৬ই সেপ্টেম্বর পলিটবুরোর সেক্রেটারি শাহ্‌ ওয়ালী ঘোষণা করেন, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তারাকী পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এবং হাফিজুল্লাহ্‌ আমিন সর্বসম্মতিক্রমে পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আমিন এক দিন পর আগসা ভেঙে দেন এবং নতুন একটা স্পাই ইউনিট গঠন করেন যেটাকে বলা হত কেএএম (কারগারি আস্তেখাবারাতি মুআসেসা)।

আমিন এজেন্টদের বলেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ বিদ্যমান রয়েছে, প্রত্যেক সরকারকে তার সশস্ত্র বাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হবে, সেনাবাহিনী, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি ও পুলিশকে অংশীভূত করে, এবং আফগানিস্তানে এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া বিপ্লবী শ্রমিকদের সরকার হবে অকল্পনীয়।

র-এর একটি ডিসপ্যাচ অনুসারে, স্পাইদের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে আমিন বলেছিলেন: 'শত্রুর ষড়যন্ত্র উদঘাটনে আপনাদের অতীতের ভূমিকা যদিও অত্যন্ত চমৎকার, কিন্তু পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষের কিছু ভুলক্রটির কারণে আমাদের স্বদেশবাসীদের মনে কিছু প্রতিকূল স্মৃতি রয়ে গেছে, আমাদের শত্রুদের অদৃশ্য প্রভাব দূর করতে এবং আমাদের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আপনাদের স্বদেশপ্রেমী কাজ সম্পর্কে যারা এখন দুশ্চিন্তা করবে না।'

যাই হোক, নতুন দিল্লিতে অবস্থিত র-এর সদরদপ্তরকে অবহিত করা হয় যে, ওয়ালীর ঘোষণার এক দিন আগে তারাকী নিহত হন। তার খারাপ স্বাস্থ্য সম্পর্কে মিডিয়ার খবর ছিল ভুয়া প্রচারণা।

আশফাকের মতে, আফগানিস্তানে শান্তিসমাপ্তির সূচনা ছিল তারাকীর হত্যাকাণ্ড। কয়েক মাসের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে রাশিয়ানরা আমিনকে নিয়েও সন্তুষ্ট নয় এবং একটা হামলার জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে। কাবুলে র-এর স্টেশন থেকে পাঠান রিপোর্টে দেখা যায়, প্রায় দুই ঘণ্টায়, ১৯৭৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে যার সূচনা হয়েছিল, সোভিয়েত কমব্যাট ট্রুপ উড়ে আসে কাবুলে। ২৭শে ডিসেম্বর তারা হাফিজুল্লাহ্ আমিনকে ও তার পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করে। এক দিন পর পিডিপিএর পারচাম উপদলের নেতা ও তারাকীর সরকারের এক সময়কার উপপ্রধানমন্ত্রী বাবরাক কারমাল প্রেসিডেন্ট হন।

আশফাকের মতে, সোভিয়েত অভ্যুত্থানের ঠিক এক মাস আগে প্রায় অর্ধ ডজন সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন আমিন, বেশির ভাগই পশ্চিমা সাংবাদিকদের কাছে, একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে লয়া জির্গা (উপজাতীয় পার্লামেন্ট)-এর অনুমোদন নিয়ে ১৯৮০ সালের এপ্রিল নাগাদ একটা নতুন আফগান সংবিধান চালু করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন আমিন সেসব সাক্ষাৎকারে। আমিন আরও বলেছিলেন, পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়া আফগান উদ্বাস্তুরা হচ্ছে মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদী যারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং এখন পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মদদ পাচ্ছে, তিনি আরও বলেন যে যদি পাকিস্তানের মাটি থেকে তার দেশে হামলা চালান হয় তাহলে তার সরকারকে সহযোগিতা দেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আমিন এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, ১৯৭৯ সালের ৩রা নভেম্বর তিনি ও আফগান মন্ত্রী পরিষদ জারকুদুগ প্রকল্পের অংশে হিসেবে তেল ও গ্যাস কূপ

খননের যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি অনুমোদন করেন। এই প্রকল্প উদ্বোধনের আগেই প্রেসিডেন্ট আমিন মারা যান।

একটি ভারতীয় ডিসপ্যাচে জানা যায়, অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। আমিনের সোভিয়েত উপদেষ্টারা তাকে দারুলামান প্রাসাদে স্থানান্তরিত হতে প্ররোচিত করেছিলেন, যেখানে কার্যত তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আফগান সেনাবাহিনীর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাদের কাবুল থেকে অনেক দূরে মোতায়েন করা হয়েছিল এবং কয়েকটি ইউনিটকে নিরস্ত্র বা বন্দী করা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই বিপুল সামরিক হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করেছিল মৈত্রী, প্রতিবেশীসুলভ সহৃদয়তা ও সহযোগিতা বিষয়ক সোভিয়েত-আফগান চুক্তির অধীনে আফগান নেতৃত্বের একটা নির্দিষ্ট অনুরোধের ভিত্তিতে, ওই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী কাবুলের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ৩০ ডিসেম্বর রাতে সংক্ষিপ্ত গোলাগুলি হয়েছিল। তাতে কিছু সময়ের জন্য ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। এর পর নগরীতে ধীরে ধীরে শান্ত ভাব ফিরে আসে। যাই হোক, এটা স্পষ্ট ছিল যে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানদের প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। ইতোমধ্যে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল আফগানিস্তানের সর্বত্র, আপাতদৃষ্টিতে মুসলিম বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য। অন্যদিকে বাবরাক কারমালের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ ঘোষণা করে, আফগানিস্তানের সদাশয় জনগণের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের কারণে বিপ্লবী আদালতের মাধ্যমে আমিনের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

কয়েক দিন পর বাবরাক কারমাল আমিনকে সিআইএর এজেন্ট ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধড়িবাজ গুপ্তচর বলে আখ্যায়িত করেন; একজন বিশ্বাসঘাতক যার এমনকি তারাকীর ওপরও কোনও সমবেদনা ছিল না। তিনি সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়ার এবং সকল গণতন্ত্রবিরোধী ও জনবিরোধী বিধান বাতিল করার ও ইসলামের পবিত্র বিধির প্রতি সম্মানের প্রতিশ্রুতিও দেন।

হতোদ্যম ও বিভক্ত আফগান সশস্ত্র বাহিনী ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অভিযানকালে কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল। যদিও দারুলামান প্রাসাদের কয়েকটি ইউনিট সোভিয়েত সেনাদের প্রতিরোধ করেছিল, অতি দ্রুত দমন করা হয় তাদের। পরের দিন যখন সোভিয়েত টি-৫৫ ট্যাংক

কাবুলের প্রবেশপথগুলোয় প্রহরা দিচ্ছিল এবং জঙ্গীবিমান পর্যবেক্ষণ টহল দিচ্ছিল, কাবুল ও আশপাশের এলাকার আফগান সেনারা আত্মসমর্পণ করে, পরে তাদের নিরস্ত্র করা হয়। প্রতিরোধে বাধা দিতে জ্বালানি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়। ভারতীয় গুপ্তচররা রিপোর্ট করেছিল যে পাকিস্তান, চীন, সৌদি আরব ও মিশরে প্রতিক্রিয়াশীল মহল মার্কিন মদদপুষ্ট হয়ে আফগানিস্তান সীমান্তের বাইরে বিভিন্ন সামরিক শিবিরে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিচ্ছে। এই স্বেচ্ছাসেবীদের বলা হত মুজাহিদীন। আইএসআই এজেন্টদের সঙ্গী হয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

১৯৮০ সালের ২৭শে জানুয়ারি *কাবুল নিউজ টাইমস* জানায়, মুজাহিদীনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে পাকিস্তান এক ঢিলে তিন পাখি মারতে চায়: প্রথমত, তার চিরশত্রু ভারতকে দেখাতে চায় যে সমগ্র কাশ্মির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার দীর্ঘকালীন আকাঙ্ক্ষা পূরণে বৈশ্বিক ঠেকনো হিসেবে ইসলামী দেশগুলোকে সে কাজে লাগাতে পারে; দ্বিতীয়ত, ভারত ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের শক্তি বাড়াতে অস্ত্র ও তহবিল অর্জন; এবং শেষত, মস্কোকে হুমকি দেয়া ও চীনকে খুশি করা।

প্রেসিডেন্ট কারমাল পরে প্রকাশ করেন, অবিশ্বস্ত আমিনের নিহত হওয়ার কারণ তিনি সিআইএর সঙ্গে কাজ করছিলেন এবং গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের সঙ্গে মিলে একটা রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে আফগানিস্তানের প্রগতিশীল ধ্যানধারণা বাতিল করার চেষ্টা করছিলেন। হেকমতিয়ার ছিলেন হিজ্‌ব-ই-ইসলামীর নেতা, এটি ছিল আইএসআই-এর পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া একটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ যারা শরিয়া আইন চালু করতে চেয়েছিল আফগানিস্তানে।

১৯৮০ সালের ১২ই জানুয়ারি কেএএম বিলুপ্ত করেন কারমাল এবং খাদ নামে নতুন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস চালু করেন, এর লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং বিপ্লবের স্বার্থ, জনগণ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, তাছাড়া বাইরের শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা।

১৯৮০ সালের ২রা জানুয়ারি এক সম্পাদকীয়তে *কাবুল টাইমস* লেখে, আমিন প্রেসিডেন্ট তারাকী ও অন্যান্য বিরোধীদের হত্যা করা সত্ত্বেও তার জন্য অশ্রুপাত করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস কার্টার। সম্পাদকীয়তে আরও বলা হয়, আফগানিস্তানে সেনা পাঠানোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমালোচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র, যদিও বিভিন্ন দেশে সেনা নামিয়ে ১৯৫০ সাল

থেকে এ পর্যন্ত কম পক্ষে আটচল্লিশবার জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেছে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই।

যারা নিজেদের গুপ্তচরবৃত্তি ভালবাসে, তাদের জন্য ১৯৮০ সালের প্রথম দিকটায় কাবুল ছিল স্বর্গরাজ্য। ফেব্রুয়ারি মাসে নগরীর অধিবাসীরা গোপনে নিরস্ত্র প্রতিরোধের আয়োজন করে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে তারা 'শাবানাম' (রাত্রীকালীন চিঠি) বিলি করে। কয়েক দিন পর বাড়ির ছাদ থেকে তারা উচ্চকণ্ঠে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেয়। কারমাল সরকার এর জবাব দেয় বিশাল শক্তি প্রদর্শন করে। দুই দিন ধরে চারটি মিগ যুদ্ধবিমান আর অর্ধ ডজন অস্ত্রসজ্জিত হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়ায়, কাবুলের আকাশে খুব নিচু দিয়ে উড়তে থাকে। পার্টিকর্মীদের অস্ত্র দেয়া হয়। হত্যা, লুটতরাজ ও আগুন লাগানোর জন্য সরকার ব্রিটিশ, আমেরিকান, পাকিস্তানি ও চীনা গুপ্তচরদের অভিযুক্ত করে। আইন-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য সতেরজন সন্দেহভাজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়–ষোলজন পাকিস্তানি আর একজন আমেরিকান।

বিক্ষোভ অপ্রত্যাশিতভাবে সফল হওয়ার কারণ ছিল, নিজেদের দেশে যেকোনও বিদেশী সেনার উপস্থিতির প্রতি আফগানদের চিরাচরিত শত্রুতার মনোভাব। এছাড়াও সাধারণ একটা ধারণা ছিল, যে পূর্বসূরী হাফিজুল্লাহ্ আমিন ও নূর তারাকীর চেয়ে বাবরাক কারমালও খুব একটা ভাল ছিলেন না।

আফগানিস্তানের ধূসর জগতে সক্রিয় ছিল ভারত। কিন্তু আফগানিস্তানের প্রতি অতি আগ্রহশীল দেশগুলোর সবার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বজায় রেখে সতর্কতার সঙ্গে প্রকাশ্য তৎপরতা সাজান হয়েছিল। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আফগানিস্তানে ভারতের বিশেষ দূত এস. কে. সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী একটা বার্তা পাঠান কারমালকে। ইন্দিরা মনে করতেন, পাকিস্তানে চীনের ও যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের মদদ মানেই হচ্ছে তারা আফগানিস্তানের ঘটনাবলীতে হস্তক্ষেপ করতে চায় ঠিক সেইভাবে যেভাবে যুক্তরাষ্ট্র এটা করেছিল শাহ্-এর আমলে ইরানে, যদিও শাহ্ এখন উৎখাত হয়ে গেছেন। ওই অঞ্চলে সক্রিয় আইএসআই এজেন্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে আফগানিস্তানের অনভিজ্ঞ নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করেছিল র। পর্দার আড়ালে র-এর নেটওয়ার্ক নির্ভুল তথ্যের জোগান দিত, পাকিস্তান থেকে কান্দাহারে বিদ্রোহীদের কাছে পাচার হয়ে আসা অস্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল এভাবে।

'একটা অভিযানও ব্যর্থ হয়নি,' খাদ্‌কে দেয়া র-এর তথ্যের ভিত্তিতে আফগানিস্তান সেনাবাহিনীর চালান অভিযান সম্পর্কে বলেন রেড্ডি। এক হাজার থেকে এক হাজার দুইশোর মধ্যে সশস্ত্র আফগান বিদ্রোহী কান্দাহারে ও আশপাশের এলাকা কার্স, বালাকার্জ ও মালাজাতে অনুপ্রবেশ করেছিল। সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিতে। র-এর তথ্যের ভিত্তিতে আফগান সেনারা চমকপ্রদ আক্রমণ রচনা করে। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসের কোনও সময়ে আমেরিকানরা ভারত সরকারকে চাপ দেয় যেন আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনার উপস্থিতিকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী চাপের কাছে মাথা নোয়াতে অস্বীকৃতি জানান। যাই হোক, সিআইএ লক্ষ্য করেছিল যে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বে ইন্দিরা বিরক্ত ছিলেন। একটা রিপোর্টে সংস্থাটি জানায়ঃ

*তিনি [ইন্দিরা গান্ধী] মনে করেন, আফগানিস্তান মস্কোর প্রভাববলয়ে পতিত হয়েছে এবং সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে অবশ্যই নিষ্পন্ন কাজ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, তা স্থায়ী হবে মস্কোর শর্তে এবং সোভিয়েতরা যত দ্রুত তাদের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করবে তত দ্রুত তাদের সামরিক উপস্থিতি হ্রাস করতে পারবে। পাকিস্তান যদি আফগান বিদ্রোহীদের মদদ দেয়া অব্যাহত রাখে, নতুন দিল্লির ধারণা সোভিয়েতরা একেবারে কম করে হলেও প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করবে এবং সেখানে সোভিয়েতপন্থী সরকারকে বসাবে। গান্ধী আরও আশঙ্কা করেন, সোভিয়েত ও তাদের আফগান পুতুলরা হয়তো পাকিস্তানি ভূখণ্ডে বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে অভিযান চালাবে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি দ্রুত চরম খারাপ হয়ে যাবে। নতুন দিল্লি হয়তো সোভিয়েতের পাকিস্তান দখল মেনে নিতে বাধ্য হবে, এমনকি অংশগ্রহণ করতেও বাধ্য হবে।*

১৯৮০ সালের ১৪ই মে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সিআইএর মূল্যায়ন পুরোপুরি নির্ভুল ছিল না। আফগানিস্তান সাত দফা রাজনৈতিক নিষ্পত্তি কর্মসূচী ঘোষণা করে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে ইরান ও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সরাসরি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দেয়া হয় ওই কর্মসূচীতে। তাছাড়া যেসব আফগান বিভিন্ন কারণে দেশত্যাগ করেছেন এবং এখন ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাদের বিচার থেকে অব্যাহতি প্রদান ও দ্বিপাক্ষিক ইসুগুলো নিয়ে আলোচনারও প্রস্তাব দেয়া হয়। কারমাল সরকার জোর দিয়ে জানায় যে

দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যথাযথ রাজনৈতিক গ্যারান্টি থাকবে এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাতে পারবে না। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি, প্রেসিডেন্ট কারমাল বলেন, মীমাংসা করা হবে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক নিষ্পত্তি অনুযায়ী, তাছাড়া এটা নির্ভর করবে ফলপ্রসূ গ্যারান্টির ওপর।

রেড্ডির মতে, এই বিবৃতি আগে সোভিয়েত নেতৃত্বের অনুমোদন লাভ করেছিল, এবং এটা স্পষ্ট ছিল যে তাদের আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার কোনও মেজাজ ছিল না। সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার ঠিক আগে দেশটিতে নতুন করে সোভিয়েত সেনা ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠান হয়। ফলে আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী হ্রাসের উল্টো ঘটনা ঘটে। এভাবে আফগান সংকটের রাজনৈতিক নিষ্পত্তিকে ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, প্রত্যাহার ও ঘোষণা ছিল সামরিক পদক্ষেপ। আফগান কর্মকর্তারা মন্তব্য করেন যে এবার ওই ঘোষণায় সাড়া দেয়ার পালা পাকিস্তান, ইরান ও সাধারণভাবে পশ্চিমাদের।

পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ বন্ধে সীমান্ত সিল করে দেয়ার চেষ্টায় সোভিয়েত সেনারা ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাক্তিয়া প্রদেশে বড় ধরনের অভিযান চালায়। আফগানিস্তানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতের উদ্বেগ ছিল নানাবিধ, তবে অন্তত দুটো ইস্যু বিচলিত করেছিল স্পাইদের: মুজাহিদীনের প্রশিক্ষণ যা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে পাকিস্তান, এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে যুক্তরাষ্ট্রের সীমাহীন অস্ত্র সরবরাহ, যে সেনাবাহিনী কার্যত দেশটির ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আইএসআই-এর অংশ।

### জিয়া ও মার্কিন যোগসূত্র

পাকিস্তানি একনায়ক জিয়া-উল-হক আফগান মুজাহিদীনকে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সরবরাহে মদদ দিয়েছিলেন। ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারি ইসলামাবাদে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভিতালি এস. স্মির্নভকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন তিনি।তারা দুজন জাতিসংঘে একটি চিঠি পাঠান, আফগান ইসু নিয়ে সংলাপ পরিচালনার জন্য একজন বিশেষ দূতকে মনোনয়ন দেয়ার আহ্বান জানান হয় ওই চিঠিতে। ভারত মনে করেছিল, এই পদক্ষেপ ছিল একটা স্মোকস্ক্রিন: পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য ছিল, বিশেষ করে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানকে নিয়ে একটা ত্রিপাক্ষিক ফ্রেমওয়ার্ক গঠনে পাকিস্তানের জেদের ব্যাপারে, এবং জাতিসংঘ মহাসচিব নিযুক্ত বিশেষ

প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়ে। কিন্তু এক মাস পর ঘটনা অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। ১৯৮১ সালের ২রা মার্চ পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি বোয়িং কাবুল যাওয়ার পথে ছিনতাই হয়ে যায়, বিমানটির গন্তব্য ছিল দামেস্ক। এতে পাকিস্তানে বিশাল রাজনৈতিক নাটকের সূত্রপাত ঘটে। ছিনতাই হওয়া বিমানটিতে যাত্রী ছিল একশো আটচল্লিশজন। ১৯৮১ সালের ৬ই মার্চ কাবুলে ছিনতাইকারীরা একজন পণবন্দীকে হত্যা করে, তিনি ছিলেন একজন পাকিস্তানি কূটনীতিক এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহযোগী। ছিনতাইকারীরা আল-জুলফিকার নামে একটা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে নিজেদের পরিচয় দেয় এবং দাবী করে যে জুলফিকারের ছেলে মুর্তাজা ভুট্টো এই সংগঠনের মহাসচিব। ছিনতাইকারীদের মূল দাবী ছিল পাকিস্তানের কারাগার থেকে বিরানব্বইজন বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। পাকিস্তান সরকার মাত্র পনেরজনকে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। ছিনতাইকারীরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ৯ই মার্চ বিমানটিকে দামেস্কে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তারা পঞ্চান্নজনের মুক্তি দাবী করে ১২ই মার্চের মধ্যে। জিয়া শেষ পর্যন্ত ছিনতাইকারীদের দাবী মেনে নেন এবং সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই বন্দীদের মুক্তির ঘোষণা দেন। বেতারবার্তায় তিনি বন্দীদের পচা ডিম বলে উল্লেখ করেন। পাকিস্তান একদিকে প্রকাশ্যে আফগানদের সমালোচনা করছিল, ছিনতাইকারীদের সঙ্গে যোগসাজশ থাকার অভিযোগ করছিল তাদের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে রেকর্ডের খাতিরে প্রশংসা করছিল সিরিয়ার।

আফগানিস্তান সংকট সমাধানে এখন জিয়া হাজির করেছিলেন চার দফা কর্মসূচী: সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার; ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানকে বজায় রাখা; পাকিস্তানে অবস্থানরত প্রায় দুই মিলিয়ন আফগান উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন; এবং আফগান জনগণকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সরকার পদ্ধতি বেছে নেয়ার সুযোগ প্রদান।

প্রায় একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান, যিনি ১৯৮০ সালের ৪ঠা নভেম্বর বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন, পাকিস্তানকে উল্লেখযোগ্য সামরিক সহযোগিতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। আইএসআই মূলত চেয়েছিল ৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র, কিন্তু আফগান মুজাহিদীনের জন্য রিগ্যান ২.৬ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পাকিস্তানি ভূখণ্ডে আফগান বিদ্রোহীদের অস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আগা শাহীর কাছে প্রতিবাদ করেছিলেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত। তিনি তাকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, আফগানিস্তান ও তার বন্ধুরা এর যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

আফগানিস্তানে ভারতীয় তৎপরতার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের জানা ছিল এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে মিডিয়াকে কাজে লাগিয়েছিল। র-এর ভিতরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ওয়াশিংটনে। পাকিস্তানও প্রচারণা চালাতে শুরু করে। ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কথাবার্তা সম্বলিত আগেই রেকর্ড করা দুটো ক্যাসেট প্রচার করা হয়েছিল পাকিস্তানের ভিতরে, সেগুলো রপ্তানী করা হয়েছিল অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে। এই স্টুডিও টেপগুলো রেকর্ড করেছিল শালিমার রেকর্ডিং কোম্পানি লিমিটেড, ইসলামাবাদ, যেটার মালিকানা ছিল সরকারের। মির্জা যুদ্ধ করছিলেন মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে, তিনি ভারতকে সাবধান করে দেন যে যুক্তরাষ্ট্র কখনই পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়া থামাবে না এবং এ ব্যাপারে ভারত সরকারকে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংলাপের উদ্যোগ নিতে হবে। ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স (এমইএ)-এর কূটনীতিকদের তৈরি করা একটা রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করেনি যুক্তরাষ্ট্র, ইঙ্গিত অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমেরিকানরা ভারতের আপত্তি আমলে নিয়ে পাকিস্তানকে দেয়া সামরিক সহযোগিতার পরিমাণ ও ধরন নিয়ন্ত্রণ করবে। নোটে বলা হয়:

> *মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের বৈঠকে আমরা বিশাল শক্তির সংঘাত এড়াতে উত্তেজনা নিরসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছি। আফগানিস্তান থেকে আমরা সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের পক্ষপাতি, এ ইঙ্গিত দেয়ার পাশাপাশি এও উল্লেখ করেছি যে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের জন্য অবশ্যই একটা রাজনৈতিক ও গ্রহণযোগ্য পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে পাকিস্তানে আরও অস্ত্র সরবরাহ করলে তা শুধু এই অঞ্চলে উত্তেজনাই বৃদ্ধি করবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন স্বীকার করেছে যে পাকিস্তানকে তার সহযোগিতার বিষয়টিকে দেখতে হবে শুধুমাত্র আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারত-পাক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই।*

ইউএস ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের জেফরি কেম্প ছিলেন পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের কট্টর সমর্থক। ১৯৮১ সালের জুনে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য পরিষদের এক বৈঠকে কেম্প বলেন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়

পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াচ্ছে। পাকিস্তানের মাধ্যমে আফগান মুজাহিদীনকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার আভাস দেন তিনি। ১৯৮১ সালের ৯ই জুলাই বার্ন ভিত্তিক সংবাদপত্র *নিউ জুরখার জাইটুং* প্রথম পৃষ্ঠায় ওয়াশিংটনের বরাত দিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করে, তাতে বলা হয়: আফগান মাটিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ক্যাম্বোডিয়ায় সোভিয়েত-ভিয়েতনাম হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের জন্য এক ধরনের শাস্তি ছিল পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ। এক মাস পর ভারত সরকার নতুন দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে রাজনৈতিক কাউন্সেলর হিসেবে জর্জ গ্রিফিনকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এটা ছিল নজিরবিহীন পদক্ষেপ। অভিযোগ ছিল যে আফগানিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে সিআইএর অপারেশনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন গ্রিফিন।

ইতোমধ্যে, মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহ বেড়ে গিয়েছিল ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষকালের মধ্যে। বিদ্রোহীরা আধিপত্য স্থাপন করেছিল কান্দাহারের প্রধান বাজার এলাকায়। কোর হেডকোয়ার্টারে হামলা ছাড়াও দুটো ঘটনায় গভর্নরের অফিসে হামলা চালায় বিদ্রোহীরা, বাইরের সীমানা প্রাচীরের কাছে কর্তব্যরত পাঁচজন রক্ষীকে হত্যা করে। ১৪ই জানুয়ারি তারা কান্দাহার রেডিও স্টেশনে রকেট হামলা চালায়, এতে ১৯৮২ সালের ১৪ থেকে ১৭ই জানুয়ারি রেডিও স্টেশনটি বন্ধ থাকে। কান্দাহার নগরীতে সক্রিয় মুজাহিদীন যোদ্ধারা ১৬ই জানুয়ারি সোভিয়েত আক্রমণে পালিয়ে যায়, আশ্রয় নেয় কান্দাহার ও পাঞ্জাওয়াই জেলার পল্লী অঞ্চলে। জানুয়ারি শেষ হওয়ার আগে আর শহরে ফিরে আসেনি তারা। কিছু মুজাহিদীন যোদ্ধা স্থানীয়দের কাছে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু তাদের অতীত কর্মকাণ্ডের বিপরীতে স্থানীয়রা জানায় যে পরিবার ও সম্পদহানীর জন্য তারা এখনও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, তাই আর্থিক সহায়তা দেয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল আবদুল কাদির কান্দাহার নগরী সফরে যান সেখানে মুজাহিদীন বিরোধী রাশিয়ান অভিযানের সময়। এর থেকে ইঙ্গিত মেলে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়েছিল সোভিয়েতরা। ফেব্রুয়ারিতে কান্দাহার, হেরাত, লশ্‌কর গাহ্‌ ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে সোভিয়েত আক্রমণের ফলে মুজাহিদীন নেতারা পাকিস্তানে পালিয়ে যান পরামর্শের জন্য, অন্যদিকে সাধারণ যোদ্ধাদের কান্দাহারের ঝানজাওয়াতে জড় হতে বলা হয়, সেখানে তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন করে।

স্পষ্টতই সোভিয়েত আক্রমণ মোকাবেলা করার সামর্থ্য বা প্রস্তুতি কোনোটাই ছিল না বিদ্রোহীদের। প্রচণ্ড সোভিয়েত আক্রমণে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। র-এর একটি ডিসপ্যাচে বলা হয়, কান্দাহারের বাসিন্দারা পাকিস্তানে উদ্বাস্তু শিবিরে আফগানদের দুর্দশার খবর দেখেছে, যেখানে তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ নেই।

আফগানিস্তান সরকার বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা, আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে উপজাতীয় প্রধান ও ধর্মীয় নেতাদের সমর্থন আদায় অব্যাহত রেখেছিল। আফগান নিরাপত্তা সংস্থাসমূহের প্রধান ড. নাজিবুল্লাহ্, ও উপজাতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সুলেইমান লাইক গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় অঞ্চল সফর করেন। মোল্লাদের মন জয় করা হয় বস্তুগত মালপত্র দিয়ে, পুরনো মসজিদ মেরামত আর নতুন মসজিদ নির্মাণ করে দেয়া হয়। ১৯৮২ সালের জানুয়ারিতে কাবুলে জে. এস. তেজার জায়গায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে আসেন জে. এন. দীক্ষিত। তিনি কাবুলে পৌঁছান ১৫ই জানুয়ারি।

অগাস্টের কোনও সময়ে সোভিয়েত সেনারা কান্দাহার প্রদেশের পাশমুল, মালাজাত ও সানজারি অঞ্চলে বড় ধরনের বিদ্রোহবিরোধী অভিযান চালায়। এতে অংশ নেয় প্রায় আড়াইশো ট্যাংক এবং তিনশো সাঁজোয়া যান। সরকারী প্রতিবেদন অনুসারে, আফগানরা এখন প্রধান প্রধান শহরগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখলেও পল্লী অঞ্চলে আধিপত্য ছিল বিদ্রোহীদের। নতুন দিল্লিতে পাঠান র-এর একটি গোপন বার্তায় বলা হয়:

> *আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনাদের বিতাড়িত করার মত অবস্থায় নেই বিদ্রোহীরা এবং সোভিয়েতরাও নিজে থেকে অদূর ভবিষ্যতে আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার সামান্যতম অভিপ্রায় দেখাচ্ছে না। বিদ্রোহীরা ৯০ শতাংশেরও বেশি স্থানীয় জনগণের সহানুভূতি পাচ্ছে যারা আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনা উপস্থিতি চায় না, কিন্তু তারা যথাযথভাবে এই অসন্তোষ প্রকাশ করতে সমর্থ নয় এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে লড়াই করে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করছে।*

পাঞ্জশির থেকে ফিরে আসা ৩৭তম প্যারাকমান্ডো রেজিমেন্টের সৈনিকদের উদ্দেশে ১৯৮২ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রদত্ত ভাষণে বাবরাক কারমাল দাবী করেন, বিরোধীরা যেখানে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার সেইসব অঞ্চলে ধর্মীয় ও উপজাতীয় নেতারা অবশেষে পার্টির কর্মসূচী ও নীতি মেনে

নিচ্ছেন। তারাকী ও আমিনের নীতির কারণে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝি দূর করা হচ্ছে। সমগ্র আফগানিস্তান থেকে আসা বিভিন্ন উপজাতীয় ও জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ধারাবাহিক বৈঠক করেন কারমাল এবং বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্রশাসন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপজাতীয় ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের বেশি বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে উপজাতীয় জির্গা পুনরুজ্জীবিত করায় তার দল ও সরকার সক্রিয় উৎসাহ জোগাচ্ছে। জাতির উদ্দেশে এক বার্তায় কারমাল বিদেশে অবস্থানরত সমস্ত আফগানকে স্বদেশে ফিরে আসার আহ্বান জানান, অতীত দুষ্কর্মের জন্য তাদের ওপর কোনও প্রতিশোধ নেয়া হবে না, তবে শর্ত থাকবে যে তারা আর কোনও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারবে না।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহটি কিছু বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল কুনার প্রদেশের সরকারের জন্য, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে আত্মহত্যা করেছিলেন সেন্ট্রাল কোর কমান্ডার মেজর জেনারেল ওয়াদুদ। ওয়াদুদ ছিলেন পিডিপিএর খাল্‌ক উপদলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাই আশঙ্কা করা হয়েছিল তার মৃত্যুতে খাল্‌ক ও পার্‌চাম উপদলের মধ্যে আরেক দফা সহিংসতা ও সংঘাত বেধে যাবে।

পাকিস্তান থেকে বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বিদ্রোহীদের সক্রিয় নেতৃত্ব দিতে সীমান্ত অতিক্রম করে কিছু বিদ্রোহী নেতার আফগানিস্তানে প্রবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কিত গোয়েন্দা তথ্য ছিল। সেসব তথ্যে উদ্ধৃত বিশ্বস্ত সূত্রগুলোর মতে, বিদ্রোহী বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণের জন্য পাঞ্জশির উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে সোভিয়েত সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল।

১৯৮২ সালের অক্টোবরে খাদ্‌-এর প্রধান ড. নাজিবুল্লাহ্‌ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির গুপ্তচরদের গ্রামগুলোতে পাঠান সরকারের কর্মসূচী ও নীতিসমূহের অনুকূলে জনগণকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। ১৯৮২ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর জুড়ে সারা দেশে বিদ্রোহীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বিশেষ করে হেরাত, কান্দাহার, জালালাবাদ ও মাজার-ই-শরীফে। কাবুল সহ বিভিন্ন শহরের কেন্দ্রগুলোতেও সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, মহাসড়কে সেনাবহরে যখন-তখন বিদ্রোহীরা হামলা চালায়। রিপোর্ট থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বিদ্রোহীরা বেশি করে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জাম পেয়েছিল। আফগান গোয়েন্দা সূত্রগুলোর মতে, বিদ্রোহীদের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ কুড়ি হাজার, যার মধ্যে অর্ধেক বিদ্রোহী কার্যক্রম চালাচ্ছিল পাকিস্তান থেকে, যেখানে প্রশিক্ষণ শিবিরের সংখ্যা আশি থেকে বেড়ে একশো ছয়ে

পৌঁছেছিল। নিরবচ্ছিন্ন সহিংসতার কারণে দেশ পড়ে গিয়েছিল উদ্বেগ ও সংশয়ে। মধ্য ও নিম্নপদস্থ আফগান ও সোভিয়েত কর্মকর্তাদের মধ্যে সহিংসতা দমনে তাদের অক্ষমতায় অধৈর্যের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বিলিকৃত একটা গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়: 'অস্ত্র ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে উপজাতীয়দের আনুগত্য লাভের যে চেষ্টা আফগান সরকার করেছে তা বৃথা গেছে। মন্ত্রী পরিষদ আর পার্টির বিভিন্ন অংশে পরিবর্তন করেও কোনও সুফল অর্জন করা যায়নি। অথচ সোভিয়েত সেনা উপস্থিতি ও কারমাল সরকার বিরোধী ক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।'

গুপ্তচররা এটাও লক্ষ্য করেন যে আফগান বাহিনী ছিল অদক্ষ। যুদ্ধ অঞ্চল থেকে পাঠান এক বিস্তারিত বিবরণে তারা উল্লেখ করেন: 'বর্তমান আফগান সেনাবাহিনীর নিজেদের পক্ষে বিদ্রোহ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়, কারণ তাদের সে শক্তিও নেই এবং সে সামর্থ্যও নেই। সুতরাং মুজাহিদীন যোদ্ধারা যতদিন বাইরের মদদ পাবে, ততদিন পর্যন্ত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে আফগান সেনাবাহিনীকে।'

### পাকিস্তানের সাহায্যে বিকশিত সন্ত্রাসবাদীরা

১৯৮২ সালের ২৫শে নভেম্বর কেবিনেট সেক্রেটারি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারির কাছে একটা প্রতিবেদন পাঠায় জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি (জেআইসি)। তাতে উল্লেখ করা হয়, আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অন্তত ছয়টি সন্ত্রাসবাদী দল লালনপালন করেছে পাকিস্তান। সবগুলোর হেডকোয়ার্টার পেশাওয়ারে, একটা আদর্শ উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। শীর্ষে রয়েছে গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিজ্‌ব-ই-ইসলামী। জেআইসির প্রতিবেদনে বলা হয়, আফগানিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান হেকমতিয়ার। হিজব-ই-ইসলামীর অফিস রয়েছে আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, জর্ডান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানিতে। জেআইসির প্রতিবেদনে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়:

*যদিও তাদের বর্তমান শক্তি প্রায় ২০০০০, কিন্তু তাদের দাবী এক মিলিয়ন অনুগামী রয়েছে তাদের, বেশির ভাগই উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোয়। পাখতুন অধ্যুষিত অঞ্চল ও কাবুলের আশপাশের*

*প্রদেশগুলোয় তারা বেশি সক্রিয়। কৌশলগত ও অভিযানমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য তারা স্থানীয় অধিনায়ক পর্যায়ে অন্যান্য গ্রুপের সঙ্গে লিয়াজোঁ বজায় রেখে চলে। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাবুলে অনুষ্ঠিত ব্যাপক নাগরিক অমান্যতা আন্দোলনের পিছনে তারা ছিল বলে ধারণা করা হয়।*

পাকিস্তানের লালিত দ্বিতীয় সন্ত্রাসবাদী দলটি হিজ্‌ব-ই-ইসলামী খালিস নামে পরিচিত ছিল। এর নেতা ছিলেন মৌলভী ইউনুস খালিস। প্রধানত তৎপর ছিল কাবুলে ও নাঙ্গারহার এলাকায়।

তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলটি ছিল জামাত-ই-ইসলামী, র এই দলটিকে অনুসরণ করছিল দীর্ঘদিন ধরে। এর নেতা ছিলেন বুরহানুদ্দীন রব্বানী। এর শক্তি ছিল দশ হাজার গেরিলা, তৎপর ছিল নূরিস্তান, পাক্তিয়া ও নাঙ্গারহার এলাকায়। আহমদ শাহ মাসুদের সহায়তায় পাঞ্জশিরে আফগান তরুণদের রিক্রুট করছিল এই দল, মাসুদ ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রিয়পাত্র।

জেআইসির প্রতিবেদন অনুসারে, পাকিস্তান ছোট অস্ত্রের জোগান দিচ্ছিল বিদ্রোহীদের, তাছাড়া হস্তচালিত রকেট লঞ্চার, মাইন, এবং হ্যান্ড-গ্রেনেড ও লাইট মর্টার সহ পদাতিক অস্ত্রশস্ত্র। নম্বর ও মার্কিং বিহীন গোলাবারুদ তৈরি করা হচ্ছিল পাকিস্তানে, সেই সঙ্গে ৯ এমএম ও ৭.২৬ এমএম বুলেট ও ৩৬ নম্বর হ্যান্ড গ্রেনেড। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়ঃ

*পাকিস্তানে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির রয়েছে, যেখানে আফগান বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও প্যারা-মিলিটারি ইস্ট্রাক্টররা। প্রতিটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে ৫০০-৬০০ প্রশিক্ষণার্থী। যেসব স্থানে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে সেগুলো হচ্ছে চিত্রল, চেরাট, আটক, ওয়ার্দাক, জামরুদ, পারাচিনার, মিরান শাহ্‌, শাগাই ফোর্ট, দার্গাই, নওশেরা, কোয়েটা টাঙ্গি ফোর্ট, পেশাওয়ার, সিয়ালকোট ও সারগোদা। এভাবে আফগান বিদ্রোহীরা আফগানিস্তানে অভিযান চালানোর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে পাকিস্তানের ভূখণ্ড।*

বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, যাতে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। কিন্তু ভারতীয় স্পাইরা অনুভব করেন, এসব গ্রুপ প্রকৃত অর্থে একটা ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল না, কেননা গ্রুপগুলো নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষকদের কাছ

থেকে আর্থিক ও অন্যান্য যেসব সাহায্য পাচ্ছিল তা ক্ষুণ্ন হত। আমেরিকানরা বিপুল পরিমাণ অর্থের জোগান দিয়ে কয়েকটি দলকে সংহত করার চেষ্টা করেছিল, ইত্তেহাদ নামে একটা বিদ্রোহী গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রে অফিস খুলেছিল ১৯৮২ সালের অগাস্ট মাসের কোনও সময়ে। ভারতীয় স্পাইরা জানান, আফগানিস্তান পরিস্থিতিকে পাকিস্তান নিজের সুবিধার জন্য কাজে লাগিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে। সৌদি আরবের মত ইসলামী দেশগুলোর কাছ থেকেও আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছিল পাকিস্তান এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ নিবিড় করেছিল। আফগান সরকারের ইসলামী ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মুসলিম স্বার্থের অগ্রনায়ক হওয়ার চেষ্টা করছিল জিয়ার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান। অন্যদিকে, পাকিস্তানকে একটা ফ্রন্টলাইন স্টেট হিসেবে দেখত যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েতের আরও অগ্রগমন রোধে যে দেশটি সাহায্য করতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান বিশাল পরিমাণ টাকা ও অস্ত্র হস্তগত করতে সমর্থ হয় যা সে পরে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিল।

গোয়েন্দা তথ্য থেকে জানা যায়, সৌদি আরবের সহযোগিতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে সৌদিরা টাকা ও অস্ত্র সরবরাহ করছিল আফগান বিদ্রোহীদের। সৌদি আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতার সঠিক পরিমাণ জানা না গেলেও প্রতীয়মান হয়, আফগান বিদ্রোহীরা উপসাগরীয় দেশগুলো ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে গোপনে হালকা পদাতিক অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছিল। আফগান বিদ্রোহীদের জোগান দিতে পাকিস্তানে কয়েকটি কেন্দ্র খুলেছিল মিশর এবং পাকিস্তানে নিয়মিত মিশর থেকে অস্ত্রের চালান পাঠান হত বিমানযোগে। মজার ব্যাপার হল, মিশর সরকার এসব অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। আফগান বিদ্রোহীরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল মস্কোর তৈরি অস্ত্র দিয়ে!

র অপারেটিভরা উদ্বিগ্ন ছিল এই কারণে যে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে বিশাল সন্ত্রাসবাদী বাহিনী, বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও জঙ্গী মতবাদের নিবিড় দীক্ষা ভারতের নিরাপত্তার জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে যখন আফগানিস্তান যুদ্ধ শেষ হবে। আশফাকের মতে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ শুধু যে ভারতের সীমান্তের খুব কাছে একটা হুমকি নিয়ে এসে ফেলেছে তাই নয়, আগের চেয়ে অধিক পরিমাণ সন্ত্রাসবাদী তৈরির প্রক্রিয়াও সূচিত করেছে।

জেআইসি বিবৃতি দিয়েছিল যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে টেকসই শান্তির কোনও সম্ভাবনা নেই। রিপোর্টে বলা হয়:

*প্রতীয়মান হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘকালীন সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখতে ইচ্ছুক, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও। ধ্বংস, বলপ্রয়োগ, স্থির মতদীক্ষা ও ত্রাণ সহযোগিতা ভিত্তিক পলিসি অবশেষে সাফল্য অর্জন করবে বলে তাদের ধারণা। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান সমাজের কিছু অবয়ব বদলে দেয়ার চেষ্টা করছে সোভিয়েত মডেল অনুযায়ী, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী, সরকার, পার্টি ক্যাডার ও অর্থনীতিকে। সোভিয়েতের জন্য বিষয়টা যদি সংকটজনক হয়ে ওঠে, তাহলে তার হাতে অন্যান্য সুযোগও রয়েছে, যেমন বিশাল আকারে সামরিক শক্তি বাড়িয়ে বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দেয়া, এবং প্রয়োজন হলে, পাকিস্তান যদি সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়, যথাসময়ে বেলুচিস্তানের কার্ড ব্যবহার করা। কাবুলে সোভিয়েতপন্থী সরকার শক্তভাবে না বসা পর্যন্ত সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা নেই।*

ভারতীয় গোয়েন্দা প্রতিবেদনে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিষয়টি নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়, বলা হয় বিশ্বের এই অংশে আমেরিকান কর্তৃত্ব পুনরায় নিশ্চিত করার কৌশল এটি।

*আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় নতুন মার্কিন প্রশাসন ঘোষণা করেছে, তারা আফগান বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে এবং আফগানিস্তানে যতদিন সোভিয়েত বাহিনী থাকবে ততদিন আফগান ইসু জীবন্ত রাখবে। স্পষ্টতই ওই অঞ্চলে তাদের স্বার্থ ও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র এই অবস্থান নিয়েছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সশস্ত্র হস্তক্ষেপকে একটা দীর্ঘমেয়াদী সোভিয়েত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র, যে পরিকল্পনা অনুযায়ী উষ্ণ পানির বন্দরগুলোকে করায়ত্ত করতে চায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্রদের সঙ্গে মিলে ভারত মহাসাগরে তার উপস্থিতি বৃদ্ধি করার কৌশলগত আইডিয়ার পক্ষে সাফাই গাইছে। পাকিস্তানকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টিকে দেখতে হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাকিস্তানে ও অন্য কয়েকটি দেশে সামরিক ঘাঁটি ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনা গড়তে পারে*

*যুক্তরাষ্ট্র। এভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব ছড়িয়ে পড়া রোধ করতে পারে। কোনও সন্দেহ নেই এই পরিস্থিতির জবাব হিসেবে ভারত মহাসাগরের উপকূল জুড়ে ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় নৌবহর মোতায়েন করা হয়েছে। যাই হোক, প্রতীয়মান হয় যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও এপর্যন্ত সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার নিশ্চিত করা সম্ভব না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সোভিয়েত ইউনিয়ন বিষয়ক তার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আফগানিস্তান প্রশ্নে একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হবে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপকে চীন দেখছে তাকে ঘিরে ফেলার আরেকটি পদক্ষেপে হিসেবে, সুতরাং সোভিয়েত পদক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করছে। পাকিস্তানকেও আফগানিস্তান প্রশ্নে স্থির থাকার কথা বলেছে, যাতে আফগান সরকারের ওপর প্রতিরোধ আন্দোলনের চাপ বজায় থাকে। উল্লেখ্য যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি যুক্ত করেছে চীন।*

রাষ্ট্রহীন লোকজনকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে র-এর অনুরূপ উদ্বেগ ছিল এমইএতেও। তারা পর্যবেক্ষণ করেছিল, পাকিস্তান কর্তৃক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না যুক্তরাষ্ট্র। এস. জয়শংকর (ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী) তখন ছিলেন এমইএতে আন্ডার সেক্রেটারি। সাবেক পররাষ্ট্র সচিবের অভিজ্ঞতা থেকে একটা নোটে তিনি উল্লেখ করেন, ভারতকে মনে রাখতে হবে যে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে ভারতের বিরোধিতা দূর হতে পারে কেবল এই নিশ্চিয়তায় যে ওইসব অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে না এ ধরনের ভাব থাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের। তিনি লেখেন:

*ওই ধরনের ভাব বিশেষ করে বিপদজনক হতে পারে, কারণ এটা প্রতীয়মান যে পাকিস্তানের অস্ত্র ব্যবহারের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অতঃপর, যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয়তা প্রদানকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আমাদের এই অবস্থান নিতে হবে যে নিশ্চয়তা প্রদানই ভারতের জন্য যথেষ্ট নয়।*

অন্যদিকে আমেরিকান গোয়েন্দা মহল ওই অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত ছিল। সিআইএ ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে

লেখা একটা রিপোর্টে তিক্ততার সঙ্গে তুলে ধরে যে ভারত তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের ক্রমান্বয়ে গ্রাস করতে চায়। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অ্যাসেসমেন্টে বলা হয়:

> *১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত বিরতিহীনভাবে তার দুর্বল প্রতিবেশীদের পিছনে লেগে রয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উপমহাদেশের ওপর কর্তৃত্ব করা। আমাদের মতে, এ জন্য সে একগুচ্ছ ষড়যন্ত্রমূলক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং পরিবেশ বিষিয়ে তুলেছে। আমরা মনে করি, ভুটান ও নেপালও সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে যে কোনও দিন তাদেরও সিকিমের ভাগ্য বরণ করতে হবে। পেশাওয়ারে গোপন মার্কিন বিমান স্থাপনার কথা মনে আছে নতুন দিল্লির এবং নিজের সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন মার্কিন নিরাপত্তা সম্পর্ক ওই ধরনের আরও সুবিধা দেবে। ভারত তার প্রত্যেক প্রতিবেশীর মোকাবেলা করতে চায় দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে এবং এ ব্যাপারে গোঁ ধরে রয়েছে–এক ধরনের 'ভাগ কর ও শাসন কর।' এই নীতি গ্রহণ করে নতুন দিল্লি নিজের আয়তন ও শক্তির সুবিধা নিচ্ছে, ফলে তাড়িত হওয়ার বা বহুপাক্ষিক আঞ্চলিক বৈঠকে একঘরে হওয়ার ভয় থেকে নিস্তার পাচ্ছে। এর আরও অর্থ হচ্ছে ভারতীয় স্বার্থের বিপরীতে সম্মিলিত কাজ থেকে ছোট রাষ্ট্রগুলোকে নিরুৎসাহিত করা, ভারতীয় পরিভাষায় এই কৌশল হচ্ছে ঘেরাও।*

সিআইএর আরও উদ্বেগের বিষয় ছিল, পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে ওই অঞ্চলে সংকট আরও ঘনীভূত হতে পারে এবং যদি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন নতুন দিল্লিকে সমর্থন দেবে। মার্কিন ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তারা মনে করতেন, আফগান প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে পাকিস্তান সমর্থন তুলে নিলে ভারত তাকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু সেটা করার মানসিকতা আমেরিকানদের ছিল না।

১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে এক দল র অপারেটিভ চুপিসারে আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। দুটো স্পর্শকাতর প্রদেশে তাদের সেফ হাউস ও আড়িপাতার পোস্ট স্থাপনের কাজ সুগম করে দিয়েছিলেন মির্জা। পরে কংগ্রেস দলের দুজন পার্লামেন্ট সদস্য, ওয়াই. এস. মহাজন ও সামিনউদ্দীন, ২৪শে ডিসেম্বর কাবুলে অবতরণ করেন প্রেসিডেন্ট কারমালের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। ইন্দিরা

ও জিয়ার মধ্যে একটা বৈঠকের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল আফগানরা এবং পাকিস্তানের অবিশ্বস্ততার ব্যাপারে ভারতীয়দের সতর্ক করে দিয়েছিল। অন্যদিকে, জিয়া চিন্তিত ছিলেন যে পাকিস্তানকে কয়েকটি রাষ্ট্রে ভেঙে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত, যেমন পাখতুনিস্তান, বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব। সুতরাং তার দেশকে সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানা ও রসদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি।

ইতোমধ্যে, একজন র অপারেটিভ বেদ আস্থানা সোভিয়েতের সঙ্গে একটা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর পরামর্শ দেন মাসুদকে। ১৯৮৩ সালে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের পাঞ্জশিরে মাসুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তিনি। জামাত-ই-ইসলামী নেতা রব্বানীর ব্যাপারেও মাসুদকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিল, রব্বানী পাকিস্তানের নির্দেশে পারিচালিত হচ্ছেন বলে জানায় র। যেসব বিদ্রোহী গ্রুপ পাকিস্তান থেকে অভিযান চালাচ্ছে, তাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্থানীয় কমান্ডারদের অধীনে একটা নতুন পরিষদ গঠনের পরামর্শ দেয়া হয় মাসুদকে। রব্বানীর বিশ্বাসঘাতকতা স্বীকার করার পাশাপাশি তার অধীনে ইউনিট গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

আশফাক বলেন, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স মাসুদকে কিছু অর্থ সহায়তা প্রদান করেছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। নিজের সম্পদ দিয়ে পাঁচ হাজার গেরিলার একটা বাহিনী বজায় রেখেছিলেন তিনি, পরবর্তী কয়েক বছরে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি প্রদেশ কব্জা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, পরাস্ত করেছিলেন সোভিয়েত ও আফগান সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তিকে। ১৯৮৩ সালের শেষ দিকে, আশফাক বলেন, আমেরিকান অস্ত্রে বলীয়ান প্রতিরোধ যোদ্ধারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত শক্তিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের হিসাব অনুসারে, সোভিয়েত সেনা সমর্থিত আফগান সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল দেশটির মাত্র তিরিশ শতাংশ এলাকা।

*১৯৮৪ সালে বিদ্রোহীদের আরও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করা হয় গুলি করে রাশিয়ান জেট ও হেলিকপ্টার ভূপাতিত করার জন্য। বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যও দেখা যায়, যা আগে পরিলক্ষিত হয়নি। সোভিয়েত ও আফগান ইন্টেলিজেন্স যদিও পক্ষত্যাগে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ছিল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।*

আশফাক আমাকে বলেছিলেন যে চলমান সংঘাত নিয়ে ভারত কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিল, কারণ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আখতার আবদুর রহমানের নেতৃত্বে আইএসআই একটা সন্ত্রাসী বাহিনীকে প্রস্তুত করছিল আফগান বিদ্রোহ শেষ হলে কাশ্মিরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। নতুন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চেয়েছিলেন, বিশেষ করে আমেরিকানদের সঙ্গে, কিন্তু তিনি জানতেন সে ধরনের পদক্ষেপে মস্কোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবে।

এই সময়ের মধ্যে বিদেশ থেকে আসা তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার দারুণ সামর্থ্য অর্জন করেছিল র। রেড্ডি বলেন, ভারতে কেজিবির তৎপরতার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৫ সালে যদিও তিনি মস্কোয় বৈঠক করেছিলেন মিখাইল গরবাচেভের সঙ্গে, চুপিসারে অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স বুরো (আইবি)-কে একটা রাশিয়ান ট্রয়ের ঘোড়াকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেটা হয়তো অনুপ্রবেশ করতে পারত ভারতের সরকারযন্ত্রে।

'মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন রাজীব এবং এক দিক থেকে তিনি ঠিক ছিলেন। আপনি সবগুলো ডিম একটা ঝুড়িতে রাখতে পারেন না এবং যেহেতু তার মনোযোগ ছিল ভারতের প্রযুক্তি খাতকে শক্তিশালী করা, তাই যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নতুন দিল্লি ও মস্কোর ভিতরকার টানাটানি এখন খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল,' রেড্ডি স্মরণ করেন। তিনি আরও বলেন, রাজীবের মেয়াদকালে র-এর একমাত্র মনোযোগ ছিল সন্ত্রাসী দল ও তাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো। পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় একশো কুড়িটি মারকাজুদ দাওয়া (শিক্ষণ কেন্দ্র) গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে, ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি কোনও সময়ে সোভিয়েত নেতৃত্ব ও কেজিবির চাপে পদত্যাগ করেন প্রেসিডেন্ট বাবরাক কারমাল এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব অর্পণ করেন আফগান ইন্টেলিজেন্স চিফ ড. নাজিবুল্লাহ্কে।

সিআইএর পর্যবেক্ষণ ছিল যে রাজীব গান্ধীর সরকার অনুভব করে সোভিয়েত আগ্রাসনের আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া ভারতের জন্য সরাসরি হুমকি, যেহেতু এর ফলে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে এমন এক অঞ্চলে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেখানে ভারত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে থাকতে চায়।

একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমেরিকানদের হিসাব ঠিক ছিল, মনে করেন র-এর কয়েকজন কর্মকর্তা যাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারা যুক্তি দেন, ভারত সরকার ক্রমশ বেশি করে শ্রীলংকায় জড়িয়ে পড়ছিল, সুতরাং পাকিস্তানের দিকে আরেকটা ভঙ্গুর ফ্রন্ট তার কাম্য ছিল না।

গোপনতামুক্ত সিআইএর ১৯৮৭ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখযুক্ত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, রাজীব গান্ধী অনুভব করেছিলেন যে আফগান ইসু সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু তিনি মনে করতেন না যে আফগান সংঘাতের ফলাফলের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে এমন কিছু ভারত করতে পারবে না। সিআইএর একটি রিপোর্টে বলা হয়:

> *সাবেক আফগান বাদশা জহির শাহ্-এর ভূমিকা অথবা অন্তর্বর্তী ও নিষ্পত্তি-পরবর্তী সরকারের ব্যাপারে ভারত উৎসাহ দেবে, মার্কিন এই সম্মতি তিনি (রাজীব গান্ধী) সম্ভবত মেনে নেবেন। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের পর সেখানে ইসলামাবাদের প্রভাব সীমিত করার ব্যাপারেও গান্ধী আগ্রহী, যাতে কাবুলে পাকিস্তানি মদদপুষ্ট ইসলামী মৌলবাদী সরকার ভারতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে। তার উৎকণ্ঠা হচ্ছে, আফগানিস্তানে সোভিয়েতের ওপর ইসলামী বিজয় হিসেবে ভারতীয় মুসলমানরা যা অনুভব করবে তার পর ভারতের ৯০ মিলিয়ন মুসলমান অধিক সংবেদনশীল হয়ে পড়তে পারে ইসলাম-শাসিত ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রভাবের প্রতি।*

রেড্ডি ও আশফাক বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের কোনও আকর্ষণ নেই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মুসলমান দলগুলোর প্রতি। অধিকন্তু রাজীব গান্ধীকে র অবগত করেছিল যে গরবাচেভের অধীনে মস্কো এরই মধ্যে আফগান সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজছে।

'কতিপয় কূটনৈতিক সমস্যার চেয়ে আমরা বরং বেশি চিন্তিত ছিলাম ভারতের বিরুদ্ধে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হামিদ গুলের বাগাড়ম্বর নিয়ে। ১৯৮৭ সালের মার্চে আইএসআই-এর নতুন প্রধান হন পাকিস্তানি এই জেনারেল। আমাদের এজেন্টরা নিশ্চিত হয়েছিল যে জেনারেল গুল সন্ত্রাসীদের একটা পৃথক ব্যাচকে প্রস্তুত করছেন জম্মু ও কাশ্মিরে অনুপ্রবেশ

করানোর জন্য, আফগান মুজাহিদীনকে প্রদান করা মার্কিন অস্ত্রে তারা সজ্জিত। আফগান বিদ্রোহীদের জন্য পাকিস্তানকে মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদান শুরু করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, ভবিষ্যতে যেকোনও সংঘাত বেধে গেলে সেগুলো ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের আশঙ্কা ছিল,' রেড্ডি আমাকে বলেন।

জেনারেল হামিদ গুল ছিলেন একজন পশতুন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সামরিক আধিপত্য পছন্দ করতেন না তিনি। আইএসআই চিফ হিসেবে গুলের প্রথম পদক্ষেপ ছিল, আশফাক বলেন, গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও অস্ত্র প্রদান, যাতে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান যায় এবং আফগানিস্তানে আইএসআই পরিচালিত এজেন্টদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাতে সাহায্য করা যায়। মাসুদের সঙ্গেও স্বস্তিদায়ক সম্পর্কের চেষ্টা করেছিলেন গুল, কিন্তু ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রতি বিশ্বস্ত যোদ্ধা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার প্রস্তাব।

'নীতির কারণে আমরা হেকমতিয়ারকে রিক্রুট করার চেষ্টা করিনি, যিনি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে নিজেকে বিক্রি করার জন্য তৈরি ছিলেন। আমরা র চিফ এ. কে. ভার্মাকে বলেছিলাম, হেকমতিয়ার একজন সালাফী, আমাদের প্রতি অনুগত থাকবে না। আমরা হেকমতিয়ারকে ছাড়াই আফগানিস্তানে কাজ করতে পারব এবং ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি নাগাদ আমরা সেখানে একটা বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলাম,' আশফাক বলেন।

### জেনারেল ও পবিত্র যোদ্ধারা

আফগানিস্তানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা থেকেই পাকিস্তান থেকে অপারেশন চালান মুজাহিদীনের বিভিন্ন উপদল তথাকথিত পবিত্র যোদ্ধাদের একটা একক সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার নিদারুণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮৬ সালের কোনও এক সময়ে এ ব্যাপারে নতুন করে উদ্যোগ নেন সিবগাতুল্লাহ্ মোজাদ্দেদী, জাব্হা-ই-নাজাত-ই-মিল্লি আফগানিস্তানের নেতা। আইএসআই-এর সহযোগিতায় সাতটি দল নিয়ে একটা জোট গঠনের উদ্যোগ নেন তিনি। মোজাদ্দেদী ও আরও কয়েকজন নেতা ড. নাজিবুল্লাহ্‌র সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং কাবুলের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালানোর আগে প্রবাসী আফগান সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। এই সাত-দলীয় জোটের মুখপাত্র ছিলেন মোজাদ্দেদী। দলগুলোর মধ্যে ছিল হেতমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিজব-ই-ইসলামী, ইউনুস খালিসের হিজব-ই-ইসলামী খালিস, বুরহানুদ্দীন রব্বানীর নেতৃত্বাধীন জামাত-ই-ইসলামী, নবী মোহাম্মদীর

নেতৃত্বাধীন হরকাত-ই-মিল্লি-ই-আফগানিস্তান, আবদুল রসুল সাইয়াফের নেতৃত্বাধীন ইত্তিহাদ-ই-ইসলামী বারাই আজাদী আফগানিস্তান এবং সৈয়দ আহমদ গিলানীর নেতৃত্বাধীন হিজব-ই-ইনকিলাব-ই-ইসলামী। তবে আইএসআই ও সিআইএ মনে করত, দলগুলোর মধ্যে সংহতির অভাব আছে। রাজি বলেন, বিরোধের অন্যতম কারণ ছিল হেকমতিয়ার, সাইয়াফ ও রব্বানীর মৌলবাদী মনোভাব। মোজাদ্দেদী ছিলেন উদারপন্থী এবং মৌলবাদী ইত্তিহাদিস্টদের জন্য আসা সৌদি তহবিলের ব্যাপারে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, যাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আফগানিস্তানে শরীয়া আইন জারি করা। জোটের রাজনীতিতে আইএসআই-এর হস্তক্ষেপকেও ভাল চোখে দেখতেন না মোজাদ্দেদী, অতি উদারনৈতিক হওয়ার কারণে তাকেও অপছন্দ করত পাকিস্তানি এজেন্টরা।

ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের আকারে একটা প্রচণ্ড শক্তির সম্ভাবনা নতুন করে জেগে ওঠে জেনারেল হামিদ গুল আইএসআই-এর দায়িত্ব নেয়ার পর তার হিসেবে। ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে সমস্ত সন্ত্রাসী দলের নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন গুল। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকেই একমত হয় যে নাজিবুল্লাহ্‌ সরকারের ওপর সমন্বিত আক্রমণ চালাতে হলে একটা অধিক গতিসম্পন্ন ও আরও বেশি অত্যাধুনিক বিদ্রোহী বাহিনী দরকার।

ইতোমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান স্বাক্ষরিত জেনেভা চুক্তির পর, ১৯৮৮ সালের মে মাসে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহার শুরু হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে তখনও অনেক বাকি। পাকিস্তান তখনও নাজিবুল্লাহ্‌র অন্তর্বর্তী সরকারকে মেনে নিতে রাজী ছিল না। গুলকে একটা সুদৃঢ় শক্তির মুজাহিদীনকে প্রস্তুত করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন জিয়া। ১৯৮৮ সালের ১৭ই অগাস্ট বাহাওয়ালপুরের কাছে একটি হারকিউলিস সি-১৩০ বিমান দুর্ঘটনায় যদিও নিহত হন জিয়া, নাজিবুল্লাহ্‌ সরকারকে উৎখাতে পাকিস্তানের পরিকল্পনার গতি তাতে একটু ধীর হয়েছিল মাত্র, শেষ হয়ে যায়নি। আশফাকের মতে, ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেনজির ভুট্টো ক্ষমতায় আসার পর গুল তাকে অভিযান চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন।

'গুল তাকে বলেছিলেন, সোভিয়েত সেনা প্রত্যাহারের ফলে যেহেতু বড় বড় আফগান শহর দখল করে নিয়েছে বিদ্রোহীরা, কাজেই যদি পাকিস্তান সমর্থিত একটা অভিযান চালান হয় দ্রুত, আফগান সরকার তাহলে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে বিদ্রোহীরা দখল করে নিয়েছিল

তাখার, পাক্তিকা, বামিয়ান এবং কিছু সীমান্ত এলাকাও। কিন্তু সোভিয়েত কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আফগান বাহিনী যুদ্ধ করে যাচ্ছিল প্রাণান্ত। বেনজির গুলকে ধীরে চলতে বলেছিলেন এবং আফগান মাটি থেকে সোভিয়েত সেনার সম্পূর্ণ প্রত্যাহার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন,' আশফাক আমাকে বলেন।

র স্পাইরা জানতে পারেন, ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে বেনজির ও গুল জালালাবাদ নগরী দখল করে সাত-দলীয় জোট সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আইডিয়াটা ছিল, জালালাবাদকে পবিত্র যোদ্ধাদের সরকারের রাজধানী বানানো।

'আমরা আগেভাগেই নাজিবুল্লাহ্‌র সরকারকে সতর্ক করে দিই, আফগান বাহিনীকে একটা রিপোর্ট প্রদান করি যেখানে উল্লেখ ছিল প্রায় ছয় হাজার মুজাহিদীন জালালাবাদ আক্রমণ করতে পারে। গুল ও তার আস্থাভাজন সিআইএর বন্ধুরা হেকমতিয়ারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জালালাবাদ দখলের পর তিনি হবেন আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। যদিও সত্যতা যাচাই করা যায়নি, তবে আমাদের পেশাওয়ারের এজেন্টরা রিপোর্ট করেছিল যে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত রবার্ট বি. ওকলি পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যেখানে জালালাবাদ অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল,' আশফাক বলেন।

বিদ্রোহীদের শক্তি সম্পর্কে র-এর গোয়েন্দা তথ্য একশো ভাগ নির্ভুল ছিল না, তবে ১৯৮৯ সালের ৫ই মার্চ যথাবৎ জালালাবাদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল। হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন বাহিনী ওই দিনই জালালাবাদ এয়ার বেজ দখল করে নেয়। আফগান সেনারা আত্মসমর্পণ করে এবং মুজাহিদীনের হাতে নিহত হয়। যাই হোক, এর জন্য প্রস্তুত ছিল নাজিবুল্লাহ্‌র সরকার। পবিত্র যোদ্ধাদের জন্য লড়াই অত সহজ হতে যাচ্ছিল না। আফগান সেনাবাহিনী পাল্টা হামলা চালায় এবং সাত-দলীয় জোটের যোদ্ধাদের শোচনীয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে দুই মাসের অবরোধের অবসান ঘটে।

*স্পার্টাকিস্ট ক্যানাডা* নামের মার্ক্সবাদী সংবাদপত্রে একটা নজরকাড়া শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালের ১২ই মে: 'সিআইএর খুনেদের গুঁড়িয়ে দিল আফগানিস্তান!' কাগজটি তার প্রতিবেদনে বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, আফগানিস্তানের সরকারী সেনারা অবরুদ্ধ নগরী জালালাবাদ মুক্ত করেছে এবং মুজাহিদীনের দখল করা অবস্থান পুনরুদ্ধার করেছে। ওই খবরে বলা হয়: 'ওয়াশিংটন ও তার মিত্রদের জন্য এটা অবমাননাকর পরাজয়,

তাদের পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েত সমর্থিত আফগান সরকারকে উৎখাত করে দীর্ঘকাল ধরে ভোগান্তির শিকার এ দেশের জনগণের ওপর মোল্লা, উপজাতীয় প্রধান ও ভূস্বামীদের সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিপদ এখনও দূর হয়নি। একদিকে বিদ্রোহীদের মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে তাদের ওয়াশিংটনের খাজাঞ্চীরা আরও রক্ত চাইছে।'

বেনজির ভুট্টো এই পরাজয়ের জন্য হামিদ গুলকে দায়ী করেন এবং তাকে আইএসআই প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেন, তার জায়গায় নিয়োগ দেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল শামসুর রহমান কাল্লুয়ীকে। কিন্তু শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নাজিবুল্লাহ্ সরকারকে উৎখাত করার পাকিস্তানি বা মার্কিন নীতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের দিকে র অফিসাররা মুখোমুখি হন মার্কিন কর্মকর্তাদের, সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রমাণ ছিল র অফিসারদের কাছে, আশফাক আমাকে বলেন। আমেরিকানদের বলা হয়েছিল যে আফগানিস্তানের জন্য পবিত্র যোদ্ধাদের প্রস্তুত করছে না পাকিস্তান, বরং সন্ত্রাসবাদীদের তৈরি করছে, ভবিষ্যতে যারা পশ্চিমা শক্তিগুলোকে ভূতের মত তাড়া করবে। ভারতীয় এজেন্টরা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালের ১৩ই নভেম্বর প্রস্তুতকৃত সিআইএর একটি নোটে বলা হয়, আমেরিকান গোয়েন্দা মহল মনে করে যে আফগান বিদ্রোহীরা সময়ে জয়ী হবে, কিন্তু অব্যাহত মার্কিন সমর্থন হবে অপরিহার্য।

*মুজাহিদীন সঠিক কৌশল প্রয়োগ করছে–যোগাযোগের লাইনে হামলা চালাচ্ছে, এয়ারফিল্ডে হামলা চালাচ্ছে, দেশব্যাপী ছোট ছোট সামরিক আক্রমণ জোরদার করার চেষ্টা করছে। যুদ্ধ হয়তো আরও কয়েক বছর দীর্ঘ হতে পারে, আর এই শীতকালের মধ্যে সামরিক শক্তির ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে না। নাজিবুল্লাহ্‌র কাবুল সরকার টিকে আছে বিপুল পরিমাণ সোভিয়েত মদদের কারণে। এই সরকার সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আফগানের কাছে তারা এখনও অগ্রহণযোগ্যই রয়ে গেছে। সরকার উপদলে বিভক্ত এবং শহর এলাকার বাইরে নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করতে পারবে না। গুরুত্বপূর্ণ মুজাহিদীন কমান্ডাররা অবশ্যই অধিক আক্রমণাত্মক, বিশেষ করে যারা উত্তরাঞ্চলে রয়েছেন, যেমন আহমদ শাহ্ মাসুদ ও ইসমাইল খান, তারা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছেন। এই পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে সেটা হবে মার্কিন*

*স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে খারাপ বিকল্প, কারণ এর ফলে যুদ্ধের মাত্রা অবিলম্বে নেমে যাবে, নাজিবুল্লাহ্র ওপর চাপ হ্রাস পাবে এবং পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়বে। নিষ্ক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্তে মুজাহিদীন মনে করবে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এবং পরিণামস্বরূপ আফগানিস্তানে একটা মার্কিনবিরোধী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। মুজাহিদীনের সামরিক চাপ এরই মধ্যে কাবুল সরকারকে ব্যাপক পরিবর্তন ও আপসকামিতায় বাধ্য করেছে। অব্যাহত চাপে হয় সরকার সামরিকভাবে পরাজিত হবে, নয় তো কাবুলে যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে সেটুকু সমঝোতায় পৌঁছাবে। নাজিবুল্লাহ্কে সম্ভবত যেকোনও দৃশ্য থেকে অবশ্যই প্রস্থান করতে হবে।*

মুজাহিদীনের কৌশল সম্পর্কে দুটো আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার বিভিন্নমুখী মত দেখা গিয়েছিল। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (ডিআইএ) মনে করত, মুজাহিদীনের নিচু পর্যায়ের নাশকতার কৌশল নিকট ভবিষ্যতে নাজিবুল্লাহ্ সরকারকে হুমকিতে ফেলবে না। প্রকৃত পক্ষে ছয় মাস আগের চেয়ে বর্তমানে নাজিবুল্লাহ্ অনেক বেশি শক্তিমান ও উচ্চ মনোবলের অধিকারী। এর কারণ আফগান সেনাবাহিনীর বিস্ময়কর নৈপুণ্য এবং নির্ভরযোগ্য উঁচু মাত্রার সোভিয়েত মদদ। যাই হোক, সিআইএ মনে করে যে মুজাহিদীন একই রকম নাশকতার কৌশল অনুসরণ করছে যা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সাফল্য এনেছে এবং নাজিবুল্লাহ্র সরকারের পতন ঘটাতে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

### চূড়ান্ত আক্রমণ

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে মাসুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বেদ আস্থানা, পাকিস্তানে বেনজির ভুট্টো সরকারের পতনের এক মাস পর। মধ্যপ্রাচ্যে ইতোমধ্যে উপসাগরীয় যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে, আর পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে র-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। নাজিবুল্লাহ্ আফগান সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু প্রতিরোধ বাহিনী অবিরাম হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল, ফলে দেশের ভূমির ওপর সরকারের প্রভাব হ্রাস পেতে পেতে মাত্র দশ শতাংশে এসে ঠেকেছিল। নাজিবুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কাবুল থেকে সমস্ত মিলিশিয়া গ্রুপকে উচ্ছেদ করবেন। এর মধ্যে মির্জার নেতৃত্বাধীন জুজ্জানী

মিলিশিয়াও ছিল, মির্জাকে আফগান সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে মনে করা হত এক সময়ে। এই ঘটনা ছিল অপ্রত্যাশিত। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে একজন ভারতীয় গুপ্তচরকে পাঠান হয় আবদুল জলিলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, জলিল ছিলেন হিজব-ই-ওয়াহ্দাত ইসলামী আফগানিস্তানের নেতা, এই সংগঠনের প্রভুত প্রভাব ছিল তাজিক ও হাজারা জাতিগোষ্ঠীর ওপর। জলিলকে সন্তোষজনক পরিমাণ টাকা দেয়া হয় এবং তাজিকিস্তান ও ইরানে অপারেশন চালানোর জন্য তার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে র। কিন্তু ভারতীয় এজেন্টদের নেটওয়ার্কের মধ্যে সমস্ত যুদ্ধবাজদের ভিতর মাসুদ ছিলেন সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত শক্তিশালী। যদিও তাকে দেয়া সাহায্যের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য।

'তিনি সবসময় সামনে থেকে আক্রমণ করতে চাইতেন। তার বাহিনীর ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেদ সাহেব, আমরা যুদ্ধ করার জন্য জন্মেছি, ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমরা শীগগিরই আফগানিস্তান শাসন করব,'' বেদ আস্থানা স্মৃতিচারণ করেন।

১৯৯১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর এবং এর পরই আফগানিস্তানকে সাহায্য দেয়া বন্ধের রাশিয়ান সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে নাজিবুল্লাহ্ একা হয়ে পড়েন। ১৯৯২ সালের মার্চে তিনি পদত্যাগের প্রস্তাব দেন এবং এপ্রিলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন। পরে তিনি কাবুলে জাতিসংঘ অফিসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

আফগান যুদ্ধাপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করেছিল আফগান জাস্টিস প্রজেক্ট। তারা জানায়, নাজিবুল্লাহ্র সরকারের পতনের কয়েক মাসের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল কাবুলে। যেসব উপদল নাজিবুল্লাহ্র সরকার ও সোভিয়েত দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, এই সংঘর্ষের কালে তারা রাজধানীর ভিতরে ও বাইরের এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিতে বিভিন্ন মিলিশিয়া গ্রুপের সঙ্গে একত্রে লড়াই করেছিল। জাতিসংঘের উদ্যোগ সত্ত্বেও স্থিতিশীলতার স্বার্থে ক্ষমতা ভাগাভাগির কোনও রাজনৈতিক চুক্তির পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ সমর্থন লার্জন করা সম্ভব হয়নি। নাজিবুল্লাহ্র সাবেক মিত্র কয়েকজন কমান্ডারের সঙ্গে আলোচনার পর আহমদ শাহ্ মাসুদের বাহিনী কাবুলে প্রবেশ করে। অন্যান্য মুজাহিদীন বাহিনীও নগরীতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পাড়া-মহল্লার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার দাবী করে। নাজিবুল্লাহ্র সরকারের বেশ কিছু ইউনিট মাসুদের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

অবিলম্বে লড়াই শুরু হয়ে যায় মাসুদের বাহিনী ও গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের হিজব-ই-ইসলামীর মধ্যে। জুনবিশ-ই-মিল্লি নামে পরিচিত মির্জা মুরাদ রুস্তমের আমব্রেলা গ্রুপের সঙ্গে মিলে মাসুদের বাহিনী রকেট ও আর্টিলারি হামলা চালায় হিজব-ই-ইসলামীর ঘাঁটিতে, অন্যদিকে হেকমতিয়ারের বাহিনী হামলা চালায় বিমানবন্দরে ও প্রাসাদের আশেপাশে, শত শত বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করে।

আস্থানা বলেন, 'মাসুদ ছিলেন প্রকৃত যোদ্ধা, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হওয়ার পক্ষে একটু বেশি লাজুক। একটা পর্যায়ে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু ওই পদ গ্রহণ করতে আমরা তাকে রাজি করিয়েছিলাম। কারণ আফগান নীতি নির্ধারণের শীর্ষ পর্যায়ে আমরা কাউকে চেয়েছিলাম।'

আফগানিস্তান জাস্টিস প্রজেক্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বুরহানুদ্দীন রব্বানীর নেতৃত্বাধীন ইসলামিক স্টেট অফ আফগানিস্তানের মেয়াদে মাসুদের লক্ষ্য ছিল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীগুলোকে পরাস্ত করা। হেকমতিয়ার ছাড়াও তাকে লড়াই করতে হয়েছিল হিজব-ই-ওয়াহ্‌দাত এবং পরে মির্জার জুনবিশ বাহিনীর বিরুদ্ধেও।

ওই প্রতিবেদনের মতে, ১৯৯২ সালে ইসলামিক স্টেট অফ আফগানিস্তানের মেয়াদের প্রথম বছরে, 'তার (মাসুদের) প্রধান শত্রু ছিল হিজব-ই-ইসলামী, যাদের রকেট হামলায় ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে নিহত হয় কয়েক হাজার বেসামরিক মানুষ। এ তথ্য নগরীতে কর্মরত মানবিক ত্রাণ সংস্থাগুলোর। যাই হোক, এ ধরনের হামলার নির্দেশ শুধু হেকমতিয়ারই দিতেন তা নয়: কাবুলের প্রতিটা প্রধান সশস্ত্র উপদলের কাছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল, তারা সেগুলো ব্যবহার করত এই সময়ে। যাদের কাছে যুদ্ধবিমান ছিল, মাসুদের বাহিনী ও জুনবিশ সহ, তারা যুদ্ধের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে কাবুলের দক্ষিণে ও পশ্চিমে বোমাবর্ষণ করত। ইত্তিহাদ ও মাসুদের সঙ্গে লড়াইতে হিজব-ই-ওয়াহ্‌দাতও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করত। এই সমস্ত হামলার বেশির ভাগই ছিল বাছবিচারহীন, এতে হাজার হাজার বেসামরিক লোকজনের প্রাণহানী ঘটেছিল আর এগুলো ছিল যুদ্ধরীতির ভয়ংকর লংঘন।'

আশফাক বলেন, ১৯৯৩ সালের শেষ দিক থেকে মাসুদকে র সাবধান করে দিচ্ছিল যে মৌলবাদী তালিবান মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে পাকিস্তানের মদদে, তাদের কাবুলে এসে পড়া কেবল একটু সময়ের ব্যাপার। ১৯৯৫ সালে

আইএসআই মদদপুষ্ট তালিবান কান্দাহারের নিয়ন্ত্রণ দখল করে এবং এরপর হেলমন্দ ও ওয়ারদাক প্রদেশ দখলে নিয়ে শরীয়া (ইসলামী শাসন) আরোপ করে। তালিবান নেতা মোল্লা ওমর বাইশ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের (শুরা) নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, এবার তিনি কাবুল দখলের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রথম চেষ্টা চালান হয় ১৯৯৫ সালের শেষ দিকে। ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে জালালাবাদকেও টার্গেট করেছিল তালিবান এবং ওই নগরীর নিয়ন্ত্রণ দখল করে ১৯৯৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। ২৬শে সেপ্টেম্বর তালিবান বাহিনী প্রবেশ করে কাবুলে।

আশফাক বলেন, 'তালিবান কাবুল দখল করার ফলে আমাদের তিনজন অ্যাসেট–আহমদ শাহ্ মাসুদ, আবদুল জলিল ও মির্জা মুরাদ রুস্তম–পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হন। তারা একটা নতুন জোট গঠন করেন এবং তালিবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমরা তাদের সবরকম সাহায্য করি। আবদুল জলিল একবার আমাকে বলেছিলেন যে পাকিস্তান টাকা আর অস্ত্র দিয়ে তালিবানকে খোলাখুলি সহযোগিতা করছে। আমাদের বাহিনীর জন্য আপনারাও কি সেটা করতে পারেন? যদি পারেন, তবে আমরা মানচিত্র থেকে পাকিস্তানকে মুছে দেব।'

জলিলের কথায় থ হয়ে গিয়েছিলেন আশফাক। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান যোগসাজশ সম্পর্কে এই আফগানের গভীর যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যে যোগসাজশের পরিণতিতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল তাদের দেশ। 'আমি তাকে বলেছিলাম যে আমরা সেটা করতে পারি না, কারণ আমরা দায়িত্বশীল, গণতান্ত্রিক জাতি এবং পাকিস্তানের মত দুর্বৃত্ত দেশ নই,' আশফাক বলেন।

এমনকি ডিআইএ পর্যন্ত তালিবানের বীজ বপনে পাকিস্তানের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছিল। একটা রিপোর্টে সংস্থাটি বলেছিল, ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের একটা গ্রুপ ছিল তালিবান। তখন তারা চাইত না আফগানিস্তান চলে যাক মুজাহিদীনের দখলে। পাকিস্তানের মদদে তারা সামরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে আফগানিস্তানের প্রায় নব্বই শতাংশের নিয়ন্ত্রণ দখল করে। ওই রিপোর্টে বলা হয়:

> *তালিবান বাহিনীর তুলনায় তাদের বিরোধী অনেক আফগান বাহিনী ছিল সংখ্যায় ও অস্ত্রের দিক থেকে নগন্য এবং তারা সরাসরি তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনি। সাবেক মুজাহিদীন কমান্ডার*

*আহমদ শাহ্ মাসুদ নর্দার্ন অ্যালায়েন্স ফোর্সেস (এনএএফ) গঠন করতে পেরেছিলেন এবং আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখেছিলেন। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের গোয়েন্দা তৎপরতায় মাসুদ কিছুটা ধারণা অর্জন করেছিলেন যে, সৌদি কোটিপতি ওসামা বিন লাদেন ও তার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়দার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা সন্ত্রাসী হামলা চালানোর উদ্দেশ্য রয়েছে।*

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার আশঙ্কা ছিল, যুদ্ধে আধিপত্য অর্জন করা মাত্রই নাজিবুল্লাহ্‌কে হত্যা করতে সময় নষ্ট করবে না তালিবান। বেদ আস্থানা নাজিবুল্লাহ্‌র কাছে পাঠান র-এর বার্তার স্মৃতিচারণ করেন, নাজিবুল্লাহ্ তখন অবস্থান করছিলেন কাবুলে জাতিসংঘ মিশনে। ওই বার্তায় তাকে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছিল, এজন্য তাকে সুরক্ষাও দিতে চেয়েছিল র। সাবেক প্রেসিডেন্ট তা প্রত্যাখ্যান করেন সঙ্গে সঙ্গে। অনিচ্ছুক মাসুদের মাধ্যমে আরেকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আবারও সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন নাজিবুল্লাহ্, যুক্তি দেখান যে তালিবান হয়তো তার ওপর হামলা করবে না।

'পাকিস্তান-তালিবান ভাঁওতাবাজি সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় উক্তি আর হুশিয়ারি সত্ত্বেও নাজিবুল্লাহ্ কোনও ধরনের অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তা ঘটেনি। তাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করেছিল তালিবান,' বলেন আস্থানা।

কাবুলে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তালিবান ক্ষমতা দখল করার পর। মাসুদ ও অন্যান্য যোদ্ধারা পশ্চাদপসারণ করেছিলেন উত্তরাঞ্চলীয় আফগানিস্তানে। এক সরকারী বিবৃতিতে ভারত স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, পরিস্থিতি অধিকতর খারাপ হয়েছে পাকিস্তানের সরাসরি হস্তক্ষেপে এবং তা আরও খারাপ হয়েছে তালিবান সৃষ্টি করার মাধ্যমে। র-এর রিপোর্টে বলা হয়, আফগান রাজধানীতে হামলার সময় তালিবান মিলিশিয়া নিয়মিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সক্রিয় সাহায্য পেয়েছে। কূটনৈতিক ফ্রন্টে ভারত সরকার আফগানিস্তানে রব্বানীর শাসনের প্রতি তার স্বীকৃতি অব্যাহত রেখেছিল, কিন্তু গোপন দুনিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় ছিল তালিবানের অগ্রগতি। ১৯৯৭ সালের প্রথম দিক থেকে তিনজন র অ্যাসেট মির্জা, মাসুদ ও জলিলের সম্মিলিত নর্দার্ন অ্যালায়েন্স বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রাভিযান অব্যাহত ছিল তালিবানের। কয়েক মাস পর মির্জা হয়ে পড়েন অসহায় ও গৃহহারা।

ইস্তানবুলে নিয়তিনির্দিষ্ট সেই দিনটিতে মির্জার সঙ্গে আশফাকের সাক্ষাৎ ছিল একটা উদঘাটন, যে আফগানিস্তানে সক্রিয় বিদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন মদদ দিচ্ছে পাকিস্তান। সন্ত্রাসবাদ উস্কে দেয়া ও মৌলবাদী শক্তি গজিয়ে তোলার পাকিস্তানি পরিকল্পনা উদঘাটন করেছিলেন মির্জা।

'আইএসআই এবং গোটা সন্ত্রাসবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে র-এর জানা থাকা দরকার ছিল,' আশফাকের দিকে মির্জা তাকিয়েছিলেন বিস্ময়ের সঙ্গে।

'আমরা জানি, জিহাদীদের লালন করা এখনও আইএসআই-এর একটা বলবত থাকা নির্দেশ এবং তারা সন্ত্রাসবাদীদের মাধ্যমে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সব রকম চেষ্টা করছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের কাছে প্রমাণ তুলে ধরার মাধ্যমে আমরা যতটুকু করতে পারি তা করছি,' আশফাক বলেন।

'আপনি কি মনে করেন এসব দেশ আফগান জনগণের ব্যাপারে আদৌ কোনও পরোয়া করে?' ক্ষুব্ধ মির্জা পাল্টা প্রশ্ন করেন।

আশফাক নীরব ছিলেন। ভারতীয় গুপ্তচর মহলে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল যে আফগানিস্তানে র দুর্দান্ত কাজ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর কবল থেকে দেশকে রক্ষার চেষ্টা যারা করছিলেন সেইসব আফগান যুদ্ধবাজ ও প্রাদেশিক নেতাদের যতটুকু সহযোগিতা দেয়া দরকার ছিল ততটুকু সহযোগিতা দিতে পারেনি।

'এমনকি মির্জারও অনেক নালিশ ছিল। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি ভারতের জন্য অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু ভারতীয়রা তার জন্য কিছুই করেনি। তিনি বলেছিলেন, যেসব অ্যাসেট ও দল পাকিস্তানের সাহায্যে বিকশিত হয়েছে তাদের পাকিস্তান কীভাবে সাহায্য করে দেখুন। আমি তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইনি, কারণ এক দিকে থেকে তার কথা ছিল পুরোপুরি সঠিক। মির্জার মত অ্যাসেটদের জন্য আমাদের আর্থিক সহযোগিতা ছিল খুবই সামান্য। আমি তার পাওনা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ পর তার একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় প্রাগে। মির্জাকে দেয়ার জন্য তার হাতে আমি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ তুলে দিয়েছিলাম,' আশফাক বলেন।

১৯৯৭ সালের অক্টোবরে মির্জা আবার যোগাযোগ করেন আশফাকের সঙ্গে। কিছু কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ভারতীয় গুপ্তচর তখন ছিলেন মাদ্রিদে। 'মির্জা একটা উপকার চান, তার দূত আমাকে বলেছিলেন। মির্জার একজন

দূর-সম্পর্কের আত্মীয় তুর্কী নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। আপনি কি তার হাতে এটা পৌছে দিতে পারেন? তিনি সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ থাকবেন,' আশফাক স্মৃতিচারণ করে বলেন।

তুর্কী কর্তৃপক্ষের মধ্যে কন্ট্যাক্ট সক্রিয় করতে দুই মাস লেগেছিল আশফাকের। তাদের বলা হয়েছিল, অনুগত একজন বন্ধুর জন্য এটা ছিল বিশাল উপকার। 'আমি কোনও ভাবে নাগরিকত্ব জোগাড় করেছিলাম এবং মির্জা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি মাদ্রিদে এসেছিলেন আমার কাছে। আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে সক্রিয় উজবেক ইন্টেলিজেন্স কালেকশন অপারেশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি সেটা করেছিলেন। ১৯৯৮ সালের প্রথম দিকে ওই নেটওয়ার্কের ভিতরে ঢোকার অবাধ সুযোগ দেয়া হয়েছিল আমাদের, যার ফলে পরে আমরা অন্তত তিনজন ক্ষমতাশালী বেলুচ নেতার সঙ্গে যোগযোগ করতে সক্ষম হই। ভবিষ্যতের প্রয়োজনে এই তিনজন অ্যাসেটের সবাইকে আমি রিক্রুট করেছিলাম। ওই অঞ্চলে পা রাখার একটা উপায় আমরা পেয়েছিলাম এবং পরে যখন সুযোগ এসেছিল তখন সফলভাবে আমাদের আড়িপাতার পোস্ট স্থাপন করেছিলাম গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোয়,' বলেন আশফাক।

'কিন্তু আমরা কি বাস্তবিকই আফগানিস্তানে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি?' ধৌলাধর পাহাড়মুখী একটা পানশালায় কিছু পান করার সময় আমি জিজ্ঞেস করি আশফাককে।

'একটা নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত। আমি দাবী করব না যে যা আমরা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। সেটা যুক্তরাষ্ট্রের কারণেও। দেখুন, সোভিয়েত আগ্রাসনের সময় থেকেই আফগানিস্তান হয়ে ওঠে আমেরিকানদের কাছে একটা থিয়েটার। তারা সেটা দীর্ঘকাল ব্যবহার করতে চেয়েছে। আমি বলব, আমেরিকানদের গোলাবারুদ পরীক্ষার গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে আফগানিস্তান,' আশফাক মৃদু হাসেন। 'আমাদের উদ্বেগের সেটাই ছিল কারণ।'

র-এর আশঙ্কা সত্য হয় ১৯৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। আইএসআই সমর্থিত হরকাত-উল-মুজাহিদীনের সন্ত্রাসবাদীরা সেদিন এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট আইসি-৮১৪ ছিনতাই করে। বিমানটিতে একশো ষাটজন আরোহী ছিল। দুর্ভাগা বিমানটিকে কান্দাহারে অবতরণ করান হয়, যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র কাঁধে নিয়ে তালিবান জঙ্গীরা সেটিকে পাহারা দেয়। ভারত

তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি, তবে বিমান ছিনতাই এবং ওই বিমানে একজন র অফিসারের উপস্থিতির ফলে জঙ্গীদের সঙ্গে একটা রফা করতে বাধ্য হয়েছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার। পরে এমইএ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একটা বিবৃতি দেয়।

'তালিবানকে আমাদের স্বীকৃতি না দেয়া, এর অন্ধকারাচ্ছন্ন আদর্শের ব্যাপারে আমাদের অননুমোদন এবং পাকিস্তানের দ্বারা এর নিজেকে ব্যবহার করতে দেয়ার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও, আমরা তালিবানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছিলাম ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আইসি-৮১৪ ছিনতাইয়ের সময়। এই সংকটের সময় তালিবান যে ভূমিকা নিয়েছিল সেটা ছিল বিশিষ্ট, কিন্তু আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম যে আমাদের আফগান নীতির মূল বদলাবে না।'

মানহানীর কথা ভোলেনি র। ২০০০ সালে ভারতীয় স্পাইরা আফগানিস্তানের ব্যাপারে একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছিল হিংস্রতার সঙ্গে। তালিবান যখন শহরের পর শহর দখল করে নিচ্ছিল, যার মধ্যে ছিল বাগলান, তাখার ও কুন্দুজ প্রদেশের নগরগুলোও, সেই সময় ভারতীয় এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক মাসুদের সঙ্গে নীরবে কাজ করে চলেছিল একটা পাল্টা-আক্রমণের কৌশল নিয়ে। ২০০০ সালের অক্টোবরে আফগান অঞ্চল হাজারীবাগ, খাজাগার ও ইমাম সাহিবের র রিক্রুটদের সহায়তায় মাসুদের বাহিনী বিপুল আক্রমণ হানে তালিবান ঘাঁটিগুলোর ওপর। ২০০০ সালের অক্টোবরের শেষ নাগাদ র-এর প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়। যেসব বড় শহর তালিবান কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল সেগুলোর সবই পুনর্দখল করে মাসুদের যোদ্ধারা।

'যদিও আফগানিস্তানে আমাদের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ছিল, মাসুদ ছিলেন আমাদের সবচেয়ে সেরা অ্যাসেট। তার মত আর কাউকে আমরা পাইনি। ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসীরা ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তাকে হত্যা করে, র তখন তার বাহিনীর সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন নিয়ে কাজ করছিল কুনার, লাগমান ও বামিয়ান প্রদেশে। আমরা বিমানে করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাজিকিস্তানের ফারখোরে আমাদের ফিল্ড হসপিটালে, কিন্তু মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি,' বলেন আস্থানা।

দুই দিন পর ওসামার সন্ত্রাসীরা বিপুল আঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর, নিউ ইয়র্কে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ধুলিসাৎ করে দেয় তারা। আস্থানা বলেন, আফগানিস্তানে তালিবান ও আল-কায়দার সন্ত্রাসী আখড়ার সন্ধান পেতে র-এর সাহায্য চেয়েছিল সিআইএ এবং ভারতীয়

সংস্থাটি সন্ত্রাসবাদীদের গোপন আস্তানা ও নেতাদের শুলুকসন্ধানের ভাণ্ডারটি খুলে দিয়েছিল তাদের জন্য। সিআইএকে খোলাখুলি বলা হয়েছিল যে সন্ত্রাসের আসল উৎসমুখ ছিল পাকিস্তান।

'আমেরিকানরা তখন এ কথা মেনে নিতে রাজী ছিল না। সেটা ছিল বিশাল ভুল এবং সেটা তারা স্বীকার করেছিল ২০০২ সালের প্রথম দিকে আমাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে। কিন্তু ২০০১ সালের হামলার অব্যবহিত পরের সময়টায় যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল, সেই সময় তারা আইএসআইকে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের বিশাল অংশীদার মনে করে ভুল করেছিল,' বলেন আস্থানা।

র স্পাই আরও স্মরণ করেন, ২০০২ সালে একটি ইউরোপীয় দেশে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল জেনারেল হামিদ গুলের। দেখা হয়েছিল দৈবাৎ, আস্থানা জানান। তিনি রিসিপশন এলাকায় পায়চারি করছিলেন এবং কালো কোট পরিহিত জেনারেল গুল একটা লিফট থেকে হোটেলের লবিতে বেরিয়ে আসেন এবং তিনি তার দিকে হেঁটে যান।

'আমি তাকে বলেছিলাম, 'জেনারেল সাহেব, আপনি ভারতকে নিয়ে বীণা বাজিয়েই যাচ্ছেন। আপনি কি মনে করেন, পাকিস্তান সত্যিই আমাদের দেশ জয় করে নিতে পারবে?' তিনি কয়েক সেকেন্ড হতবুদ্ধি হয়ে থাকেন, তারপর বলেন, 'না।' তখন আমি ছুঁড়ে দিই আরেকটি প্রশ্ন। 'আপনি কি মনে করেন, পাকিস্তান জয় করে নিতে চায় ভারত?' জেনারেল গুল এবার মৃদু হাসেন এবং বলেন, 'হ্যাঁ।' তখন আমি বলি, 'জেনারেল সাহেব, এটাই আপনাদের আসল সমস্যা, আপনাদের নিরাপত্তাহীনতার বোধ রয়েছে।' গুল কিছুটা উত্তেজিত হন এবং নিচু কণ্ঠে আমাকে বলেন যে কাশ্মিরে ভারতের রক্ত ঝরাবে পাকিস্তান। আমি বলি, 'জেনারেল সাহেব, আপনার ইতিহাস জানা নেই। একটা জাতির দীর্ঘ জীবন রয়েছে, কথাটা ভুলে যাবেন না।'' এই মৌখিক দ্বন্দ্বে ভীষণ বিব্রত হয়েছিলেন জেনারেল গুল এবং পিছু হটেছিলেন।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর হামলার ঘটনায় বিশ্বের এই অংশে নিরাপত্তা ও কৌশলগত গতিপ্রকৃতি বদলে গিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমেরিকা ও তার মিত্রদের পক্ষ নিচ্ছে দেখানোর জন্য আইএসআই ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী কৌশলগত পিছু হটেছিল, কিন্তু তারা পরবর্তী পদক্ষেপের ছক কষছিল আফগানিস্তান ও ভারতকে টার্গেট করে। র স্পাইরা ভারতের জন্য কাজ করেছিল ভালভাবে। অন্তত আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে। তারা বেশ কয়েকটি গোপন অভিযান চালিয়েছিল।

আফগান সীমান্তের ভিতরে আশফাক ও আস্থানার নেতৃত্বাধীন টিম নির্ভরযোগ্য শিকারীদের খুঁজে পেয়েছিল।

'সেরা অপারেটিভ থাকা সত্ত্বেও আমরা আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর বিরুদ্ধে কিছু নির্দিষ্ট গোপন অভিযান পরিহার করেছি। সেগুলো করা হয়েছে ভিতর থেকে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের চাপের কথা মাথায় রাখতে হত আমাদের। ওই অঞ্চলে আমাদের উপস্থিতি নিয়ে তারা হয়তো প্রশ্ন তুলত। বড় প্রশ্নটা হচ্ছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক চাপ নিতে পারে কিনা,' আস্থানা বলেন।

আত্মবিশ্বাসী আশফাক তার সিনিয়রের সঙ্গে বেশি একমত হতে পারেন না। তিনি অকপটে বলেন, আফগানিস্তানে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, র ঠিকই নিজের লোক পেয়ে যাবে ক্ষমতাধর পজিশনে।

৩

# শ্রীলংকার ঘটনা

২০০৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর সকালে কলম্বো ফোর্ট কাফেতে হাজির হন অবিনাশ সিনহা। তাকে বলা হয়েছিল নগরীর সবচেয়ে সেরা শ্রীলংকান নাশতা পাওয়া যায় এখানে। সেটাই খুঁজছিলেন তিনি। এচেলন স্কয়ারে ডাচ হসপিটাল কমপ্লেক্সে অবস্থিত নীল-হলুদ রঙে রাঙান রেস্তোরাঁটির দারুণ সুনাম ছিল আর সিনহাও ছিলেন ক্ষুধার্ত।

লোভীর মত যখন তিনি মেনু দেখছিলেন, পঞ্চাশের মত বয়স একজন ধূসর চুলের লোক তাকে দেখতে পেয়ে মুখ টিপে হাসেন, যাকে তিনি খুঁজছেন সেই ব্যক্তি কী খাবেন তা স্থির করতে মেনুর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। ধূসর চুলের মানুষটা লাল রঙের টেবিলটার কাছে আসেন এবং বলেন, 'তোমাকে দেখে ভীষণ খুশি হলাম, অবিনাশ।'

'কোসালা! বহু দিন পর দেখা, বন্ধু আমার। দেখ তোমাকে। এই সকাল বেলাতেই তুমি সিংহের মত তৈরি।'

কাফের এই নিরিবিলি কোণে মানুষ দুটো আলাপ করতে থাকেন। অবিনাশ, একজন র অপারেটিভ, হয়তো কোসালা রতনায়াকের চেয়ে কয়েক শরৎ ছোট হবেন বয়সে, সেই অক্টোবরে কলম্বোয় ফিরে এসেছিলেন তিন বছর পর। ২০০২ সালের জানুয়ারিতে তিনি রিক্রুট করেছিলেন কোসালাকে। কোসালা ছিলেন শ্রীলংকান সরকারের একজন শীর্ষ কার্যনির্বাহক। সেই সময় শ্রীলংকান সরকার গুরুত্ব সহকারে লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)-এর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় লিপ্ত ছিল। সশস্ত্র গেরিলা গ্রুপ এলটিটিই শ্রীলংকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অংশে একটা স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করছিল গত ২৫ বছর ধরে। ২০০২ সালের আগের কয়েক মাস ছিল গৃহযুদ্ধের একটা টার্নিং পয়েন্ট যখন আন্তর্জাতিক চাপে ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে উপনীত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে বিদ্রোহী সংগঠনটিকে গঠন করেছিলেন ভেলুপিল্লাই প্রভাকরন। ১৯৮০ সালের শুরুর

দিকে শ্রীলংকা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে সংগঠনটি। উত্তর প্রদেশের একটা অজ্ঞাত স্থানে প্রভাকরনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল র। ২০০২ সালে কোসালা যখন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাটির সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাসেটদের একজনে পরিণত হন, প্রভাকরনের যুগ তখন অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু অবিনাশকে কোসালা সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, শান্তি আলোচনায় খুশি ছিলেন না প্রভাকরন। তার ধারণা ছিল টাইগারদের ওপর অন্যায্য চুক্তি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কয়েক বছরের মধ্যেই আরও এক দীর্ঘ, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ নিয়ে ফিরে আসবে টাইগাররা। এটা ছিল একটা পয়গম্বরসুলভ বিবৃতি এবং শ্রীলংকার রাজধানীতে অবিনাশের ফিরে আসার একমাত্র কারণ।

'প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাক্সার ব্যাপারে মোটেও স্বস্তিতে নেই এলটিটিই। আমার বরং বলা উচিৎ, প্রেসিডেন্টকে বিশ্বাস করেন না প্রভাকরন এবং প্রেসিডেন্ট চান না শ্রীলংকার মাটিতে এক মিনিটের জন্যও অবস্থান করুন প্রভাকরন। তারা একে অন্যকে ঘৃণা করেন। নরওয়ের শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হবে। রাজাপাক্সা সরকারের সঙ্গে কখনই আলোচনায় যাবেন না প্রভাকরন,' এক কাপ কফি পান করতে করতে এ কথা বলেন কোসালা।

অবিনাশ হাসেন। 'তাহলে তুমি মনে কর একটা সর্বাত্মক যুদ্ধই একমাত্র অপশন?' তিনি প্রশ্ন করেন।

'প্রেসিডেন্ট তেমনটাই মনে করেন। যদিও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তিনি হয়তো এলটিটিইকে আরেকটা সুযোগ দিতে পারেন,' কোসালা মৃদু হাসেন।

কয়েক মাস পর যুদ্ধ ফিরে এসেছিল। শ্রীলংকান সেনাবাহিনী প্রধান সরথ ফনসেকাকে লক্ষ্য করে ২০০৬ সালের এপ্রিলে একটা হামলার ব্যাপারে অবিনাশকে প্রথম অবগত করেছিলেন কোসালাই। এলটিটিই ওই আত্মঘাতী হামলার কথা অস্বীকার করেছিল, তাতে মারাত্মক আহত হয়েছিলেন সেনাপ্রধান, কিন্তু প্রেসিডেন্ট রাজাপাক্সা সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য টাইগারদের দোষারোপ করে যাচ্ছিলেন সব দিক থেকে এবং এলটিটিইর ঘাঁটি লক্ষ্য করে নিবিড় বোমাবর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বিমানবাহিনীকে। সেই হামলা চলেছিল দুই দিন। কিন্তু আরও হামলা আসার অপেক্ষায় ছিল। অবিনাশ ও কোসালা লক্ষ্য করেছিলেন, ২০০৬ সালের মে মাসে আরেকটি আক্রমণ রচনা করে এলটিটিই, এবার লক্ষ্য ছিল শ্রীলংকান নৌবাহিনী। একটা নৌযান ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং অন্যান্য টহল দলের ওপর টাইগাররা গুলি চালায়, সাগর হয়ে ওঠে গৃহযুদ্ধের নতুন রঙ্গালয়। কোসালা বলেন, এলটিটিইকে একটা

সন্ত্রাসবাদী দল ঘোষণা করার শ্রীলংকান সরকারের দাবী মেনে নিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০০৬ সালের ১৯শে মে বিদেশের মাটিতে এলটিটিইর অ্যাসেটদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এই যুক্তিতে যে সন্ত্রাসবাদী দল শ্রীলংকার তামিলদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

## সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল

বিগত বহু দশক ধরে শ্রীলংকাকে নিজেদের দেশ করে নিয়েছিল অসংখ্য তামিল। তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিল র এবং সেই চিন্তা ক্রমশ বাড়ছিল। ২০০৬ সালের শেষ দিকে কলম্বো থেকে একটা কূটনৈতিক বার্তায় জাতিগত তামিলদের সংখ্যা তিরিশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়, অন্যদিকে র তাদের প্রধান পি. কে. এইচ. থারাকানকে বলেছিল যে অন্তত এক লাখ ষাট হাজার তামিল ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়েছে। অবিনাশ বলেন, শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশটিতে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল র, বিশেষ করে জাফনা, ভাভুনিয়া, কিলিনোচ্চি ও মান্নার জেলায়।

'আমাদের হিসাব ছিল নির্ভুল এবং দিগন্তে যখন যুদ্ধের মেঘ ঘন হয়ে উঠেছিল, আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব তামিলকে সরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু সেটা ছিল শুধুই একটা কুয়াশাচ্ছন্ন স্বপ্ন। টাইগারদের দিক থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখে তামিল জনগণ নিজেদের স্থানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এ ব্যাপারে আমরা কিছুই করতে পারিনি,' বলেন অবিনাশ।

শ্রীলংকান সেনাবাহিনীর আক্রমণ অভিযানকে সমর্থন দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতীয় সরকার, কারণ এলটিটিইর গুচ্ছের আত্মঘাতী বোমাহামলায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল গোটা আন্তর্জাতিক মহল। অবিনাশের মতে, ২০০৭ সালের শেষ দিক থেকে ২০০৯ সালের মে মাসের মধ্যে যখন এলটিটিইর বিরুদ্ধে শ্রীলংকা সম্পূর্ণ বিজয় ঘোষণা করেছিল, শ্রীলংকান সামরিক বাহিনীকে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সমস্ত এলটিটিই ঘাঁটির স্যাটেলাইট ছবি সরবরাহ করেছিল র। টাইগারদের সামরিক অবস্থান ও বেসামরিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কেও গোয়েন্দা তথ্য দিয়েছিল যাতে ক্ষয়ক্ষতি এড়ান যায়।

'র-এর টেকনিক্যাল সাপোর্ট না পেলে শ্রীলংকান সেনাবাহিনী এলটিটিইকে পরাস্ত করতে পারত না,' বলেন অবিনাশ। 'অনেক শ্রীলংকান সেনা ইউনিটের চেয়ে টাইগাররা ছিল উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ইন্দিরা গান্ধী সরকারের আমলে ভারতে এলটিটিইর শীর্ষ নেতাদের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও

ভারতীয় এজেন্টরা জাফনায় বিপুল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এলটিটিইর নৌ শাখার সাফল্য মাপা যেতে পারে এই তথ্য দিয়ে যে, জাফনায় এক-একটা ফুটবল স্টেডিয়ামের সমান তিনটি সুইমিং পুল নির্মাণ করা হয়েছিল আন্ডারওয়াটার ট্রেইনিংয়ের জন্য। এসব পুলের গভীরতা ছিল প্রায় একশো মিটার।'

১৯৮৬ সালে এমনকি সিআইএও স্বীকার করেছিল: 'ভারতের সহযোগিতা ছাড়াই এলটিটিই সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম এবং অন্যান্য গ্রুপগুলো যদি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে পৌছাতে রাজীও হয়, তবু এলটিটিই সম্ভবত লড়াই অব্যাহত রাখবে। প্রায় ৩০০০ সদস্যের একটা সুশৃঙ্খল যোদ্ধাবাহিনী গঠন করেছে এলটিটিই এবং এর কিছু ক্যাডারকে সম্ভবত নিকারাগুয়া ও কিউবায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।'

অবিনাশ মনে করেন, সিআইএর অ্যাসেসমেন্ট ভুল। তিনি বলেন, এলটিটিই ক্যাডারদের যুদ্ধ-পাকা করে তোলা হয়েছিল উত্তর প্রদেশের জঙ্গলে। তারা হয়তো বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু দক্ষতা অর্জন করেছিল তারা ভারত থেকে।

অবিনাশের মতে, ১৯৮০-এর দশকে র-এর মধ্যে দুটো গ্রুপ ছিল: একটা গ্রুপ সমর্থন করত এলটিটিইকে এবং তাদের পৃথক ইলম গঠনের দাবীকে; এবং অন্য গ্রুপটি শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেকোনও ধরনের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করত। 'এলটিটিইর সমর্থক গ্রুপটি ছিল বেশি শক্তিশালী এবং সেই কারণেই শ্রীলংকান সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের টানাপোড়েনের বিনিময়ে বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা,' অবিনাশ বলেন। 'কিন্তু গোপন জগতে চিরস্থায়ী কোনও শত্রু-মিত্র নেই। পৃথক ইলমের দাবীদার সব দলগুলোই ১৯৮৭ সালের মধ্যে আমাদের শত্রুতে পরিণত হল এবং ইন্ডিয়ান পিস কিপিং ফোর্স (আইপিকেএফ) পাঠিয়ে আমরা চরম অবমাননার মুখে পড়লাম। আমরা যুদ্ধের মধ্যে পড়েছিলাম এবং সেই সংগঠনের হাতেই আমাদের চরম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যাদের আমরা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম, দুই বছরের মধ্যেই তারা সেনা প্রত্যাহারে বাধ্য করেছিল আমাদের। কিন্তু ২০০৬ সালের খেলাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কংগ্রেস দলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় সরকার ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল: এলটিটিইকে শেষ করে দিতে হবে।'

আইপিকেএফ পাঠান হয়েছিল তৎকালীন র চিফ এ. কে. ভার্মার মেয়াদকালে। তার আশা ছিল, এলটিটিইকে দুর্বল করে দেবে আইপিকেএফ,

যাতে পরবর্তীকালে শ্রীলংকান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তামিল অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে দীর্ঘমেয়াদী শন্তির জন্য প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। আইপিকেএফ-এর প্রথম অভিযান শুরু হয় জাফনায়, ১৯৮৭ সালের অক্টোবরে, এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল এলটিটিই প্রধান প্রভাকরনকে বন্দী করা। কিন্তু গোয়েন্দা তথ্যের বিশাল ব্যর্থতায় অভিযান বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং পরিণতি হয় প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি।

বর্তমানে পেশায় নিয়োজিত র অফিসার পবন অরোরা মনে করেন, শ্রীলংকার সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর এবং সেখানে আইপিকেএফ পাঠান ছিল চরম রাজনৈতিক ভুল। শ্রীলংকায় আইপিকেএফ ধরনের অপারেশন চালানোর পক্ষে সময়টা পোক্ত ছিল না, কেননা মাত্র এক বছর আগে এলটিটিইকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল ভারত। 'ব্যাপারটা ছিল আপনার নিজের রিক্রুটদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত,' অরোরা বলেন। 'তাছাড়া, এলটিটিইর মত গ্রুপগুলো ছিল শ্রীলংকার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের পক্ষে প্রেসার গ্রুপ।'

আইপিকেএফ অভিযান শুরুর এক মাস পর ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে সিআইএর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়:

> *স্বল্প মেয়াদের দিক থেকে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এখনও আশা করছেন, তিনি প্রধান তামিল বিদ্রোহী গ্রুপ এলটিটিইকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিতে পারবেন, শান্তিচুক্তি মেনে চলতে তাদের বাধ্য করতে পারবেন। একই সঙ্গে, আমরা মনে করি, তিনি তাদের এতটা দুর্বল করে দিতে চান না যাতে ভবিষ্যতে কলম্বো সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের ঠেকনো হিসেবে তাদের ব্যবহার করতে পারবেন না। সুতরাং প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, টাইগারদের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপের সম্ভাবনা খোলাই রাখবে নতুন দিল্লি। দীর্ঘ মেয়াদের দিক থেকে, আমরা মনে করি চুক্তি বাস্তবায়নের পর ভারতীয় সেনাদের সঙ্কটপূর্ণ শান্তি রক্ষা মিশন থেকে সরিয়ে আনার দূরদর্শিতা দেখাতে পারেন গান্ধী। তামিল ও সিংহলীদের মধ্যে আরও ব্যাপক সহিংসতা দেখা দেবে এবং ভারত হয়তা উপসংহারে পৌঁছাবে যে দ্বীপরাষ্ট্রটির জাতিগত সমস্যা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা খুবই কম। গান্ধী তখন মুখ রক্ষা করে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের উপায় খুঁজবেন, সম্ভবত যুক্তি দাঁড় করাবেন যে ভারতকে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি মোকাবেলায় বেশি নজর দিতে হচ্ছে, যেমন ভারত-পাকিস্তান বা ভারত-চীন সীমান্তে নতুন করে উত্তেজনা।*

শ্রীলংকার মাটি থেকে আইপিকেএফ-এর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ছিল বাস্তবিকই একটা মুখ-রক্ষার ব্যাপার। কিন্তু এ দায় পড়েছিল গান্ধীর উত্তরসূরী ভি. পি. সিংয়ের ওপর, যিনি দুর্নীতিমুক্ত সরকারের অঙ্গীকার করে ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন।

কিন্তু ২০০৬ সালের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। ১৯৮৭ সালের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছিল র, এবং হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স (হিউমিন্ট) ও টেকনিক্যাল ইন্টেলিজেন্স (টেকিন্ট) দুইই ব্যবহার করেছিল তাদের অ্যাসেটরা শক্তিমান টাইগারদের পরাস্ত করতে। অরোরার মতে, র যদি সহযোগিতা না করত তাহলে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে থাকত শ্রীলংকান সেনাবাহিনী। যাই হোক, হিউমিন্ট জোগান অব্যাহত রাখতে চারজন অ্যাসেটকে রিক্রুট করেছিল র, তাদের সবাইকেই হারাতে হয়েছিল।

'শুধু যে এলটিটিই আমাদের অ্যাসেটদের হত্যা করেছিল তাই নয়,' অরোরা বলেন। 'আমরা পরে জানতে পারি, শ্রীলংকান সেনাবাহিনীও আমাদের ইনফর্মারদের হত্যায় লিপ্ত ছিল। ২০০৯ সালের এপ্রিলে চূড়ান্ত ও ব্যাপক আক্রমণাভিযানের ঠিক আগে কয়েকজন অতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসেটকে জাফনা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়, জাহাজযোগে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হয় মালদ্বীপে। এক মাস পর র টিম ক্যাম্বোডিয়ায় কয়েকটা সেফ হাউজ ভাড়া নেয়, নিরাপত্তা দিয়ে সেখানে তাদের রাখা হয়। পরবর্তী মাসগুলোয় সবগুলো অ্যাসেটকে কৌশলগতভাবে পুনর্বাসিত করা হয় ইউরোপীয় দেশগুলোয়।'

শ্রীলংকান ইনফর্মারদের দেশের বাইরে নিয়ে আসার প্রয়োজনটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বলেন অবিনাশ। প্রকাশ করেন যে, শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলীয় কিলিনোচ্চির একটা বাড়িতে র-এর কয়েকজন ইনফর্মার আশ্রয় নিয়ে ছিল, সেই মাসে তাদের মধ্যে মাত্র একটা প্রাণীই বেঁচে গিয়েছিল—একটা সাদা রঙের বিড়াল।

### আনুগত্যের মূল্য

শ্রীলংকার *দ্য সানডে লিডার* সংবাদপত্রের নির্ভীক সম্পাদক লাসান্থা বিক্রেমাতুঙ্গে গুলিতে নিহত হন ২০০৯ সালের ৮ই জানুয়ারি সকাল প্রায় সোয়া ১০টার দিকে। এই খুনের ঘটনা ঘটে দক্ষিণ কলম্বোর রাতমালানা এলাকার আত্তিদিয়া রোডে। দুজন বন্দুকধারী হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় প্রকাশ্য দিবালোকে। এই ঘটনা সন্ত্রস্ত করে তোলে র-কে। লাসান্থা ছিলেন একজন গুণী সাংবাদিক, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র-এর একজন অনুগত বন্ধু। র

অফিসার জাভেদ ফরিদীর সঙ্গে লাসান্থার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ারও অনেক আগে। তার হত্যাকাণ্ডে হতভম্ব হয়ে পড়েন ফরিদী। তিনি বলেন, লাসান্থাকে কয়েক মাস ধরে সরকারের মদদপুষ্ট গ্রুপগুলো হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকও করেছিলেন, কে তার ক্ষতি করতে চায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সেসব বৈঠকে। 'লাসান্থা সন্দেহ করেছিলেন মাহিন্দা রাজাপাক্সা ও তার ছোট ভাই গোটাবায়া রাজাপাক্সাকে, কারণ তার কাগজ সরকারের সমালোচনা করত এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশাল দুর্নীতির খবরও প্রকাশ করত,' বলেন ফারিদী।

২০০৫ সালে মাহিন্দা রাজাপাক্সা নির্বাচনে জয়লাভের পর গোটাবায়া রাজাপাক্সাকে শ্রীলংকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণায়ের সচিব নিযুক্ত করা হয়। লাসান্থা নিহত হওয়ার এক মাস আগে ফরিদীকে বলেছিলেন, তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা দুর্নীতির খবর উদঘাটন করতে যাচ্ছেন যার সঙ্গে গোটাবায়া জড়িত। র তাকে সাবধান করে দিয়েছিল যে শ্রীলংকা সরকার পাল্টা আঘাত হানতে পারে। লাসান্থা ফরিদীকে বলেছিলেন যে তিনিও তাই অনুভব করেন। 'তার অনুমান সঠিক ছিল। তিনি খুন হওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগে আমি তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিলাম। খুন হওয়ার এক দিন আগে তিনি আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, ঘরের মধ্যে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে এবং সরকারের হুমকির ভয় নিয়ে বাঁচতে পারনে না।'

লাসান্থা যেদিন তার অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, ফরিদীকে সেদিন ফোন করেছিলেন। ফরিদী তাকে অন্তত দুদিন অফিসে না যেতে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 'কিন্তু তিনি হেসেছিলেন,' বলেন ফরিদী। 'আমি তার সঙ্গে সেল ফোনে কথা বলছিলাম, তিনি বলেছিলেন মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যক্তি সম্ভবত তার গাড়িটাকে অনুসরণ করছে এবং আরেকটা গাড়িতে অন্য দুই ব্যক্তি তাদের ব্যাকিং দিচ্ছে। আমি তাকে ওই এলাকার যেকোনও পুলিশ ফাঁড়িতে চলে যেতে বলেছিলাম। তিনি পুলিশ ফাঁড়ি পাননি এবং বারবার বলতে থাকেন আজ হয়তো তাকে হত্যা করা হবে। তিনি অনেকবার চিৎকার করে বলেছিলেন: 'আমি পুলিশ ফাঁড়ি দেখতে পাচ্ছি না, এখন কী করব?' আমি ওই এলাকার বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছিলাম যাতে তাকে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে গাইড করতে পারি। কিন্তু তখন শেষবারের মত শুনতে পাই তার কণ্ঠস্বর। তিনি বলেছিলেন, 'ওরা এসে গেছে।' আমি জমে গিয়েছিলাম। আমি ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝেছিলাম যে আমি লাসান্থাকে হারিয়েছি,' ফারিদী আমাকে বলেন।

লাসান্থা নিহত হওয়ার এক দিন পর বিরোধী দলীয় নেতা রানিল বিক্রেমেসিংহে অভিযোগ করেন, লাসান্থাকে হত্যার জন্য শ্রীলংকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস দায়ী। তারা এটা রিপোর্ট করে গোটাবায়াকে। যদিও এটা ছিল একজন রাজনৈতিক নেতার একটা নিছক অভিযোগ, শ্রীলংকায় তৎপর আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো নিশ্চিত ছিল যে সাংবাদিক-সম্পাদককে হত্যার নির্দেশ এসেছিল গোটাবায়ার কাছ থেকে। সারা দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিল লাসান্থা হত্যাকাণ্ড। শ্রীলংকায় কয়েক দশকের গৃহযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল বিশ্ব সম্প্রদায়কে।

সূচনা

শ্রীলংকার (সাবেক সিলন) স্থানীয় অধিবাসীদের বিপুল অংশ সুদূর অতীতে বিভিন্ন সময়ে দেশান্তরিত হয়ে এসেছিল ভারত থেকে। যাই হোক, আধুনিক কালে ভারত থেকে শ্রীলংকায় ধারাবাহিক শ্রমিক অভিবাসন শুরু হয় ১৮৩০-এর দশকে। দক্ষিণ ভারত থেকে স্রোতের মত বিপুল পরিমাণ শ্রমিকের আগমণ ঘটে ১৮৩০ থেকে ১৮৮০-এর দশকের মধ্যে। তা সত্ত্বেও এই জনগোষ্ঠীকে কখনই দ্বীপটির স্থায়ী অধিবাসী হিসেবে অঙ্গীভূত করা হয়নি। ১৮৯০-এর দশকে কফি শিল্পের পতন ঘটে, ফলে ভারত থেকে শ্রমিকদের আগমণও বহুলাংশে হ্রাস পায়, এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে ভারতীয় শ্রমিক জনসংখ্যা একেবারেই হ্রাস পায় অদক্ষ শ্রমিকদের দেশান্তর গমণে ১৯৩৯ সালে ভারত সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে। ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগই এসেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। তাদের অধিকাংশই কাজ করত চা ও রবার এস্টেটে। অভিবাসীদের ভারতের বাড়ির নৈকট্য এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগহীনতার ফলে স্থানীয় সিলনিজ জনসংখ্যার একটা পৃথক অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় অভিবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়, কিন্তু একই সঙ্গে অসম্পৃক্ত সংখ্যালঘু হিসেবেও ধরা হয়। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হওয়ার অনেক আগে ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে সিলন যখন ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব ও নির্বাচিত সরকার অর্জন করতে থাকে, তখন এটা রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দেয়। স্বাধীনতার পর সিলনিজ সরকার ভারতীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়মাধীন ও নিয়ন্ত্রণ করতে কয়েকটি প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

সিলনে ভারতীয়দের মর্যাদার প্রশ্নটি পরিণত হয়েছিল ভারত ও মিলনের স্বাধীনত সরকারগুলোর মধ্যে আলোচনার বিষয়। ১৯৪৭–৪৮ সালে উভয়

পক্ষের মধ্যে আলোচনায় কোনও ফল আসেনি। কয়েক বছরের আলোচনার পর ১৯৬৪ সালে দুই দেশ একটা চুক্তিতে পৌঁছায় সিলনে ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ভারতীয় বংশোদ্ভুত নয় লাখ পচাত্তুর হাজারেও বেশি শ্রমিকের মধ্যে তিন লাখ শ্রমিককে গ্রহণ করতে সম্মত হয় দ্বীপ রাষ্ট্রটি, অন্যদিকে পাঁচ লাখ পঁচিশ হাজার অভিবাসীকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হয় ভারত। তাদের পুনর্বাসনের জন্য পনের বছরের সময় নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে দুই দেশ সম্মত হয় অবশিষ্ট এক লাখ পঞ্চাশ হাজার লোককে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ১৯৭৮ সালে, যখন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জে. আর. জয়াবর্দনে। তিনি দেশটির সাংবিধানিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃশ্যপটে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটান। ওয়েস্টমিন্স্টার ধরনের সংবিধানের দ্বারা দেশ চলছিল স্বাধীনতার পর থেকে, তিনি সেটা বাতিল করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির সরকার চালু করেন, রাষ্ট্রপ্রধানকে দেয়া হয় প্রভুত ক্ষমতা। তামিল সমস্যার সমাধান কৌশলে পরিহার করে চলা অব্যাহত থাকে, কিন্তু সরকার তামিল অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেখানকার পার্লামেন্ট সদস্যদের সহানুভূতি লাভ করে। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী এস. থোন্ডামানকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে সরকার ভারতীয় তামিলদের পৃথক করে ফেলে সিলনিজ তামিলদের থেকে। যাই হোক, দেশটির উত্তরাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উৎকণ্ঠা চলতেই থাকে। ডাকাতি, ব্যাংক লুট, খুন ইত্যাদি অপরাধকাণ্ডের তদন্তে পুলিশকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে স্থানীয় বাসিন্দারা। এসব অপরাধে জড়িত থাকত তরুণ সন্ত্রাসীরা যারা নিজেদের অভিহিত করত টাইগার লিবারেশন মুভমেন্ট বলে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীলংকা সাহায্য নিচ্ছিল সারা বিশ্ব থেকে। কলম্বোর ১৯৮১ সালের একটা গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশটি ১৭২২২ মিলিয়ন রুপী নিয়েছিল যার মধ্যে ঋণ ছিল ১৪২৪৬ মিলিয়ন রুপী আর ২৯৭৫ মিলিয়ন রুপী ছিল অনুদান। একটা হাসপাতালের জন্য জাপান দিয়েছিল ৭৫৬ মিলিয়ন রুপী। যুক্তরাষ্ট্র তার বিশেষ সাহায্য পাওয়া মুষ্টিমেয় দেশগুলোর তালিকায় রেখেছিল শ্রীলংকাকে। তারা প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের আকারে ত্রাণ প্যাকেজ দিয়ে থাকত। কলম্বোয় একটা নতুন অফিসও খুলেছিল যুক্তরাষ্ট্র 'বুরো অফ প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজেস' নামে। সেটা আসলে গুপ্তচরবৃত্তির ফ্রন্ট বলে সন্দেহ ছিল র-এর। উপরে উপরে আমেরিকান

বুরোটির কাজ ছিল প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্টের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং শ্রীলংকায় নতুন প্রকল্প চিহ্নিত করতে ও অর্থায়ন করতে আমেরিকান প্রাইভেট খাতকে সাহায্য করা। কৃষি-বাণিজ্য প্রকল্প ও আর্থিক মধ্যস্থতাকে শ্রীলংকায় আমেরিকানদের জন্য ইনভেস্টমেন্টের সেরা সুযোগ বলে শনাক্ত করা হয়েছিল।

কিন্তু নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শ্রীলংকার মুঠি আলগা হয়ে যাচ্ছিল।

### টাইগার লিবারেশন মুভমেন্ট

সন্ত্রাসবাদ ক্রমশ বাড়ছিল। উত্তর শ্রীলংকায় পাঁচজন সিরিয়র পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। এতে সতর্ক হয়ে ওঠে সরকার। দুটো বিশেষ আইন পাস করে তারা। প্রথম আইনে নিষিদ্ধ করা হয় টাইগার লিবারেশন মুভমেন্টকে। নির্দিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তির বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে জামিন না দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয় আদালতকে দ্বিতীয় আইনে। বিল উপস্থাপনের পর অনুষ্ঠিত বিতর্কে আরও একবার তামিল ও সিংহলীদের মধ্যকার বিদ্বেষ ফুটে উঠেছিল।

তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (টিইউএলএফ) ছিল তামিলদের প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর। শ্রীলংকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় তামিলভাষী প্রদেশে একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করার পর সংগঠনটি মনোযোগ কাড়ে। যাই হোক, নির্বাচনের পর টিইউএলএফ-এর ঐক্যে চিড় ধরে, যখন প্রধান ইসুগুলোয় পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের নেতাদের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

জয়াবর্দেনের সরকার ভাষা, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের অঙ্গীকার করেছিল বারবার। এই পটভূমিতে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের পট্টুভিল থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য এম. কানাগারত্নমকে স্থানান্তর করা হয় ট্রেজারি বেঞ্চে। পরবর্তী সময়ে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়, অনুমান করা হয় এটা ছিল তামিল সন্ত্রাসবাদীদের কাজ। ১৯৭৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীলংকার নতুন সংবিধান ঘোষণার এক ঘণ্টা আগে, টাইগার লিবারেশন মুভমেন্টের তরুণরা কলম্বোর কাছে রাতমালানা বিমানবন্দরে এয়ার সিলনের একটি অভ্র বিমান বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। একটা স্বাধীন তামিল ইলমের কথা না থাকার প্রতিবাদে তারা এটা করে। অভিযোগ করা হয় যে দুজন তামিল তরুণ এটা করেছিল, তারা জাফনা থেকে ওই বিমানেই উঠেছিল।

পুলিশকে সাহায্য করছে বলে কাউকে সন্দেহ হলেই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করত তরুণ সন্ত্রাসীরা। আনুষ্ঠানিকভাবে টিইউএলএফ এইসব সহিংসতার দায় নিত না এবং ঘোষণা করেছিল যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে একটা স্বাধীন তামিল ইলম অর্জনের ধীর গতিতে ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ছিল টিইউএলএফ-এর তরুণরা। যদিও জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব যুক্তি তুলে ধরেছিল যে সহিংসতা দিয়ে কিছুই অর্জন করা যাবে না, তরুণ তামিলরা ছিল ধৈর্যহীন। ভারত পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিল সতর্ক দৃষ্টিতে। ১৯৭৮ সালে ভারতীয় হাই কমিশনে কাজ করছিলেন উনচল্লিশজন ভারতীয় ও বাহাত্তরজন স্থানীয়, হাই কমিশনার ছিলেন টমাস আব্রাহাম। ১৯৮১ সালের ১৭ই অগাস্ট দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়, এস্টেট এলাকায় তামিলদের ওপর সহিংস হামলার পর এই ব্যবস্থা নেয় হয়। জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হয় ১৯৮২ সালের ১৬ই জানুয়ারি। কতিপয় তামিলপন্থী নেতা মনে করেছিলেন, লন্ডনে আতশবাজি পুড়িয়ে একটা টেকসই তামিল ইলম অর্জন করা যাবে না। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারিতে টিইউএলএফ গ্রুপের ভিন্নমতাবলম্বীরা নিজেদের নামকরণ করে তামিল ইলম লিবারেশন ফ্রন্ট। এই গ্রুপের নেতারা বলেন, টিইউএলএফ নেতৃত্ব এক সময় ইলম কামনা করেছিলেন, কিন্তু এখন তারা পার্লামেন্টে সিংহলীদের গোলাম। দুই গ্রুপের তিক্ততা এতই তীব্র ছিল যে আধিপত্য দেখাতে তারা পরস্পরের ওপর হামলা করতে শুরু করেছিল। সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শত্রুতার মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্ডি ১৯৮২ সালের ২ থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারি শ্রীলংকা সফর করেন। অনুরাধাপুরায় শ্রীলংকার স্বাধীনতার ৩৪তম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সম্মানিত অতিথি। সেখানে তিনি মন্তব্য করেন, ভারতীয় বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে তাদের আশ্রিত দেশের সমৃদ্ধিতে এবং তিনি আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করছেন যে যারা শ্রীলংকাকে স্বদেশ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা এই দেশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। রেড্ডি বলেন:

> *ইতিহাস, অভিন্ন সংস্কৃতি, অভিন্ন সভ্যতার উত্তরাধিকারের ভিতর দিয়ে আমাদের দুই দেশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে আগামী বছরগুলোতে এই বন্ধন আরও মজবুত হবে যা সময়ের পরিবর্তন ও বিদেশী শাসন সহ্য করে এসেছে।*

রেড্ডির সফরের ঠিক এক সপ্তাহ পর, ১৩ই ফেব্রুয়ারি, দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে সেনাবাহিনীর একজন গাড়িচালককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযোগ করা হয় টাইগারদের। এতে হুমকির মুখে পড়ে ওই অঞ্চলের ভঙ্গুর শান্তি। শ্রীলংকা সরকার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে বলে, সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য ছিল জাফনায় অবস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীকে উস্কে দেয়া যাতে তারা প্রতিশোধমূলক আক্রমণ করে এবং যাতে সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে ফের বিরোধ সৃষ্টি হয়। যদিও শ্রীলংকান সেনাবাহিনী বেসামরিক জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত না করার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক, অনুসন্ধানকালে তামিল অধিবাসীদের সঙ্গে রূঢ় আচরণের অভিযোগ করেছেন রাজনৈতিক নেতারা।

শ্রীলংকা আশঙ্কা করেছিল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে টাইগারদের। ১৯৮২ সালের ১লা জুন শ্রীলংকার একজন শীর্ষ ইন্টেলিজেন্স অফিসার আর. রাজাসিংহম বলেন, প্রায় তিরিশজন টাইগার এখনও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভারতে। তিনি প্রেসিডেন্ট জয়াবর্দেনেকে বলেন, ১৯শে মে পাঁচজন টাইগারকে আটক করা হয়েছে মাদ্রাজে, এখন যা পরিচিত চেন্নাই নামে। শ্রীলংকার সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র *দ্য ডেইলি মিরর* খবরে জানায়, প্রান্তিক তামিল গ্রুপ যেমন নাভা সামা সামাজা পার্টি উমা মহেশ্বরন ও প্রভাকরনের মত টাইগারদের জন্য ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার অনুরোধ করেছে।

টাইগার লিবারেশন মুভমেন্টের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় জুলাই মাসে যখন তামিল রাষ্ট্রের পক্ষাবলম্বী নেতারা বিদেশে একটা সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। নিউ ইয়র্কে বিশ্ব তামিল ইলম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ৩ ও ৪ঠা জুলাই। বিদেশের মাটিতে একটা অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার ইরাদা হওয়ায় সেটাকে টিইউএলএফ-এর কূটনৈতিক বিজয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় ব্যাপকভাবে।

নিউ ইয়র্কে যখন ইরাদা হচ্ছিল, টাইগাররা সেই সময় গুলি করে চারজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে জাফনার নেল্লিয়াডিতে। এতে প্রচণ্ড ত্রাস সৃষ্টি হয় শ্রীলংকার উত্তরাঞ্চলে। *দ্য আইল্যান্ড* নামক সংবাদপত্র লেখে: 'সন্ত্রাসবাদীরা যে মুহূর্তে হামলা চালিয়েছে সেই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। আনুষ্ঠানিক তল্লাশী ও জিজ্ঞাসাবাদের সঙ্গে হয়রানি ও শারীরিক নির্যাতন যোগ হয়েছে এবং প্রলম্বিত গোঙানি শোনা যাচ্ছে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীর কর্মকাণ্ডের শাস্তি দেয়া হচ্ছে বেসামরিক মানুষজনকে।'

নেল্লিয়াডি হামলার ফলাফল স্বরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে জাফনা জেলার টহলে যৌথভাবে অংশ নেবে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী। ২৫শে জুলাই শ্রীলংকান নিরাপত্তা বাহিনীর জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়, উত্তরাঞ্চল থেকে সন্ত্রাসবাদ ঝেঁটিয়ে দূর করতে সর্বাত্মক অভিযান চালান হবে এবং জাফনার সন্ত্রাসীদের নির্মূল করাই হবে প্রথম অগ্রাধিকার।

১৯৮২ সালের ১১ই অগাস্ট একটি রিপোর্টে বলা হয়: 'রেলওয়ে ওয়াগন ও বগিতে বোমার পার্সেল পাওয়া গেছে–এসব পার্সেল বোমার কয়েকটি পাঠান হয়েছে সরকারের মন্ত্রীদের ঠিকানায়, যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, ডাক ও তার মন্ত্রী, তাছাড়া শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের ঠিকানাও রয়েছে।'

২৭শে অগাস্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভিতর দিয়ে জনগণের কাছ থেকে একটা ম্যানডেট নিতে চেয়েছিলেন জয়াবর্দেনে। প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে উঠেছিলেন তামিল নেতারা। ৩০শে অগাস্ট ত্রিঙ্কোমালীতে টিইউএলএফ সভাপতি এম. সিভাসিথাম্পারাম বলেন: 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে তামিলদের কোনও আগ্রহ নেই, কারণ এটা হবে এক ব্যক্তিকে নির্বাচনের ভোট যিনি সিংহালা দেশে সিংহালা জনগণকে শাসন করবেন। একজন সিংহালা শাসককে নির্বাচিত করার কোনও আগ্রহ তামিলদের নেই।' সরকারের সঙ্গে টিইউএলএফ-এর সংলাপের পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তামিলদের হয়রানি করা হচ্ছে, দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে নালিশ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিরিশ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। একই রকম আত্মত্যাগ এখানে ঘটতে পারবে না, কারণ তাহলে আর ইলম গঠনের জন্য একজনও তামিল অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর টিইউএলএফ-এর উদ্দেশ্য হল, ইলমের জন্য লড়াই করার পাশাপাশি তামিলদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,' তিনি বলেন। টিইউএলএফ-এর মহাসচিব এ. আমির্থালিঙ্গাম বলেন, তিনি তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. জি. রামাচান্দ্রানের সঙ্গে কথা বলেছেন যাতে শ্রীলংকান তামিল যুবাদের ভাল সুরক্ষা দেয়া হয়, সম্প্রতি তাদের সেখানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জানান, আলোচনা সফল হয়েছে। 'টাইগাররা নিরাপদে আছে,' তামিল জনগণকে বলেন আমির্থালিঙ্গাম।

টিইউএলএফ-এর একজন মুখপাত্র বলেন, তামিল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্তির ফলে এর শক্তি নিঃশেষ হচ্ছে। তারা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে মুসলিম সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক করার চেষ্টা করছেন, অংশীভূত এলাকাগুলো হচ্ছে

আম্পারা, বাট্টিকালোয়া ও ত্রিঙ্কোমালী। টিইউএলএফ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কিনা সে প্রশ্নে বিভিন্ন ধরনের মত ছিল। ভারতের মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স (এমইএ) ১৯৮২ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখের একটি নোটে জানায়:

*টিইউএলএফ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি, কেননা এর বয়কটের ডাক অনেক দূর পর্যন্ত উপেক্ষা করা হচ্ছে। টিইউএলএফ-এর বর্তমান উদারপন্থী নেতৃত্ব যদি তাদের ক্ষমতা হারায়, তাহলে জাফনার তামিলরা সংবিধান বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে ফের লিপ্ত হতে পারে।*

যাই হোক না কেন, একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য শ্রীলংকায় ভোট অনুষ্ঠিত হয় ২০শে অক্টোবর। প্রদত্ত ভোটের ৫২.৯১ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এতে জয়লাভ করেন জয়াবর্দেনে। ভারতীয় বিশ্লেষকরা মনে করেছিলেন, জয়াবর্দেনের জয়ের পিছনে তামিল ফ্যাক্টরও কাজ করেছিল। ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত ছিল প্রায় দুই লাখ আশি হাজার তামিল। বাগান-শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ সংগঠন সিলন ওয়ার্কার্স কংগ্রেস সমর্থন দিয়েছিল জয়াবর্দেনেকে। জনসংখ্যার এগার শতাংশ শ্রীলংকান তামিলদের প্রতিনিধি টিইউএলএফ ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়ায় সেটাও কাজে লেগেছিল জয়াবর্দেনের। তবে টিইউএলএফ-এর সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও জাফনায় ভোট পড়েছিল ৪৬ শতাংশ।

ভারত সরকারের গুপ্তচররা বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল নিবিড়ভাবে, যে পরিস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারত। এমইএর অ্যানালাইসিস ইউনিটের একটা নোটে বলা হয়:

*ভারতের আগ্রহের মধ্যে থাকা বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চল ইতোমধ্যেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। যেমন আফগানিস্তান, ইরাক, লেবানন ইত্যাদি। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে উত্তেজনার এলাকা। রোনাল্ড রিগ্যান প্রশাসনের সংঘাতবাদী নীতির বাস্তব রূপ হচ্ছে বিপুল পরিমাণ মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ, তারা এর মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান সোভিয়েত প্রভাব প্রতিহত করতে চায়। ভারতের প্রধান উদ্বেগের বিষয় হল, বড় শক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব এসে পড়েছে আমাদের দোরগোড়ায়, যা*

*দেশকে গ্রাস করে ফেলতে পারে গরম যুদ্ধের প্রজ্বিতে কিংবা ঢেকে দিতে পারে ঠাণ্ডা যুদ্ধের হিম আলিঙ্গনে। আমাদের অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে সামরিক সংঘাত। এই রকম পরিবেশে, যখন আমাদের দরকার উদারপন্থা অনুশীলন করা এবং সম্ভাব্য উন্নয়নের সকল দিকে আমাদের অপশনগুলো উন্মুক্ত রাখা, তখন আমাদের অবশ্যই নির্ভর করতে হবে নিজেদের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ওপর। অন্যদিকে নিশ্চিত করতে হবে, একবারে একটি ফ্রন্টের চেয়ে বেশি দিকে যেন আমাদের নিরাপত্তার দাবী না ওঠে।*

১৯৮২ সালের একটি নোটে এমইএ জানায়, তামিলদের খোলাখুলি সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে তেমন সতর্ক ছিল না ভারত সরকার।

*একটা গৌণ এবং কখনও কখনও তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বিষয় হয়ে রয়েছে শ্রীলংকান তামিলদের তামিল ইলমের দাবী–শ্রীলংকায় একটি পৃথক তামিল রাষ্ট্র। টিইউএলএফ-এর উদারপন্থী নেতৃত্ব জয়াবর্দেনের বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বশাসন বিষয়ক সংস্কার মেনে নিতে সম্মত হলেও কট্টরপন্থী তামিলদের অভিমত হচ্ছে একটা পৃথক রাষ্ট্রের জন্য তাদের লড়াই করতে হবে। এই প্রশ্নে ভারত সরকারের অবস্থান দ্ব্যর্থহীন। আমরা এটিকে শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছি যা শ্রীলংকাকেই সমাধান করতে হবে।*

এমইএ মনে করত শ্রীলংকার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভারসাম্যপূর্ণ হবে এবং এই মুহূর্তে বড় কোনও সমস্যা নেই। একমাত্র সমস্যা ছিল রাষ্ট্রহীন ভারতীয়দের প্রশ্নটি। ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় থাকা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ তখনও রাষ্ট্রহীন অবস্থায় ছিল।

১৯৮৩ সালে প্রভাকরনের এলটিটিইকে প্রশিক্ষণ ও অর্থসাহায্য দিয়েছিল র। একটা পৃথক তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই গ্রুপ লড়াই করছিল শ্রীলংকা সরকারের সঙ্গে। প্রভাকরনের বয়স তখন ছিল ৩১, তিনি ছিলেন কর্তৃত্বপরায়ন। তিন হাজার ক্যাডারের একটা বিদ্রোহী বাহিনীকে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। গ্রুপটি মনে করত তারা শ্রীলংকায় তামিলদের স্বার্থরক্ষক। সিআইএ ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভরা মনে করত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সাহায্য ছিল বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় অর্থের জোগান দিতে

চোরাচালান বজায় রাখার জন্য তামিল নাডুতে তাদের নিরাপদ আশ্রয়দান। আমেরিকান সংস্থাটি আরও মন্তব্য করেছিল, শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহী গ্রুপটির সঙ্গে ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের মন্ত্রীদের সুসম্পর্ক ছিল। টাইগারদের বিরুদ্ধে শ্রীলংকা সরকারকে সহযোগিতা বাড়ানোয় উদ্বিগ্ন ছিল আমেরিকানরা। তারা মনে করত, তামিল ও শ্রীলংকার মধ্যে ভারত শান্তির দূতিয়ালী করছে জোরাল ভাবে। তারা এও মনে করত, তামিল বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও আশ্রয় প্রদানের যে নীতি নিয়েছিল নতুন দিল্লি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে, তা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। সিআইএর একটি রিপোর্টে বলা হয়:

> *প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন, শ্রীলংকার জাতিগত সহিংসতা ভারতের জন্য এবং তার নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্যও গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আমরা মনে করি, নতুন দিল্লি শ্রীলংকায় স্থিতিশীলতা চায়, আবার একই সঙ্গে শ্রীলংকান তামিলদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ভারতীয় তামিল নাড়ু রাজ্যের তামিলদের চাপের মধ্যেও রয়েছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী গান্ধী তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের একত্রে বসিয়েছেন, তা সত্ত্বেও নতুন দিল্লি শ্রীলংকান তামিল বিদ্রোহীদের আশ্রয় দিয়েছে তামিল নাডুতে এবং নতুন দিল্লির কাছে, মাদ্রাজে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য প্রশিক্ষণ শিবির খোলার অনুমতি দিয়েছে। তামিল নাডুতে অবস্থানরত শ্রীলংকান তামিলদের বিরুদ্ধে গান্ধী কোনও পদক্ষেপ নিতে পারবেন না, কারণ তাহলে নির্বাচনে তার ভারতীয় তামিলদের ভোট হারানোর ঝুঁকি থাকবে। তাছাড়া, নতুন দিল্লি তামিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতাকে দেখে ভারতের কূটনৈতিক ও সামরিক অপশনের গুরুত্বপূর্ণ উপরি পাওনা হিসেবে। পরাশক্তিগুলোর আগে শ্রীলংকায় হস্তক্ষেপ করতে চান গান্ধী। শ্রীলংকা নিরাপত্তার জন্য হালকাভাবে সহযোগিতা চেয়েছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সহ কয়েকটি দেশের কাছে, গত গ্রীষ্মে এ কথা শোনার পর ভারতীয় কর্মকর্তারা আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। শ্রীলংকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জয়াবর্দেনে সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়েছিলেন, অস্ত্র, অ্যান্টি-গেরিলা টেকনিক ও মার্কিন নৌবাহিনীর শক্তি প্রদর্শন সহ। ওয়াশিংটন এসব প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং জয়াবর্দেনে সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের অনুরোধের কথা অস্বীকার করেছিলেন। শ্রীলংকার সমাজকে বিভক্ত করা সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। উভয় সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অধিক উগ্র নেতারা আপস করতে কম আগ্রহী এবং সহিংসতায় অধিক উৎসাহী।*

ফরিদী বলেন, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ঠিক ছিল। শ্রীলংকার ঘটনায় আমরা বড় ধরনের বাজি ধরেছিলাম। ইন্দিরা এবং তারপর রাজীব গান্ধী আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের এই বিশাল বিনিয়োগ ছেড়ে দেয়ার কথা কল্পনা করতে পারতেন না। ফরিদী স্পষ্ট করে দেন, রাজীব গান্ধী শ্রীলংকায় একটা পৃথক তামিল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুব বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। তৎকালীন র চিফ গিরিশ চন্দ্র সাক্সেনার সঙ্গে আলোচনায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আলোচনাকারীর ভূমিকা থাকা উচিৎ ভারতের এবং নিজের ভারসাম্য বজায় রাখা উচিৎ শ্রীলংকান সরকার ও তামিল গ্রুপগুলোর ওপর।

শ্রীলংকার সঙ্গে পাকিস্তান ও চীনের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের ব্যাপারেও নাখোশ ছিল র। অস্ত্রশস্ত্রের জন্য শ্রীলংকা তাদের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন জোরদার করছিল। যে দেশ দুটিকে নিয়ে ভারত সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে ছিল তাদের সঙ্গে চুপিসারে বন্ধন রচনা করছিল জয়াবর্দেনে সরকার। গুপ্তচররা মনে করতেন, সহিংসতা সমাপ্তির লক্ষ্যে শ্রীলংকার সঙ্গে ১৯৮৭ সালে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির উদ্দেশ্য ছিল দ্বীপরাষ্ট্রটিতে ইসলামাবাদ ও বেইজিংয়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করা। ১৯৮৭ সালে শান্তির দূতিয়ালী করার পাশাপাশি ভারত এলটিটিই সহ অন্যান্য বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে মস্কো, পূর্ব জার্মানি, সিঙ্গাপুর, ক্যাম্বোডিয়া ও কিউবায় তামিল শান্তি সমিতি স্থাপনেও সাহায্য করেছিল। এতে সহযোগিতা করেছিল সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কেজিবি। বিদ্রোহী ও উদার তামিল গ্রুপগুলোর দাবী করা পৃথক তামিল রাষ্ট্রের সমর্থনে তহবিল জোগান ও প্রচারণা চালান ছিল এসব সংগঠনের প্রধান কাজ।

সিঙ্গাপুর গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের একটা কেন্দ্র হয়ে ওঠায় বিপুল সংখ্যক ভারতীয় অভিবাসী আকৃষ্ট হয়েছিল, অধিকাংশই ছিল বণিক সম্প্রদায়ের। পার্সি, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী ও বাঙালীরা বেশির ভাগ পাইকারি ও আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে জড়িত ছিল। বিপুল সংখ্যক দক্ষিণ ভারতীয় জড়িত ছিল খুচরো ব্যবসায়ে। মালয়ের মুষ্টিমেয় কয়েকটি উন্নত নগর কেন্দ্রের মধ্যে একটি হিসেবে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার সাত থেকে নয় শতাংশ। র-এর সাহায্য নিয়ে এলটিটিই ওই অঞ্চলে কয়েকজন অ্যাসেটকে নিযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কিন দূতাবাসের ১৯৮৭ সালের একটি তারবার্তা পরবর্তীকালে ফাঁস করে দিয়েছিল উইকিলিক্স। তাতে বলা হয়েছিল, সেই সময়ে এলটিটিই ছিল অবিসম্বাদিতভাবে আধিপত্যকারী তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, যারা প্রতিপক্ষ উগ্র গ্রুপগুলোকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে,

তামিল সমস্যার নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক আলোকবর্তিকা হিসেবে থাকা উদার গ্রুপগুলোকে স্থানচ্যুত করেছে, ভারতীয় অভিভাবকত্বের দাসত্ববন্ধন হড়কে দিয়েছে, এবং সীমিত হলেও একটা কার্যকর বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুলেছে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে। তামিল নাড়ুতে তিন বছর নির্বাসিত থাকার পর জাফনায় ফিরে এসেছেন প্রভাকরন এবং তার গ্রুপের রাজনৈতিক-সামরিক কাঠামো পুনর্গঠন করেছেন। ওই তারবার্তায় বলা হয়ঃ

*এলটিটিই উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলকে পাঁচটি আঞ্চলিক কমান্ড কাঠামোতে বিভক্ত করেছে, প্রতিটিতে রয়েছেন একজন করে আঞ্চলিক অধিনায়ক যিনি সরাসরি রিপোর্ট করেন প্রভাকরনকে। পাঁচটি অঞ্চলের প্রতিটিকে আবার বিভক্ত করা হয়েছে ছোট ছোট এলাকায়। এসব এলাকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মনোনীত স্থানীয় নেতাদের হাতে। তারা রিপোর্ট করেন আঞ্চলিক অধিনায়কের কাছে। পাঁচটি অঞ্চল হচ্ছে জাফনা, মান্নার, ভাভুনিয়া, ক্রিঙ্কোমালী ও বাট্টিকালোয়া। তামিল নাড়ুর পুরাণে ৫ সংখ্যাটিকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করা হয়। একটি সামরিক সূত্র বলে, এই কারণেই ৫টি আঞ্চলিত কমান্ড গঠন করেছিলেন প্রভাকরন। এলটিটিইর কার্যক্রম পারিচালনার কমান্ড কাঠামো অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত এবং প্রভাকরনের কর্তৃত্বাধীন। সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাফনা, কারণ সেখানে এলটিটিইর নিয়ন্ত্রণ ও অভিযানের স্বাধীনতা রয়েছে এবং জাফনার তামিলরা আধিপত্য করে এলটিটিইতে। আঞ্চলিক কমান্ড ও জাফনার মধ্যে টাইগাররা অত্যাধুনিক বেতার যোগাযোগ রক্ষা করে। এলটিটিইর কেন্দ্রীভূত সমন্বয়, শৃঙ্খলা ও কার্যকারিতার এটাই বড় কারণ বলে দাবী করে অনেকে। আঞ্চলিক অধিনায়করা এলটিটিই কাঠামোর মাধ্যমে সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখে। উপ-আঞ্চলিক অধিনায়করা অস্ত্র, গুলি ও রসদের সরবরাহ পেয়ে থাকে আঞ্চলিক অধিনায়কদের কাছ থেকে। একটা পুলিশ সূত্রের দাবী, এলটিটিইর আদায় করা মুক্তিপণের টাকা অবিলম্বে জাফনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়, পরে তা গোটা সংগঠনে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেককেই আনুগত্যের শপথ নিতে হয় প্রভাকরনের কাছে। আঞ্চলিক অধিনায়কদের প্রভাকরন নিজে বাছাই করেন বিশ্বাস, আনুগত্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।*

ফরিদী ব্যাখ্যা করেন, তামিল বিদ্রোহী ও শ্রীলংকা সরকার উভয়কেই সমর্থন করার যে প্রয়োজনীয়তা ভারতের ছিল, কীভাবে সেই ভারসাম্য রক্ষা করেছিল র। 'আমরা এলটিটিইকে দিয়েছিলাম এসএ-৭ ক্ষেপণাস্ত্রের মত ক্ষেপণাস্ত্র, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক আগে। কিন্তু আরও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে তাদের সজ্জিত করার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলাম,' তিনি বলেন। 'যাই হোক, আমরা নিয়মিত গোয়েন্দা তথ্য পেতাম, বিদেশে অবস্থানরত এলটিটিইর অ্যাসেটরা উন্নত অস্ত্র পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক অস্ত্র বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ সাথাপন করেছে। ১৯৮৬ সালে আমরা একটা তথ্য পেয়েছিলাম যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত অস্ত্র ব্যবসায়ীরা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে। অ্যাকশন নেয়ার মত ছিল এই তথ্য, কিন্তু আমরা এই অবৈধ অস্ত্র সাপ্লাই রুট অচল না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ভারসাম্য বজায় রাখতে। কারণ শ্রীলংকান বিমাবাহিনী এলটিটিইর সন্দেহজনক অস্ত্রভাণ্ডারের ওপর হামলা জোরদার করেছিল আর এলটিটিইও পাল্টা হামলার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল।'

ঠাণ্ডা যুদ্ধের সেই উত্তেজনাকর দিনগুলোয় যেসব দেশে সহজে মহড়া চালান যেত সেসব দেশে শত্রুতামূলক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের মোকাবেলা করত।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে নৈকট্য বাড়ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় শ্রীলংকায় গোপন হস্তক্ষেপ করছিল চীন। এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল ভারতীয় স্পাইরা। সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে মিত্র হিসেবে চীনের অসীম মূল্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। চীনও বন্ধু দেশের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল চীনকে। বৈশ্বিক গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের সুবিধাও দেয়া হয়েছিল। চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় ১৯৮১ সালে একটা যৌথ নজরদারী কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যে, চীন-সোভিয়েত সীমান্তের কাছে শিনজিয়াংয়ে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়, লোকবল ছিল সব চীনা টেকনিশিয়ান। তাইওয়ান ইসু নিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র মতপার্থক্য কিছুটা শিথিল হয়েছিল ১৯৮২ সালের অগাস্টে যখন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দেয় যে তাইওয়ানে মার্কিন অস্ত্রের বিক্রি হ্রাস করা হবে এবং একটা নির্দিষ্ট কিন্তু অনুল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হবে। তাইওয়ানের ব্যাপারে চীন ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ

হয়ে উঠেছিল এই বিকাশমান সম্পর্ক। এই সহযোগিতার ব্যাপারে ভারত সচেতন ছিল, কেননা প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল। সোভিয়েত কর্তৃত্বের ব্যাপারে চীনাদের বদ্ধ সংস্কারের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ঝটিতি সম্পর্ক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল চীনের। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় চীনা প্রধানমন্ত্রী ঝাও জিয়াংয়ের সফরের মূল কারণও ছিল সেটাই। তৃতীয় বিশ্বের প্রতি চীনা মনোভাব ছিল বেইজিংয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ যে সে শুধু বন্ধু ও মিত্রই নয়, তৃতীয় বিশ্বের পুরোপুরি একজন সদস্য।

কয়েকটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি টেনে পবন অরোরা বলেন, বিশ্ব ব্যাপী পরিস্থিতি, বিশেষ করে পূর্ব জার্মানি, আফগানিস্তান, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও কিউবায়, বৃহৎ ক্রীড়নকদের কিছুটা দূরে রেখেছিল শ্রীলংকা থেকে। রাশিয়ানদের মত ছিল, অরোরা বলেন, এলটিটিইকে গোপনে সীমিত সাহায্য প্রদান করা, একটা পৃথক ইলমের জন্য প্রকাশ্যে কোনও প্রকার আদর্শগত সমর্থন নয়। অন্যদিকে, শ্রীলংকা সরকারের পররাষ্ট্র নীতি ছিল, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমাদের থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা গ্রহণ করা। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট ন্যাশনস (আসিয়ান)-এর পূর্ণ সদস্য হওয়ার আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিল শ্রীলংকা। দেশটির পশ্চিমাপন্থী মানসিকতা ও ত্রিঙ্কোমালীতে একটা তেল সংরক্ষণাগার টার্মিনাল স্থাপন করতে কোস্ট করপোরেশন অফ আমেরিকাকে অনুমোদন দান ভারতের জন্য গুরুতর উদ্বেগের কারণ ছিল এবং নীরবে এই টার্মিনাল প্রকল্পের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিদেশি ইন্টেলিজেন্স অ্যানালিস্টদের উদ্ধৃতি দিলেও অরোরা স্পষ্ট করে বলেন, শ্রীলংকার ব্যাপারে ভারতের নীতি সম্ভাব্য ছিল না। তিনি যুক্তি দেন, ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপে দূরদর্শিতার অভাব ছিল এবং বিদেশের ভূখণ্ডে একটা গেরিলা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়াটা ছিল বড় ভুল। শ্রীলংকার মত পরিস্থিতিতে যেখানে একটা শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশীর জন্য স্থিতিশীলতা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে বিদ্রোহ টেকসই বিকল্প ছিল না, তিনি বলেন। শ্রীলংকায় ঘাঁটি স্থাপনে ভারত নির্দিষ্ট সুবিধা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছিল আমাদের, যখন কয়েক বছর পর এলটিটিই হত্যা করেছিল রাজীব গান্ধীকে।

## সবচেয়ে সর্বনাশা স্পাই অপারেশন এবং মান রক্ষা

র-এর গুপ্তচরবৃত্তির এযাবৎ কালের সবচেয়ে সর্বনাশা অভিযানগুলোর একটা রয়ে গেছে শ্রীলংকা। প্রথমে বিদ্রোহীদের সমর্থন ও পরে তাদের দিকে বন্দুক তাক করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে ভার কিছুই অর্জন করতে পারেনি, কেবল কয়েক দশক প্রতিবেশী দেশটিতে প্রভাব ধরে রাখা ছাড়া। স্পাইরা মনে করেন, ১৯৮৩ সালে ভারতের প্রতিক্রিয়া যথার্থই ছিল যখন বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, কেননা জাতিগত তামিলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৃশংসতায় অবিচলিত থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধটা ছিল অতিমাত্রায় দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে একটা গোপন অভিযান চালিয়ে যাওয়া বিপদ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলের চাপ ছিল পরিস্কার–শ্রীলংকায় সন্ত্রাসবাদ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এভাবেই ইউপিএ সমর্থন দিয়েছিল মাহিন্দা রাজাপাক্সাকে এবং একই কাজ করেছিল তাদের মিত্র ডিএমকে ও তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. করুণানিধি।

এলটিটিইর বিরুদ্ধে রাজাপাক্সাকে ডিএমকের সমর্থন নিয়ে বিতর্কের ব্যাখ্যা ছিল মার্কিন দূতাবাসের একটি তারবার্তায়। ২০০৮ সালের ২৭শে অক্টোবর 'করুণানিধি বেশি উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক নাটক নিয়ে' শিরোনামের ওই তারবার্তার ভিত্তি ছিল শ্রীলংকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে কথোপকথন। তারবার্তায় বলা হয়:

> *রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টের মতামত জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন যে, তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি শ্রীলংকার ব্যাপারে ভারত সরকারের ওপর কতদূর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন বলে তিনি আশা করেন। প্রেসিডেন্ট উত্তর দেন, করুণানিধির সাম্প্রতিক কঠোর লাইন হচ্ছে তাদিল নাড়ুতে তার বিরোধীদের ভারসাম্য বিনষ্ট করা। রাজাপাক্সা স্বীকার করেন, করুণানিধি তাকে কথা দিয়েছেন যে পর্যন্ত শ্রীলংকা বেসামরিক লোকজনের তদারক করবে, একটা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলবে এবং করুণানিধির সমালোচনা করবে না, তিনি ততক্ষণ সন্তুষ্ট থাকবেন। তামিল নাড়ুর সামান্য দাবী আমলে নিয়ে, উত্তম মানবিক ত্রাণ অব্যাহত রাখা ও বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা, প্রেসিডেন্ট রাজাপাক্সা মনে করেন তিনি ভারত সরকারকে খুশি রাখতে সক্ষম হবেন।*

প্রায় একই সময়ে মাহিন্দা রাজাপাক্সা তার ছোট ভাই বাসিল রাজাপাক্সাকে বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান নতুন দিল্লিতে। এটা ছিল রাজনৈতিক ইঙ্গিত। শ্রীলংকার উত্তর অংশে মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ তুলে ধরে ভারত, বিশেষ করে বেসামরিক ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত লোকজনের ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ার বিষয়টি। র-এর ক্ষমতা সম্পর্কে জানত শ্রীলংকা, র-এর প্রভাব ও নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দিতে গৃহযুদ্ধের ছত্রছায়ায় তারা গোপনে কাজ করছিল।

অবিনাশ বলেন, ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে, যখন শ্রীলংকা সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল টাইগারদের বিরুদ্ধে, একজন নৌকার মালিক ও একজন পরিচারিকা ছিল দ্বীপরাষ্ট্রটিতে র-এর একমাত্র কার্যকর হাতিয়ার। সুন্দরী নামে একজন ভারতীয় পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে চালান হয়েছিল অপারেশন সাটোরি, সেটার কোনও নথি রাখা হয়নি। পঞ্চান্ন বছর বয়সী সেই নারী তামিল ও সিংহলী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। স্থানীয় ইনফর্মারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের সঙ্গে যখন ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিল র, সেই নারী তখন র সোর্সদের উদ্ধার ও সরিয়ে নেয়ার কাজ করেছিলেন।

অবিনাশ বলেন: 'ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ে যাওয়া আমাদের ইনফর্মার ও অ্যাসেটদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিনব উপায় খুঁজছিলাম আমরা, এমন সময় একজন অফিসারের আচমকা দৃষ্টি পড়ে সুন্দরীর ওপর, তিনি আমাদের চা পরিবেশন করছিলেন। অপারেশনের সবচেয়ে ভয়ানক দিকটা ছিল অ্যাসেটদের গতিবিধির চরম গোপনীয়তা বজায় রাখা, কম-বেশি যা নিষিদ্ধ ছিল। দুদিক থেকেই অ্যাসেটদের রক্ষা করতে হত আমাদের এবং অপারেশন চালানোর জন্য শ্রীলংকার ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ও এলটিটিইর এস্পিওনাজ নেটওয়ার্কের হিসাবনিকাশ করতে হত।'

যুদ্ধাঞ্চলে লোকজনের চলাচলের ওপর সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল এবং অ্যাসেটরা আটকা পড়ে গিয়েছিল। শ্রীলংকান সরকার ও তামিল টাইগার উভয়পক্ষই খুঁজে ফিরছিল ইনফর্মারদের। এলটিটিইর এস্পিওনাজ নেটওয়ার্ক ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং একটা নির্দেশ দেয়া ছিল যে কোনও নেতা যুদ্ধ এলাকা ত্যাগ করলে তাকে অবশ্যই গুলি করে মারা হবে। শ্রীলংকান ইন্টেলিজেন্সের দুর্বলতা সম্পর্কে জানত র, তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছিল যে রাজাপাক্সার গুপ্তচররা একটা নজর রেখেছে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের ওপর, ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে মূল্যবান শিকারের জন্য। এক

সপ্তাহের মধ্যে কোসালা কিছু ভুয়া কাগজপত্র জোগাড় করে দিলেন সুন্দরীর জন্য, তার ফলে সুন্দরী যুদ্ধাঞ্চলে স্বাধীনভাবে যাতায়াতের সুযোগ পেলেন চটজলদি বানান হাসপাতালে গুরুতর আহত ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য। জাফনার সর্বত্র ছিল নৈরাশ্য আর চরম দুরবস্থা। উদ্ধার অভিযানের সময় এই উদ্বিগ্নতা মোকাবেলার প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন সুন্দরী।

সুন্দরী ছিলেন অপারেশন সাটোরির কেন্দ্র। তিনি যদিও প্রথাগত স্পাই ছিলেন না, কিন্তু আপাদমস্তক পেশাদার ছিলেন। একজন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার আসাঙ্কা ও একজন প্রাণীসংরক্ষণ কর্মী রামানুজের সহযোগিতায় তিনি র-এর রিক্রুট কয়েকজন নেতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওই নেতারা ছিলেন গোটাবায়ার হিটলিস্টে। এক দিকে এলটিটিইকে নির্মূল করতে শ্রীলংকান সেনাবাহিনীকে স্যাটেলাইট চিত্র সরবরাহ করছিল র, অন্য দিকে সুন্দরী, আসাঙ্কা ও রামানুজ জাফনা থেকে ভারতীয় ইনফর্মারদের সরিয়ে নেয়ার কাজ করছিলেন। শ্রীলংকান সেনাবাহিনী ও এর ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে ছবি সরবরাহ করার আগে সুন্দরী যে এলাকায় অপারেশনে নিয়োজিত ছিলেন সেই জায়গাটা ফটোশপের মাধ্যমে কালো করে দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও যুদ্ধাঞ্চল থেকে লোকজনকে যাতে নিরাপদে পাচার করে দেয়া যায় সে জন্য সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট সিনিয়র সদস্যকে ঘুষ দিয়েছিলেন কোসালা। অবিনাশ, কোসালার অফিসিয়াল হ্যান্ডলার, লোকদের সরিয়ে নেয়ার রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন সিঙ্গাপুর, ক্যাম্বোডিয়া, মালদ্বীপ ও নতুন দিল্লিতে অবস্থানরত ভারতীয় গুপ্তচরদের। গোটাবায়া রাজাপাক্সা ও তার ফন্দিবাজ অনুসারীদের সম্পর্কে অবিনাশের ভাবনা যদিও ছিল খুব খারাপ, তিনি মনে করেছিলেন কোসালার সাহায্যে ভারতীয় নেটওয়ার্ক দিনটাকে বাঁচিয়ে দেবে।

'গোটাবায়া যাদের শত্রু বলে বিবেচনা করতেন, সন্দেহভাজন ইনফর্মার সহ, তাদের জন্য উদ্ভাবন করেছিলেন নির্যাতনের অভিনব পন্থা। আমাদের ক্যারিয়ারে ওই রকম পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ দেখিনি কখনও,' অরোরা বলেছিলেন আমাকে।

অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হিসেবে আসাঙ্কা প্রত্যক্ষ করেছিলেন রাজনৈতিক নেতাদের বিপদজনক ও নোংরা খেলা। ২০০৬ সালে, যুদ্ধ যখন শুরু হয়, তিনি দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশে উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে সিংহলী জনগোষ্ঠীকে খুশি রাখার জন্য শ্রীলংকান এয়ার ফোর্স এলটিটিইর লক্ষ্যস্থলে হামলা করত। আসাঙ্কা স্বয়ং ছিলেন একজন সিংহলী, কিন্তু

জানতেন মানবাধিকার লংঘন একটা বাস্তব ঘটনা এবং মাহিন্দা রাজাপাক্সা যে বলেছিলেন তার বাহিনীকে মানবাধিকারকে প্রাধান্য দেয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেটা ছিল কথার কথা। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ক্রোধান্বিত ছিলেন, কিন্তু সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল ইউনিটে কাজ করে যাচ্ছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন একটা মুক্তির দিনের জন্য।

সুন্দরী ও তার টিম উদ্ধারকৃত অ্যাসেট ও নেতাদের জানান, তারা গোটাবায়া রাজাপাক্সার টার্গেটে ছিলেন এবং তাদের স্থানান্তর সম্পন্ন করা হয়েছে সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে। অরোরার মতে, বেশ কয়েকটি ঘটনায় মাহিন্দা রাজাপাক্সা দাবী করেছিলেন যে প্রভাকরনের অবস্থান সম্পর্কে তার ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভদের কাছে সঠিক তথ্য ছিল, কিন্তু বাস্তবে টাইগারদের অবস্থানের ব্যাপারে তথ্যের জন্য তারা নির্ভরশীল ছিল ভারতীয় সোর্সের ওপর।

২০০৯ সালের মে মাসে বন্দুকের আওয়াজ থেমে যায় এবং ১৯শে মে পার্লামেন্টে বিজয়ের ঘোষণা দেন রাজাপাক্সা। তিনি তামিল ও মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী ঘোষণা করলেও এ কথা বলেন যে, তামিলদের দুর্দশার কারণ এলটিটিইর সন্ত্রাসবাদ এবং তামিল অভিবাসী যারা বিদ্রোহীদের সমর্থন করেছিল, একটা পৃথক ইলমের জন্য ওই ধরনের সহযোগিতা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। রাজাপাক্সার মতে, গৃহযুদ্ধে শ্রীলংকান সেনাবাহিনীর বিজয় বস্তুত তামিল জনগণেরই বিজয়, যেহেতু অনেক বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে তারা কিছুই পায়নি। তিনি বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শ্রীলংকান তামিলদের একটা পৃথক স্বায়ত্বশাসিত রাষ্ট্রের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এলটিটিই। এতে এলটিটিই শাসিত এলাকায় উন্নয়ন থেমে গিয়েছিল এবং সেই কারণে বৃহত্তর তামিল জনগোষ্ঠীকে ভুগতে হয়েছে। তার মতে, তামিলরা বিদ্রোহের শিকার এবং তারা সমাজের মূলধারার অংশে পরিণত হবে সেটা নিশ্চিত করছে এই বিজয়।

রাজাপাক্সা জানতেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শ্রীলংকান সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের নিন্দা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই শ্রীলংকার টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় প্রভাকরনের মৃতদেহের ছবি সম্প্রচারের পর কালবিলম্ব না করে তিনি একটি বিশাল আক্রমণাভিযান চালান। রাজাপাক্সা কোনও নির্দিষ্ট দেশের নাম উচ্চারণ না করে বলেন, এলটিটিইর সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের ভিতরেও শ্রীলংকা তামিলসহ তার সকল নাগরিকের প্রতি যত্নশীল ছিল এবং তামিলদের প্রতি সদাচার সম্পর্কে তার কোনও উপদেশের প্রয়োজন নেই।

অরোরার মতে, প্রভাকরন নিহত হওয়ার আগে ২০০৯ সালের এপ্রিলে ভারত এলটিটিইর ঘাঁটির ওপর হামলা থামাতে অনুরোধ করেছিল শ্রীলংকা সরকারকে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম. কে. নারায়ণন ও পররাষ্ট্র সচিব শিবশংকর মেনন ২৪শে এপ্রিল কলম্বো গিয়েছিলেন। টাইগারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরতি নিশ্চিত করার ওপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। তাদের সফরের সময়ই মুল্লাইতিভুতে অভিযান চালাচ্ছিল শ্রীলংকান সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রভাকরনকে জীবিত আটক করা। রাজাপাক্সাকে নারায়ণন প্রতিশ্রুতি দেন যে যুদ্ধের পর হাঙ্গামা-কবলিত অঞ্চল পুনর্গঠনে শ্রীলংকাকে সহযোগিতা দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। বিনিময়ে অস্ত্রবিরতির প্রতিশ্রুতি দেন রাজাপাক্সা, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেননি যতক্ষণ না তার সেনাপ্রধান সারাথ ফনসেকা নিশ্চিত করেন যে প্রভাকরন ও তার তিরিশজন বিশ্বস্ত সহযোগী নিহত হয়েছেন। মে মাসে যুদ্ধসমাপ্তির পর গোটাবায়া রাজাপাক্সা দাবী করেন যে ইরিত্রিয়ায় একটা শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করেছিল এলটিটিই, বোট নির্মাণ করা হত সেখানে, এবং এলটিটিই অপারেটিভরা মিডলম্যান নিয়োগ করেছিল ভারত, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায়। তিনি কয়েকজন কূটনীতিকের কাছে এটাও স্বীকার করেন যে শ্রীলংকায় সন্দেহজনক অনুপ্রবেশের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছিল র, এবং ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাটির সাহায্য নিয়ে কয়েকটি অভিযান চালিয়েছিল শ্রীলংকা। দুই দেশের গভীর সম্পর্ক এবং পারস্পরিক তথ্যবিনিময়ের বিষয়টি তুলে ধরতে এটাই যথেষ্ট ছিল।

অরোরা বলেন, ইউপিএ সরকার সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছিল মাহিন্দা রাজাপাক্সার ওপর, বিনিময়ে পেয়েছিল সর্বনিম্ন। গৃহযুদ্ধের পর কলম্বোয় ভারতীয় দূতাবাস সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, শ্রীলংকান সরকারের ওপর প্রভাব বজায় রাখার সামর্থ্য আর ছিল না। এমনকি ভারতীয় দূতাবাসের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা র-এর তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছিলেন। তৎকালীন র প্রধান কে. সি. ভার্মার জেদের কারণেই কেবল তাকে অপসারণ করা হয়। তার পূর্বসুরী অশোক চতুর্বেদীর কোনও আগ্রহ ছিল না শ্রীলংকা নিয়ে, কিন্তু শ্রীলংকার ওপর র-এর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন ভার্মা। ক্রমবর্ধমান চীনা অনুপ্রবেশের ব্যাপারে র সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু ভারতীয় কূটনীতিকরা ব্যস্ত ছিলেন অন্য বিষয়ে। ২০১০ সালের কোনও সময়ে শ্রীলংকায় চীনাদের উপস্থিতির ব্যাপারে কূটনীতিকদের উদাসীনতায় ঝড় বয়ে যায় নতুন দিল্লিতে। চীনারা শ্রীলংকায় বিশাল মহাসড়ক নির্মাণের একটা মেগা

কন্ট্রাক্ট মুঠোয় পুরতে চলেছিল, কিন্তু ভারতীয় কূটনীতিকরা নিশ্চিন্তে ছিলেন যে কলম্বো এই কন্ট্রাক্ট শেষ পর্যন্ত ভারতকেই দেবে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে এমইএর একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করতে গেলে জানা যায়, একজন র এজেন্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে (পিএমও) ওই কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব নিরুপমা রাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং কলম্বোয় নিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার করে নেন। ইউপিএ এক বছর আগে ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং রাজাপাক্সাকে বলেছিলেন, ২০১০ সালের জানুয়ারিতে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজাপাক্সার বিজয় দুই দেশের সমস্যাগুলো সমঝোতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। ভারতের সহযোগিতার জন্য, বিশেষ করে মানবিক ত্রাণ সহায়তার জন্য পাঁচশো কোটি রুপী প্রদান, অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ইত্যাদির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রাজাপাক্সা। তিনি সিংকে আশ্বাস দেন, বাস্তুচ্যুতদের অবিলম্বে পুনর্বাসিত করা হবে। উভয় দিক থেকেই শোভন কথাবার্তা বিনিময় হলেও র-এর স্পাইরা জানত, নতুন দিল্লির হায়দারাবাদ হাউজে টাঙান সুন্দর ছবির মত মনোহর ছিল না দুই দেশের সম্পর্ক। রাজাপাক্সা ছিলেন ঠাণ্ডামাথার ধূর্ত এবং ভারতকে প্রতিহত করতে তিনি চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম-মহরম করছিলেন। র সচেতন ছিল যে, চীনাদের সংগে নবায়নকৃত সম্পর্ক শুরু করার জন্য রাজাপাক্সা যেকোনও সময় বেইজিংয়ে যাবেন।

কলম্বোর পরিকল্পনা সম্পর্কে র এজেন্টরা এবার অনুসন্ধান শুরু করেছিল বেইজিং ও ইসলামাবাদে। বন্ধুপ্রতিম বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সঙ্গে কাজ করত লিয়াজোঁ ইউনিট, তারা রিপোর্ট করেছিল যে গৃহযুদ্ধের সময় শ্রীলংকান সেনাবাহিনীকে গোপনে অস্ত্রের জোগান দিয়েছিল চীন, এখন শ্রীলংকায় ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। শ্রীলংকায় চীনাদের পা রাখার বিশাল সুযোগ করে দিয়েছে গৃহযুদ্ধ। শ্রীলংকান সেনাবাহিনীকে শুধু যুদ্ধবিমানই সরবরাহ করেছে চীন তাই নয়, ইসলামাবাদের সাহায্যে পাইলটদেরও প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

অবিনাশ বলেন: 'চীনাদের বিষয়ে আমরা যখন ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরকে সাবধান করি, একজন সিনিয়র অফিসার আমাকে উদ্বিগ্ন না হতে বলেন। চীনারা সড়ক নির্মাণ করুক, তিনি বলেন, আমরা ওইসব সড়কে আমাদের বাস চালাব। আমরা যখন তার ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলাম, তাকে সঙ্গে

সঙ্গে অপসারণ করা হয়েছিল এবং দিল্লির সদরদপ্তরে অনুল্লেখযোগ্য পজিশনে বদলি করা হয়েছিল।'

'পাস' সাংকেতিক নামধারী অফিসারটি ছিলেন স্কচের ভক্ত। ভারতীয় স্পাইরা রিপোর্ট করেছিল, শ্রীলংকায় ভারতের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে তিনি চড়াসুরের পার্টিতে অংশ নিতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। 'তাকে একবার প্রমাণসহ ফাঁদে ফেলে আমাদের স্পাইরা। আমরা শ্রীলংকা থেকে তার প্রত্যাহার চেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আপসকামী লোক,' অবিনাশ বলেন, নতুন দিল্লিতে সাংকেতিক ভাষায় পাঠান র-এর একটি রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে।

২০১২ সালের জানুয়ারিতে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. এম. কৃষ্ণ কলম্বোয় আসেন শ্রীলংকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে এবং চীনের পক্ষে তুল্যশক্তিসম্পন্ন বিরোধী বস্তু হিসেবে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। তিনি আরিয়ালাই ও জাফনায় গৃহায়ণ ইউনিটের প্রথম লট হস্তান্তর করেন এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শ্রীলংকার গলে সাউদার্ন রেলওয়ে প্রজেক্টের একটি অংশ উদ্বোধন করেন যেটা বাস্তবায়ন হচ্ছিল ভারতের লাইন অফ ক্রেডিটের অধীনে। কিন্তু এসব কাজের পক্ষে তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ইতোমধ্যে শ্রীলংকায় বিশাল কার্যক্রম আরম্ভ করে দিয়েছিল চীনারা।

### এলটিটিই ২:০?

জাফনার ছাই থেকে কিসের উত্থান হবে? নতুন করে এলটিটিইর গ্রুপ গঠন এবং শ্রীলংকান সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে বিদ্রোহ? শ্রীলংকার পরিস্থিতি আর বিভিন্ন দেশে এলটিটিইর অবশেষ পর্যবেক্ষণ করে আসছেন যেসব স্পাই তাদের ধারণা, এলটিটিই ২:০ একটা সম্ভাবনা, যদিও খুব ছোট আকারে। যেহেতু এই বিদ্রোহী গ্রুপের অংশ সক্রিয় রয়েছে সিঙ্গাপুর, ক্যাম্বোডিয়া, ক্যানাডা ও তামিল নাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলে, তারা হয়তো তামিল ইলমের জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ শুরু করতে পারে, তবে শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও হুমকি সৃষ্টি করতে পারবে না। প্রভাকরনকে হত্যা ও প্রায় বারো হাজার এলটিটিই ক্যাডারকে আটক করার পর কানাঘুঁষা শোনা গিয়েছিল যে টাইগারদের আন্দোলন শুরু হতে পারে ক্যাম্বোডিয়া ও ক্যানাডা থেকে, তাতে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক সমর্থকরা অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে গেরিলাদের।

অজিত শাহ্ সাংকেতিক নামের একজন স্পাই কলম্বো সফর করেন ২০১৫ সালে। তিনি ছিলেন পেশায় অভিজ্ঞ। গৃহযুদ্ধের পর বিপুল সংখ্যায় এলটিটিই নেতাদের শুদ্ধিকরণ তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন নিবিড়ভাবে। এলটিটিইর কিছু অবশেষ, যারা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশে বসতি স্থাপন করেছিল, একটা নতুন জীবন শুরু করার চেষ্টা করছিল, যদিও তাদের পরিচালিত স্কুলে বাচ্চাদের পড়ান হত হারিয়ে যাওয়া রাষ্ট্র তামিল ইলম সম্পর্কে। শাহ্ বলেন, এলটিটিই ইতিহাসে পরিণত হয়েছে এবং শ্রীলংকা থেকে সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যাওয়ার ছয় বছরের মধ্যেই এখন তা বড় জোর পাঠবইয়ের একটা বিষয়।

'তারা একটা অভ্যুত্থান কৌশল রচনায় সক্ষম নয়। উদ্যোগটা হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তামিল ইলম ইসুটাকে জীবন্ত রাখা। এসব অংশ শ্রীলংকার জন্য বাস্তব হুমকি নয়,' শাহ্ আমাকে বলেছিলেন।

রাজনৈতিকভাবে একটা শক্তিশালী লবি রয়েছে যেটা ট্রান্সন্যাশনাল গভর্নমেন্ট অফ তামিল ইলম (টিজিটিই) নামে পরিচিত। জাতিত্ব, স্বদেশভূমি ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মৌলিক রাজনৈতিক নীতির ভিত্তিতে তামিলদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে চায় টিজিটিই। এই গ্রুপ কাজ করে নিই ইয়র্ক থেকে। শ্রীলংকার উত্তর ও পূর্ব অংশে তামিল জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যায়বিচারের জন্য তারা লড়াই করছে বলে তাদের দাবী। সেই সঙ্গে তারা লড়াই করছে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ীদের শাস্তির জন্যও। ২০০৯ সালে গৃহযুদ্ধের পর গঠিত টিজিটিই হচ্ছে দশ লাখ তামিলের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত একটা সরকার, শ্রীলংকা থেকে বেরিয়ে এসে এসব তামিল বাস করছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। এর একটি প্রকাশনা মতে, '১৩২ সদস্যের পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য টিজিটিই দুইবার সারা বিশ্বের তামিলদের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করে যার তদারকি করা হয়েছিল আন্তর্জাতিকভাবে। এর রয়েছে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ও মন্ত্রীসভা। ব্রিটিশ ও ফ্রেঞ্চ পার্লামেন্টের অন্যান্য স্থানের মধ্যে এর সংসদীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। টিজিটিইর সংবিধানের ম্যান্ডেট হচ্ছে, রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে হবে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে। টিজিটিইর প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ভিসুভানাথান রুদ্রাকুমারান, যিনি নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক একজন আইনজীবী।'

শাহ্ বলেন, টিজিটিই একটা প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করে, যারা ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে মাহিন্দা রাজাপাক্সা ও তার সরকার কর্তৃক তামিলদের ওপর সংঘটিত নৃশংসতার ন্যায়বিচার দাবী করছে। এলটিটিইর অবশিষ্টদের মধ্যে কট্টর অংশটি নিচু মাত্রার অভিযানে সম্পৃক্ত হয়ে বড় জোর উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু তারা হয়তো আর কখনই একটা অঞ্চলের আধিপত্য ফিরে পাবে না।

## ৪

# নেপালে গুপ্তচর

২০০৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর। বিরাট নগর, নেপাল। নবি প্লাজায় নিজের মানি এক্সচেঞ্জ শপে একটা ভারতীয় স্যাটেলাইট টিভি নিউজ চ্যানেলে চোখ আটকে রয়েছে নিজাম খানের। স্ক্রিনে অপারেশন বাটলা হাউজ দেখান হচ্ছে লাইভ। নতুন দিল্লির জামিয়া নগরের রাস্তায় গিজগিজ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। বাটলা হাউজে গোলাগুলি চলছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন (আইএম) ও দিল্লি পুলিশের মধ্যে। দুজন সন্ত্রাসবাদী, আতিফ আমীন ও মোহাম্মদ সাজিদ, নিহত হয়েছে এবং আরও দুজন, শাহ্জাদ ও আরিজ খান, পালিয়ে গেছে।

এই ধরনের অপারেশন আগে কখনই হয়নি, খান ভাবছিল। ফোন করল তার বন্ধু আইয়ুব শেখকে। তাদের কথাবার্তা হল সংক্ষিপ্ত। সন্ধ্যায় কার্সিয়া রোডে দুজনের দেখা হবে, ঠিক হল।

নেপালে আইএমের স্লিপার সেলের অংশ ছিল খান। সন্ত্রাসবাদী দলটাকে টাকা, আশ্রয় ও প্রত্যয় দিয়ে সাহায্য করছিল। তার মধ্যে এই প্রত্যয় ঢুকিয়েছিল পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)। তার টাকাও আসত সেখান থেকেই। আইয়ুবের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মূলত তারা বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিল। আইয়ুব কাঁধ ঝাঁকিয়ে মৃদু হেসে তা উড়িয়ে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও খান পরবর্তী দুই সপ্তাহ লো প্রোফাইলে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে জানত, অপারেশন বাটলা হাউজ কোনও দৈবাৎ ঘটনা নয়। ২০০৭ সালের প্রথম থেকে যখন আইএমের অভিভাবক সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (এসআইএমআই)-এর বিরুদ্ধে বিশাল ক্র্যাকডাউন শুরু করেছিল সন্ত্রাসবিরোধী ভারতীয় সংস্থাগুলো, খান তখনই নিকেশ হওয়ার আশঙ্কা করেছিল। সে নিজে কেরালার কয়েকটি সন্ত্রাস-প্রশিক্ষণ শিবিরে অর্থ সাহায্য দিত। সেসব শিবিরে নতুন রিক্রুটদের শারীরিক প্রশিক্ষণ, অস্ত্র প্রশিক্ষণ,

গুলিবর্ষণ অনুশীলন ও বোমা তৈরির কৌশল প্রদান করা হত। এসবের লক্ষ্য ছিল ভারতে জিহাদ।

খানকে আইয়ুব আশ্বস্ত করেছিল যে যেকোনও 'পলাতক পাখি' তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যদি এক মাস বেঁচে থাকে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে খানের সঙ্গে একজন দেখা করতে আসে। সে ছিল আরিজ ওরফে জুনাইদ। বিহারের আরারিয়ায় জগবানি থেকে সে সীমান্ত অতিক্রম করে নেপালে ঢুকেছিল। নিজাম খান তাকে একটা নতুন আইডেন্টিটি দেয়–মোহাম্মদ সালিম, ওয়ার্ড নং ১৮, বিরাট নগর, নেপাল। তাকে একটা মাদ্রাসায় জায়গাও পাইয়ে দেয়।

নেপালে সাদরে গ্রহণ করে নেয়া প্রথম পলাতক সন্ত্রাসবাদী ছিল না জুনাইদ। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে অপরাধ জগতের ডন দাউদ ইব্রাহিমের সহায়তায় আইএসআই সফলভাবে একটা সুদৃঢ় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল হিমালয়ের দেশটিতে। চোরাচালান ও ভারতবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাত এই নেটওয়ার্ক। অংশত এটা সম্ভব হয়েছিল নেপালের প্রতি ভারতের বড়ভাই সুলভ আচরণের কারণে। এর ফলে হিমালয়ের দেশটিতে সৃষ্টি হয়েছিল জোরাল ক্ষুব্ধ অনুভূতি।

র-এর জন্য নেপাল হচ্ছে প্রথাগত গুপ্তচরবৃত্তির একাধারে সাফল্য ও ব্যর্থতার উদাহরণ। একদা এই দেশটি ছিল ভারতীয় অপারেটিভদের পক্ষে দুর্দান্ত রঙ্গমঞ্চ, যেখানে প্রকৃত ও সম্ভাব্য হুমকি নিকেশ করতে রিক্রুট করা হয়েছিল শীর্ষ অ্যাসেটদের। ক্ষমতাধর লোকজনের ঘনিষ্ঠ এই অ্যাসেটরা প্রদান করত নির্ভেজাল গোপন তথ্য, একটা সরকারের দ্বিতীয় ধাপের কর্মকর্তাদের উন্নত পর্যবেক্ষণ ও নজরদারির চেয়েও সেসব ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কার্যকর।

কিন্তু বিভিন্ন ভারতীয় সরকারের রাজনৈতিক ব্যর্থতা এমন পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে ফেলেছে যেখানে নেপালের ওপর ভারতের প্রভাব নেই, যা থাকা উচিৎ ছিল, যেমন ছিল ১৯৫০-এর দশকে। সে সময় প্রথমবারের মত ভারত ও নেপালের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত সি. পি. এন. সিং ও নেপালের মহারাজা, প্রধানমন্ত্রী ও সুপ্রিম কমান্ডার-ইন-চিফ শামসের জং বাহাদুর রানা।

চুক্তিতে বলা হয়েছিল, নেপালে অস্ত্র ও গোলাগুলি সরবরাহ এবং বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটাতে ভারত সহযোগিতা করতে সম্মত; দুই দেশের লক্ষ্য চিরন্তন শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা; দুই সরকারই একে অন্যের পূর্ণ

সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা মেনে চলবে ও সম্মান করবে; দুই সরকার সজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে কোনও তৃতীয় দেশকে তাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরানোর সুযোগ দেবে না, একে অন্যকে জানাতে দ্বিধা করবে না; এবং নেপাল তার নিরাপত্তার প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি ও যেকোনও প্রকার যুদ্ধ-সরঞ্জাম বিনা বাধায় আমদানী করতে পারবে ভারত থেকে।

**অশান্ত অতীত**

প্রায় তিনশো বছরের রাজতন্ত্রের পর ১৯৫১ সালে নেপালে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। তবে সংবিধান অনুমোদিত হয় ১৯৫৯ সালে, তার ফলে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পার্লামেন্টের জন্য। নির্বাচনে বিশাল বিজয় অর্জন করে নেপালী কংগ্রেস এবং নেপালের প্রথম সরকার গঠন করে। কিন্তু ১৯৬০ সালের ডিসেম্বরে সরকারকে বরখাস্ত করা হয়, যখন রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেব মন্ত্রীসভার সঙ্গে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। রাজা মহেন্দ্রের রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সাল থেকে।

তখনও র-এর জন্ম হয়নি। ইন্টেলিজেন্স বুরো (আইবি) ছিল ভারতের একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা, নজর রাখত ভারতকে প্রভাবিত করা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ওপর। নেপালী কংগ্রেস সরকারকে বরখাস্ত করার অর্থ ছিল, নেপাল আবার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। ১৯৬২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি জয়েন্ট সেক্রেটারি কে. এল. মেহতার ড্রাফট করা এমইএর একটি রিপোর্টে বলা হয়, নেপালের অভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা জাতীয় অভ্যুত্থানে মোড় নিচ্ছে। কয়েকজন নেপালিজ কংগ্রেস নেতা ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং রাজা মহেন্দ্র মনে করেছিলেন ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে এই নেতারা নেপালে অশান্তি উস্কে দিচ্ছেন।

১৯৫৯ সালে কার্যকর হওয়া সংবিধান বিলুপ্ত করা হয় ১৯৬২ সালে। নতুন একটা সংবিধান লেখা হয় নেপালের রাজসিংহাসনকে কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিয়ে। ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে রাজা মহেন্দ্র যখন পূর্বাঞ্চলীয় নেপাল সফর করছিলেন, সেই সময় জনকপুরে তার ল্যান্ড রোভার লক্ষ্য করে পটকা ছোঁড়া হয়, ভারত তখনই পরবর্তী ছবিটা দেখতে পেয়েছিল। মাত্র দুই ব্যক্তি সামান্য আহত হয়েছিল ওই ঘটনায়, তা সত্ত্বেও নেপালী পররাষ্ট্র মন্ত্রী তুলসি গিরি এ জন্য ভারতকে অভিযুক্ত করে বলেন, কিউবায় মার্কিন প্রতিক্রিয়ার মত ভারতও রাজনৈতিক ফন্দি, দ্বিচারিতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে নেপালে, ভারতীয়

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দিচ্ছে নেপালী বিদ্রোহীদের প্রশিক্ষণ নেয়ার ও সংগঠিত হওয়ার জন্য, নেপালে হিট অ্যান্ড রান অভিযানের জন্য। ভারত সরকার 'সীমাতিরিক্ত বিবৃতি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, জোরাল ভাবে বলে যে নেপালের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলকভাবে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেয়ার কোনও প্রমাণ নেই। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবারও ভারতের বিরুদ্ধে দুই দফা সহিংস প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয় নেপালে। নেপাল সরকার প্রতিবাদ প্রদর্শন করে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে, অভিযোগ করে যে হানাদাররা যে সংগঠনের উর্দি ও শিরোস্ত্রাণ পরিহিত ছিল ও তাদের সঙ্গে যেসব জিনিসপত্র ছিল সেই সংগঠনটি ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত হয় নেপাল সরকারের বিরুদ্ধে। ভারত সরকার অভিযোগের জবাব দেয় এই দাবী করে যে বেশ কিছু তদন্ত করা হয়েছে, কিন্তু কোনও তদন্তেই ধরা পড়েনি যে হানাদাররা ভারত থেকে নেপালে ঢুকেছিল বা নেপাল থেকে ভারতে পালিয়ে এসেছিল। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা শত্রুতার মধ্যে রাজা মহেন্দ্র নতুন দিল্লি সফর করেন ১৯৬২ সালের ১৮ই এপ্রিল। এমইএর একজন কর্মকর্তা এম. জে. দেসাই উল্লেখ করেন, এই সফরকালে রাজা ও তার কর্মকর্তারা ছিলেন স্নায়বিক দুর্বলতার মেজাজে। তারা চেয়েছিলেন, ভারত সরকার যেন ভারতে অবস্থানরত সকল নেপালী কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে আইন-অতিরিক্ত সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই ভিত্তিতে যে এই নেতারা নিপালে বিদ্রোহী তৎপরতা উস্কে দিচ্ছেন। দেসাই লেখেন:

> *আমরা তাদের (নেপাল) বলেছিলাম যে ভারতের সরকার ভারত থেকে নেপালে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গমনাগমন ও অস্ত্রপাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং আমাদের তথ্য মতে নেপালে বিদ্রোহী তৎপরতার ভিত্তি হচ্ছে স্থানীয় অসন্তোষ। নেপালের ভিতরে বিদ্রোহী তৎপরতা দমন ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার অক্ষমতা ঢাকতে ভারতের ওপর দায় চাপিয়ে দেয়াটা ছিল নেপাল কর্তৃপক্ষের অপপ্রচারমূলক প্রচেষ্টা।*

রাজা মহেন্দ্রর কর্তৃত্বাধীন নেপাল দহরম-মহরম শুরু করেছিল চীনের সঙ্গে, কাঠমান্ডু-লাসা সড়ক নির্মাণের একটা চুক্তি করেছিল তারা। ভারত সরকার যখন এ ব্যাপারে ভারতের নিরাপত্তা ঝুঁকি ও উদ্বেগের কথা প্রকাশ করে, নেপালী কর্মকর্তা জানান যে চীনের দিক থেকে যাতে নেপাল ও ভারতকে বিপদে পড়তে না হয় সেজন্য তারা সকল প্রয়োজনীয় পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করবেন।

করাচীতে কর্মরত আইবি কর্মকর্তারা ভারত সরকারকে অবহিত করেছিলেন, করাচী থেকে কাঠমান্ডু হয়ে ঢাকার মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলের একটা চুক্তিও নেপাল করেছে পাকিস্তানের সঙ্গে। ভারত সরকারের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের কাছে পাঠান এক নোটে দেসাই উল্লেখ করেন, এমইএ যখন বিষয়টি নেপালের সামনে উত্থাপন করেছিল তখন তারা কোনও উত্তর দেয়নি, কিন্তু ভারতীয় কর্মকর্তাদের পুনরায় আশ্বাস দিয়েছিল যে তারা এমন কিছু করার স্বপ্ন দেখছেন না যা ভারত ও নেপালের মধ্যকার ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক নষ্ট করবে। দেসাইয়ের নোটে বলা হয়:

*আমরা তাদের কাছে তুলে ধরেছিলাম যে বন্ধুত্ব হচ্ছে একটা দ্বিমুখী বিষয়, আর আমরা যখন তাদের যোগাযোগ, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন করার আকাঙ্ক্ষা বুঝি, তখন চীন বা পাকিস্তানের সঙ্গে তারা কোনও চুক্তি করলে ভারতের জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটাও তাদের ভাবনায় রাখতে হবে, যার প্রভাব পড়বে অভিন্ন ভারত-নেপাল নিরাপত্তা স্বার্থের ওপর।*

ভারতীয় কর্মকর্তারা মনে করতেন যে রাজা মহেন্দ্র ছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষ, মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা তাকে খারাপ পরামর্শ দেয়, কয়েক সপ্তাহ পর পরই তাকে স্পর্শকাতর অবস্থায় ফেলে দেয় তারা সহজেই। এর সাক্ষ্য মেলে ১৯৬২ সালের ১৮ই এপ্রিল পালাম বিমানবন্দরে অবতরণের পর দেয়া তার কঠোর মন্তব্যে, যার রেকর্ড রয়েছে একটি সরকারী নথিতে:

*আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে বন্ধুত্ব কোনও একপেশে বিষয় নয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মতামত বিনিময় হচ্ছে বন্ধুদের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি দূর করার সর্বোত্তম পন্থা [...] পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে আমরা সকল বন্ধুর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলার জন্য নিজেদের সর্বদা প্রস্তুত রেখেছি।*

ওই একই দিন তার সম্মানে দেয়া ভোজসভায় বক্তব্য প্রদানের সময় রাজা মহেন্দ্র ভারতীয় পক্ষকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, দাবী করেন যে নেপাল অগ্রগতির পথ বেছে নিয়েছে সময়ের প্রয়োজনে।

কিন্তু ভারত ছিল সন্দিগ্ধ। চীনের সঙ্গে নেপালের সম্পর্কের বিষয়টি ছাড়াও পাকিস্তান ও নেপালের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্য বিনিময়েও উদ্বিগ্ন

ছিল ভারত। আইবি অপারেটিভরা মনে করতেন, পাকিস্তান হিমালয়ের এই স্থলপরিবেষ্টিত ছোট দেশটিতে তার ঘাঁটি মজবুত করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৬৩ সালের ৯ই মে কাঠমান্ডুতে অবতরণ করেন। দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করাই ছিল তার সফরের লক্ষ্য। ১৯৬৩ সালের ১৫ই জুন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হরীশ্বর দয়াল তার নোটে উল্লেখ করেন, ইতিপূর্বে পাকিস্তানে রাজা মহেন্দ্রকে প্রদত্ত আতিথেয়তার বিনিময়ই নয় শুধু, প্রতীয়মান হয় আইয়ুব খানের এ সফরের আরও উদ্দেশ্য হল নেপালকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে ভারত ছাড়াও তার আরও বন্ধু আছে।

১৯৬৩ সালের অগাস্টে পাকিস্তানের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স অফিস খোলা হয় কাঠমান্ডুতে। তখনই নেপাল থেকে তথ্য যাচাই ও পাচার কার্যক্রম শুরু করে দেয়। পাকিস্তান যখন নেপালে পা রাখার চেষ্টা করছিল, কাঠমান্ডুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল চীন। অন্তত পক্ষে দুটো চীনপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদকরা ১৯৬৩ সালে চীন সফর করেছিলেন। একটি সংবাদপত্রের নাম *মাদারল্যান্ড*, অন্যটি *নয়া সমাজ*। সম্পাদকরা নেপালে ফিরে আসার পর পত্রিকা দুটো ভারতকে আক্রমণ করে বিপুল বেগে প্রপাগান্ডা শুরু করে দেয়। অভিযোগ তোলে, ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা (সামরিক অ্যাটাচে) উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নেপালের কাম্পাসে তিন লাখ রুপী বিতরণ করেছেন দেশে ঝামেলা পাকানোর জন্য। ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ করে এবং এসব প্রতিবেদন নেপাল সরকারের উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরে। সেই সময় নেপালে নিয়োজিত ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা রিপোর্ট করেছিলেন, নেপালে ভারতবিরোধী ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে বর্ধিষ্ণু সংখ্যক পত্রিকাকে তহবিল প্রদান করেছে চীন। তারা আরও রিপোর্ট করেছিলেন, নেপালে প্রচুর সংখ্যক চীনা গুপ্তচরের আগমন ঘটেছে। এ বিষয়টার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন দয়াল ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসের একটা নোটে: 'এটা আশা করা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে যে রাজধানীসহ সারা নেপালে চীনা এজেন্টদের উপস্থিতির ব্যাপারে নেপালী কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেবে।'

নতুন দিল্লির আইবি সদরদপ্তরে একটা প্রতিবেদন পাঠান হয়েছিল কাঠমান্ডু থেকে, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে, তাতে চীনাদের গোপন অভিসন্ধীর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। নেপালের উন্নয়নে আগ্রহ ছিল না চীনের, ওই অঞ্চলে ভারতের প্রভাব প্রতিহত করতেই সেখানে তার জোরাল উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল। *নেপালী* নামে একটি সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি রিপোর্ট করা হয়েছিল, সেই উদ্ধৃতিতে পত্রিকাটি চীনের বিরুদ্ধে

লিখেছিল: 'এটা স্পষ্ট যে নেপালে বড় কোনও প্রকল্প একাই সম্পন্ন করতে পারবে না চীন যতক্ষণ পর্যন্ত সোভিয়েত ব্লকের সঙ্গে তার বিবাদ ও মতপার্থক্য অব্যাহত থাকবে। এটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে বড় কোনও শিল্প চীনারা বাস্তবায়ন করবে এমন আশা করা বৃথা।'

র-এর জন্মের পর ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা ধীরে ধীরে এই ভাবনায় আসেন যে, নেপালকে ভারতের বিরুদ্ধে লাগানোর জন্য পাকিস্তান ও চীন সম্ভব সবকিছু করবে। সরকার আশা করেছিল, চীন ও পাকিস্তানের অভিপ্রায় বানচাল করে দিতে র একটা কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং উত্তম কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য নেপালী জনসাধারণের মধ্যে একটা সুশাসনের বোধ বজায় রাখবে।

কিন্তু সম্পর্কের ঘর্ষণ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ১৯৭০-এর দশকে যখন নেপালের মাটিতে চীন ও পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির ওপর বাধানিষেধ আরোপ করার ভারতের দাবী নাকচ করে দিয়েছিল নেপাল। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে রাজা মহেন্দ্র মারা যান। এরপর রাজা হন তার পুত্র রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেব। পিতার নীতিই অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। নেপালের র টিমকে হতাশায় ফেলে দেন এভাবে। এই টিমের নেতা ছিলেন রাজেশ গার্গ। নেপালের গুপ্তচরবৃত্তির রঙ্গমঞ্চে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালের মধ্যভাগে তেরাইয়ে আইএসআইয়ের একটা চক্রান্ত বরবাদ করে দিয়েছিলেন তিনি। গুপ্তচরদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল নেপাল।

গার্গের মতে, আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুলাম জিলানী খান, যিনি সংস্থাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ১৯৭১ সালে, সরাসরি তত্ত্বাবধান করেছিলেন তেরাই অঞ্চলে পাকিস্তানি অভিযান। ইতোমধ্যে র একজন এজেন্টকে রিক্রুট করেছিল, নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করত সেই এজেন্ট। দিল্লিতে তার পরিচয় ছিল কে১৩৬। স্বেচ্ছায় সে র-এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করত, গোপন তথ্য প্রদানের জন্য দাবী করত চড়া মূল্য। গার্গ বলেন, তার বুঝতে কিছুটা সময় লেগেছিল যে লোকটা র-এর হয়ে কাজ করতে চায় বিনা লোভে। সে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের উত্তেজনা উপভোগ করতে চেয়েছিল। গার্গ শেষ পর্যন্ত যখন লোকটাকে রিক্রুট করার সিদ্ধান্ত নেন, দেখা গেল নেপালে র-এর পক্ষে সেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচরে পরিণত হয়েছে।

কে১৩৬ তার দেশে আগত সকল পাকিস্তানি নাগরিকের তথ্য দিত গার্গকে, নেপালে আসা-যাওয়া করা পাকিস্তানি কর্মকর্তা, সন্ত্রাসবাদী ও ব্যাবসায়ীদের ফাইল দেখার সুযোগ করে দিত ভারতীয় স্পাইদের। নির্দিষ্ট

স্থানে চিহ্ন রেখে যাওয়ার যুগপ্রাচীন পদ্ধতিতে কাজ করত স্পাইরা, তুলে নেয়ার সংকেত দিয়ে যেত বিভিন্ন চিহ্ন দিয়ে, যেমন '+' চিহ্ন। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে গার্গ ও অন্য অপারেটিভরা একটা অভিযান চালান, সেই অভিযানে ব্যাবসায়ীর ছদ্মবেশধারী পাকিস্তানি এজেন্টদের মুখোশ উন্মোচন ও তাদের আটক করা হয়েছিল। গার্গের টিম তাদের পিছু নিয়েছিল কয়েক দিন ধরে, তাদের আসল পরিচয় উদ্ঘাটন করেছিল এবং নেপালের ভিতরে হামলা চালাতে ও সেই হামলার দায় ভারতের ওপর চাপাতে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত তাদের বৈঠকের বিস্তারিত জানতে পেরেছিল। অভিযানটা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন গার্গ।

ইতোমধ্যে ভারত সরকার নেপালের সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়েছিল। নেপালে ভারতবিরোধী তৎপরতা রোধে র-এর ভূমিকা ছিল সীমিত, তাছাড়া দেশটির নীতি যাতে ইসলামাবাদ ও বেইজিংয়ের অনুকূলে না হয়ে নতুন দিল্লির অনুকূলে হয় সেটা নিশ্চিত করতেও র-এর ভূমিকা বেশি ছিল না। যাই হোক, নতুন দিল্লি থেকে ১৯৭৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর মার্কিন দূতাবাসের একটি রিপোর্টে বলা হয়, ভারত-নেপাল সম্পর্কের অবনতি আরও খারাপ হতে পারে, কেননা নেপাল ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগ বেড়েই চলেছে।

নেপালকে ভারত নিজের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে গণ্য করে আসছিল সবসময়। সেখানে চীনাদের যেকোনও এস্টাবলিশমেন্টের অর্থ, নেপাল পাড়ি দিয়ে চীন সহজেই ভারতে ঢুকে পড়তে পারবে। কাঠমান্ডুর চীনা দূতাবাস ভারতের মাওবাদীদের সহযোগিতা করছে বলে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু ১৯৭৩ সালে মার্কিন বিশ্লেষকরা যখন মনে করেছিলেন, চীন-নেপাল সম্পর্ক নিয়ে ভারত তখনও সন্দিগ্ধ থাকলেও বাস্তবোচিত উপসংহারে পৌছান যেতে পারে যে, নেপালের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ক ও ক্রমবর্ধমান নেপালী জাতীয় ঐক্যের ফলে সেখানে অপেক্ষাকৃত সামান্য চীনা উপস্থিতি ভারতের ক্ষতি করতে পারবে না। নেপালী কংগ্রেসের মত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে আরও প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে ভারত চাপ প্রয়োগ করতেও সমর্থ হবে, অর্থনৈতিক যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকছে। যাই হোক, পাকিস্তানের প্রতি নেপালের নীরব সমর্থন ছিল এমন ক্ষেত্র যা ভারত-নেপাল সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে মার্কিন কর্মকর্তারাও মনে করতেন। মার্কিন কূটনীতিকদের একজন সাবেক নেপালী মন্ত্রী অবহিত করেছিলেন, একজন শীর্ষ স্থানীয় ভারতীয় কর্মকর্তা তাকে সাবধান করেছেন যে নেপালে যদি কখনও কোনও চীনা সেনা

ইউনিটকে আমন্ত্রণ জানান হয়, তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনী নেপাল দখল করে নেবে। এটা ছিল সেই সময় যখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালী কংগ্রেস নেতারা, নেপালের প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বি. পি. কৈরালা সহ, ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটা সহিংস বিপ্লবের পরিকল্পনা করছিলেন। ভারত কখনও এই নেতাদের ভারত থেকে চলে যেতে বাধ্য করেনি, সংসদীয় গণতন্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাসের কারণে।

নেপালে পাকিস্তানের উপস্থিতি ভারতকে উৎকণ্ঠিত করেছিল। পার্টিশনের স্মৃতি তখনও জীবন্ত ছিল, তাড়া করে ফিরছিল, এবং দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস সেই দিনই জন্ম নিয়েছিল যেদিন ব্রিটিশরা ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে যদিও পাকিস্তানের অনেকবার পরাজয় হয়েছিল, প্রতিবেশী দেশটিকে জখম করতে তারা প্রক্সি উপায় অবলম্বন করত, যেমন সন্ত্রাসী বাহিনী বিকাশে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা। নেপালে পাকিস্তানের অনুপ্রবেশ আরও তীব্র করে তুলেছিলেন প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জিয়া-উল-হক।

১৯৮৮ সালের অগাস্টে জিয়া-উল-হকের মৃত্যুর পর আইএসআই চিফ হামিদ গুল রাজা বীরেন্দ্রর রাজপ্রাসাদে আইএসআই-এর গোপন বৈঠক অব্যাহত রাখেন। ভারত সরকারকে র অবহিত করে, কাঠমান্ডুর রাস্তার প্রতিটা দোকান স্পন্সর করে আইএসআই, র পরে আরও জানায় যে জঙ্গী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কাশ্মিরীরা সেখানে বসত গেঁড়েছে ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় মদদদ দিতে। রাজা বীরেন্দ্র নেপালের গণতান্ত্রিক গ্রুপগুলোর তরফে বিপুল চাপের মুখে রয়েছেন, ওই গ্রুপগুলো রাজতন্ত্র বিলোপ ও গণতান্ত্রিক শাসনের দাবী জানাচ্ছিল। বীরেন্দ্র সন্দেহ করেন, এই অভ্যুত্থানে ভারতের ভূমিকা ছিল। ১৯৮৯ সালের মার্চে যখন ভারত-নেপাল বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তি শেষ হয়ে যায়, তিনি আর তা নবায়ন করেননি, যদিও ভারত সরকার বেশ কিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছিল। নেপাল অভিযোগ করেছিল, নেপালের ওপর ভারত অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের চেষ্টা করছে। যাই হোক, এমইএর নথিপত্র থেকে দেখা যায়, ভারত-নেপাল ট্রানজিট চুক্তি কার্যকর না থাকলেও রাক্সাউল ও জগবানি চেকপয়েন্ট দিয়ে এবং ভুটান ও বাংলাদেশ থেকে পৃথক ট্রানজিট রুট দিয়ে নেপালের পণ্য আমদানী নিশ্চিত করেছিল ভারত সরকার। এছাড়াও ত্রাণ প্যাকেজের অংশ

হিসেবে নেপালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নও অব্যাহত রেখেছিল।

র অফিসার সঞ্জয় অরোরা বলেন, কাঠমান্ডুর পরিস্থিতি ভারতের নিরাপত্তার দিক থেকে ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। রাজা বীরেন্দ্রকে তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, নেপালে আইএসআই ও কাশ্মিরী জঙ্গীদের উপস্থিতি ভারত ও নেপালের সম্পর্ককে গুরুতর ক্ষতি করতে পারে এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু ভারতের যুক্তি উপেক্ষা করেছিলেন রাজা।

অরোরা আমাকে বলেছিলেন: 'গণ-আন্দোলনে সমর্থন দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না। র-এর নেপাল ইউনিট কার্যক্রম চালাত লক্ষ্ণৌ থেকে, যোগ্য ও মেরুদণ্ড সম্বলিত নেপালী গণতান্ত্রিক নেতাদের নিরবচ্ছিন্ন সহযোগিতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই ইউনিট। কারণ সন্ত্রাসের কারখানা সমূলে উচ্ছেদ করতে তাদের দরকার ছিল। আমরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংকে জানিয়েছিলাম, ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে, যে আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী ভারতবিরোধী দুর্বৃত্তদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। র-এর সঙ্গে সিংয়ের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত শীতল, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমাদের সংস্থাটির ভূমিকা নিয়ে প্রচুর ভুল তথ্য রয়েছে। বলা হত যে আমরা ছিলাম বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, বাস্তবে আমরা সাহায্য করছিলাম গণতন্ত্রপন্থীদের। আইবি ও র উভয়ই মনে করেছিল, গণ-আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সীমান্তের দুদিকেই আমাদের আরও বেশি অ্যাসেট ও আড়িপাতার লোক দরকার ছিল।'

র-এর নেপাল ইউনিটের লক্ষ্ণৌ-ভিত্তিক অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার কর্মতৎপরতায় মুখরিত ছিল ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের জন্য একটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে অনেক নেপালী নেতা তাদের সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। এ ধরনের অপারেশন সম্পন্ন করতে হয় রাজনৈতিকভাবে, তাই নেপালের ব্যাপারে র অফিসারদের প্রতিটা সিদ্ধান্ত দিল্লির শীর্ষ নেতাদের কাছে পাঠান হত। অরোরা বলেন, আড়িপাতার চৌকিতে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন মনিটর করা হত। এসব জানান হত ফিল্ড এজেন্টদের, যাতে তারা গোপন অভিযানসহ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে। তার কথায়, 'অপারেশন ছিল নিখুঁত, সফলভাবে আইএসআই-এর

লোকদের ধরা হয়েছিল এবং গণতন্ত্রকে বাধা প্রদানকারী শক্তিকে নির্মূল করা হয়েছিল। এসব জোড়া উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা যেত শুধু গোপন অভিযানের মাধ্যমেই। আমি অপারেশনের খুঁটিনাটি ফাঁস করতে পারব না, কিন্তু নেপালের ভিতরে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থানরত অ্যাসেটদের নিয়ে একটা দর্শনীয় স্পাই মিশন চালিয়েছিলাম আমরা।'

একজন স্পাইয়ের সাংকেতিক নাম ছিল রবি এস. সিনহা। নেপালী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের মধ্যে অ্যাসেটদের বিকশিত করেছিলেন তিনি। অপারেশন মেচিতে তাদের সাহায্য দরকার হয়েছিল। গণ-আন্দোলনের জন্য সমর্থন সৃষ্টি করা ছিল ওই অপারেশনের লক্ষ্য। নেপালে রাজতন্ত্র অবসানের আন্দোলনে নেপথ্যের চালিকা শক্তি ছিলেন তিনি। ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর শক্তিকে নেপালের মাটি ব্যবহার করতে দিচ্ছিল এই রাজতন্ত্র। সিনহা বলেন, তার নেপালী সোর্সদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছিলেন তিনি, পাকিস্তানের ছলচাতুরি সম্পর্কে এবং দেশের পরিচ্ছন্নতার চেয়ে স্ট্যাটাস কুও বজায় রাখতে বেশি আগ্রহী ছিল রাজতন্ত্র সেটা বোঝান হয়েছিল এসব বৈঠকে। অ্যাসেটদের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টিও ব্যাখ্যা করেন তিনি।

'কর্মসূত্রের সম্পর্কের চেয়েও তা ছিল বেশি,' তিনি বলেন। 'প্রথম দিকে কেউ কেউ অংশ নিতে চাননি, নেপাল যে গোলমালে পড়তে চলেছে তা বোঝার জন্য আমি তাদের সময় নিতে বলেছিলাম। আমি তাদের এও সতর্ক করেছিলাম যে, নেপাল ওই ধরনের সরকারের কবলে পড়বে আর জঙ্গীদের প্রতি সমর্থন হয়তো বিপরীত ফল বয়ে আনবে। তারা নেপালের দুটো প্রধান শহর কাঠমান্ডু ও পোখারায় ঘনায়মান সংকট দেখতে পেয়েছিলেন, এবং শত্রুদের চেয়ে এক পা এগিয়ে থাকতে তারা আমাদের সাহায্য করেছিলেন অনেক বছর ধরে। দুর্ভাগ্যবশত গত কয়েক বছরে আমাদের কৌশলবিদরা এই অ্যাসেটদের বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেনি।'

১৯৯০ সালের এপ্রিলে যখন সংঘাত বন্ধ হয়, কয়েক মাসের সহিংসতার পর, কৃষ্ণ প্রসাদ ভট্টরাইয়ের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতাসীন হয় কাঠমান্ডুতে। ভারতীয় গুপ্তচর মহল তাকে সানুরাগে 'কেপি' বলে সম্বোধন করত। সে বছর জুনে তিনি দিল্লি সফর করেন। আশ্বাস দেন, ভারতের সঙ্গে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা শুরু করতে সব রকম উদ্যোগ নেবেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দেন, ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে এমন কোনও

তৎপরতা নেপালের ভুখণ্ডে চলতে দেয়া হবে না। প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অগ্রীম আলোচনারও আশ্বাস দেন ভারত সরকারকে। ১৯৯০ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী হন চন্দ্র শেখর এবং ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নেপাল সফর করেন। সেখানে তিনি নেপালী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। চন্দ্র শেখর প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য একটা উচ্চ-পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে, সেটা কাজ করবে ভারত-নেপাল জয়েন্ট কমিশনের পথনির্দেশনায়। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন যুগ শুরু করতে উভয় পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। উন্নয়ন কর্মসূচী যথাসময়ে সম্পূর্ণ করতে নেপালকে অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের সুবিধা দিতে তখন কার্পণ্য করেনি ভারত। ১৯৯১ সালের মে মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জি. পি. কৈরালা এবং এক মাস পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন পি. ভি. নরসিমা রাও। এমইএ নথিতে বলা হয়, জি. পি. কৈরালা ডিসেম্বরে নরসিমা রাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নতুন দিল্লিতে। দুই পক্ষের মধ্যে চার মাস আলোচনার পর এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের মত একটা ভারত-নেপাল হাই-লেভেল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়, চেয়ারম্যান হন কেবিনেট সেক্রেটারি। তার সঙ্গে থাকেন পররাষ্ট্র সচিব, অর্থ সচিব ও বাণিজ্য সচিব। এই টাস্ক ফোর্স দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একটা ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়ন করে। এমইএর মতে, নেপাল ও ভারতের মধ্যে এ ধরনের কর্মকাণ্ড ছিল এটাই প্রথম। দুই দেশের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্নভাবে উন্নত হচ্ছিল নরসিমা রাও সরকারের প্রথম বছরে। যদিও নিরাপত্তার ফ্রন্টে আইএসআই ও কাশ্মিরী জঙ্গীদের নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হচ্ছিল।

প্রবীণ স্পাইরা মনে করেন, কাশ্মিরী ও খালিস্তানী উগ্রপন্থীদের সাহায্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রাজা বীরেন্দ্র, ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের লঞ্চ প্যাডে পরিণত করেছিলেন নেপালকে। ভারতীয় এজেন্ট বিপিন গোবিন্দ তেরাই অঞ্চলের ছোট ছোট শহরগুলোয় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কাঠমান্ডু সহ নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে কাশ্মিরী জঙ্গীদের পুনর্বাসিত করার ছক আঁকতে অনুষ্ঠিত মুসলিম নেতাদের বিভিন্ন বৈঠকের তথ্য সংগ্রহ করতেন তিনি। তার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে হুলস্থূল পড়ে যেত নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের ভিতরে। গোবিন্দ আরও লক্ষ্য করেছিলেন, উগ্রবাদীদের মধ্যে প্রপাগান্ডা চালান হত, নেপালে কিছু সময় কাটিয়ে জিহাদের জন্য তাদের ভারতে ফিরে যেতে উৎসাহ দেয়া হত।

‘একটা গোটা এলাকা ছিল যেটার নাম দিয়েছিলাম আমরা কাশ্মিরী বাজার। এখানকার প্রতিটা কাশ্মিরী ছিল এক-একটা স্লিপার সেলের অংশ, তারা রাজার লোকদের নিরঙ্কুশ সহযোগিতা পেত,’ গোবিন্দ আমাকে বলেন। ‘এসব লোকের বিরুদ্ধে রাজাকে প্রভাবিত করার সুযোগ ছিল, কিন্তু তেরাইয়ের মুসলিম নেতাদের প্রপাগান্ডায় তিনি ছিলেন অন্ধ। দেশটা ছিল ছোট, তার অহংকার ছিল বিশাল। প্রকাশ্য অভিযান চালান সহজ ছিল না যখন চক্রান্তকারীরা রাষ্ট্রের মদদ পাচ্ছিল। আমাদের কয়েকটা অভিযানের লক্ষ্য ছিল, উগ্রবাদীদের পরিকল্পনা কার্যকর করার আগেই তা নস্যাৎ করে দেয়া।’

তেরাই ও কাঠমান্ডুতে র যখন কাশ্মিরী জঙ্গীদের নিকটবর্তী হচ্ছিল, মুসলিম নেতারা তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতার ক্যামোফ্লেজ হিসেবে নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছিল। প্রচণ্ড চাপের এই পরিবেশে র একজন ছদ্মবেশী গুপ্তচরকে মোতায়েন করে যার সাংকেতিক নাম ছিল সাজিদ। অনন্তনাগে জন্মগ্রহণকারী সাজিদের কাজ ছিল কাশ্মিরী সংশ্লিষ্ট সংগঠনে অনুপ্রবেশ করা এবং জঙ্গীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করা। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে সাজিদ যখন তার এস্পিওনাজ অপারেশন শুরু করেন, দুজন ক্ষমতাধর কাশ্মিরী জঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। এর ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য পেতে সক্ষম হন তিনি, সেই সঙ্গে এসব গ্রুপকে ধ্বংস করতেও কাজ করে যান। কাশ্মিরীপন্থী সংগঠনগুলোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেইলস চুরি করেছিলেন তিনি এবং প্রতিপক্ষ গ্রুপগুলোর মধ্যে হিংসা ও ক্রোধ সৃষ্টি করতে তা কাজে লাগিয়েছিলেন। যুগপৎ তিনি জঙ্গীদের আগমন ও প্রস্থানের বার্তা পাঠাতেন নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কাছে, সংস্থাগুলোর গোপন অভিযানে তা কাজে লাগত। সাজিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করা হয়েছিল। একাই কাজ করতেন সাজিদ। তার দেয়া তথ্য ছিল র-এর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। শত্রুর এলাকার ভিতরে কাজ করতেন, ইস্পাতের স্নায়ু অর্জন করতে হয়েছিল তাকে।

গোবিন্দের কথায়, ‘তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী চালবাজ এবং একজন প্রতিভাবান অপারেটিভ। সাহসী ও নির্ভরযোগ্য। সাজিদ কাজ করেছিলেন এক বছরেরও বেশি সময়। আমার বিশ্বাস, তারই অবদানের ফলে কাশ্মিরে অন্তত একশো সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি সফলভাবে কয়েকটি গ্রুপের ভিতর ফাটল ধরাতে পেরেছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নেপালে আমাদের ছিল একশোরও বেশি স্পাই ও ইনফর্মার, কিন্তু সাজিদ ছিলেন স্পাইদের রাজা।’

আন্ডারওয়ার্ল্ড ও মুজাহিদীনের আগমন

১৯৯৩ সালে বোম্বাইতে বোমা বিস্ফোরণের ঠিক আগে দুবাইতে পালিয়ে যান দাউদ ইব্রাহিম। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে এই সময় সম্পর্ক মজবুত করছিল ভারত। বোম্বাইতে ক্রমিক বোমা বিস্ফোরণের কয়েক মাস পর আবু ধাবিতে ভারত-আমিরাত জয়েন্ট কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বিস্ফোরণগুলোয় নিহত হয়েছিল আড়াইশোরও বেশি মানুষ। নেপাল ফ্রন্টে সে দেশের সরকারের পাশাপাশি রাজার সঙ্গেও কাজ করছিল ভারত। রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেবকে নতুন দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। এই দুটি ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, কারণ দাউদ দুবাইতে চলে যাওয়ায় কাঠমান্ডু-দুবাই আন্ডারওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক সংযুক্ত হয়েছিল এবং নেপালে ঘাঁটি মজবুত করতে আইএসআইকে সাহায্য করেছিল। মির্জা দিলশাদ বেগ ছিলেন একজন নেপালী পার্লামেন্টারিয়ান, তার মধ্যে একজন বিশ্বাসী বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছিলেন দাউদ। পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলোর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল মির্জার। এমনকি নেপালে সেফ হাউজ স্থাপন করতেও তাদের সাহায্য করেছিলেন তিনি। মূলত তিনি ছিলেন গোরখপুরের লোক। সেখান থেকে এসেছিলেন নেপালের কপিলবাস্তুতে। তারপর নেপালী পার্লামেন্টে। ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সালে পর পর দুইবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। সে সময় ভারত উত্তম সম্পর্ক গড়ে তুলছিল জি. পি. কৈরালার সরকারের সঙ্গে, কিন্তু ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাগুলো মির্জা ও আইএসআই-এর মধ্যে ক্রমশ গভীর হতে থাকা বন্ধন সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারেনি। কাঠমান্ডু ও পোখারায় আন্ডারওয়ার্ল্ড কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল শাস্তির আশঙ্কা ছাড়াই, যদিও সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিল র যে ভারতবিরোধী অপারেশন চালাতে নেপালে চোরাচালানী, সন্ত্রাসবাদী ও মানব পাচারকারীদের একটা নেটওয়ার্ক গড়ার চেষ্টা করছে বিভিন্ন সেল। দিবাকর শর্মা ছদ্মনামের একজন গুপ্তচর বলেন, ১৯৯৬ সালের জুনে নেপালের পররাষ্ট্র সচিব কে. বি. শ্রেষ্ঠার দিল্লি সফরকালে ভারতীয় পক্ষ আন্ডারওয়ার্ল্ডের বিষয়টি উত্থাপন করে এবং পরিষ্কার করে দেয় যে প্রতিবেশী দেশ থেকে ভারতবিরোধী তৎপরতা সহ্য করা হবে না। যাই হোক, সরকারকে র অবহিত করে যে নেপালের বিভিন্ন শহরে শক্তি সঞ্চয় করছে নেটওয়ার্ক এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে।

'নেপালের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ, ইন্টেলিজেন্স শাখা সহ, তখনও শেখার পর্যায়ে ছিল,' দিবাকর বলেন। 'সন্ত্রাসবাদীদের প্রধান টার্গেট ছিল

ভারত, নেপাল নয়, সেই কারণে নেপালীরা জানত না নেপালের ভূমিতে আন্ডারওয়ার্ল্ড সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকাণ্ড চালাতে দিলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে। আমাদের অ্যাকশন যদিও বড় ধরনের ছিল, কিন্তু আমরা স্থানীয় সমর্থন পাচ্ছিলাম না এবং তাতে আমাদের জন্য বিরাট সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তার মূল্য আমরা দিয়েছি ১৯৯৯ সালে।'

১৯৯৯ সালে সেপ্টেম্বরে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী যশবন্ত সিং কাঠমান্ডুতে ছিলেন সরকারী সফরে। দুই দেশ যখন আবারও অঙ্গীকার নিশ্চিত করছিল যে তাদের ভূমি অন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন কোনও কাজে ব্যবহার করতে দেয়া হবে না, সিং তখন অরক্ষিত সীমান্ত চিহ্নিত করার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন, কারণ সীমান্তের ওই জায়গাগুলো চোরাচালানী ও সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। ভারত তখন সবেমাত্র কারগিল যুদ্ধ থেকে উঠে এসেছিল, এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রাজেশ মিশ্রর অধীনে সরকারের মনোযোগ তখন প্রতিবেশী দেশটির হাঙ্গামা নিরসন নিশ্চিত করা। দুই মাস পর, ১৯৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর, একশো আটাত্তরজন যাত্রী ও এগারজন ক্রু নিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আইসি ৮১৪ নতুন দিল্লির উদ্দেশে কাঠমান্ডু থেকে যাত্রা শুরু করে। বিমানটিকে ছিনতাই করে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা। মওলানা মাসুদ আজহার সহ তিনজন কারাবন্দী উগ্রপন্থীর বিনিময়ে পণবন্দী বিমান-আরোহীদের মুক্তি দেয়া হয় ৩১শে ডিসেম্বর। এ ঘটনায় পূর্ব-সতর্কতা জারির অভাব কেন হয়েছিল সে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। দুই মাস পর জানা গিয়েছিল, সন্ত্রাসী চক্রান্ত সম্পর্কে কাঠমান্ডুর একজন র অপারেটিভ তার সিনিয়রকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু তার সেই মেমোরেন্ডাম কখনই পাঠান হয়নি নতুন দিল্লিতে।

'আমরা জানতে পারি, সন্ত্রাসীদের বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে রিপোর্ট নথিভুক্ত করায় র অফিসারকে নাজেহাল করা হয়েছিল। তার সিনিয়র খুবই নাখোশ হয়েছিল আর সেই রিপোর্ট রেখে দিয়েছিল ড্রয়ারে। পরবর্তী অ্যাকশন নিতে সেটা আর কখনই সদরদপ্তরে পাঠান হয়নি। সুতরাং আমরা ঘুমাচ্ছিলাম না। কিন্তু সময় আসে যখন আপনি কিছুই করতে পারবেন না ভবিষ্যত ঘটনার নির্ভুল তথ্য হাতে পাওয়া সত্ত্বেও। আইসি ৮১৪ ছিনতাই ছিল তেমনই একটা দৃষ্টান্ত,' দিবাকর বলেন।

যাই হোক না কেন, আইসি ৮১৪ ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভারত সরকার নেপালের নিরাপত্তা বিভাগের ছিদ্র অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করে এবং অসংখ্য ছিদ্রের সন্ধান পায়। যা ঠেলে দিয়েছিল কার্গিল যুদ্ধের দিকে সেই গোয়েন্দা

তথ্যের ব্যর্থতার পর এবং তার পরপরই কার্গিল রিভিউ কমিটি প্রদত্ত রিপোর্টের কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একটা গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স (জিওএম) গঠন করেন। ২০০০ সালের ১৭ই এপ্রিল গঠিত ওই জিওএমের কাজ ছিল জাতীয় নিরাপত্তা পদ্ধতি খতিয়ে দেখা। এর প্রধান ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আডভানি। অন্য সদস্যরা ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ, পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী যশবন্ত সিং ও অর্থ মন্ত্রী ইয়াশবন্ত সিং। বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব ছিল কমিটির। জিওএম উপসংহারে পৌঁছয়, যে নেপালে নতুন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে আইএসআই। তারা আরও জানান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার গতিশীল প্রকৃতির কারণে ভারত-নেপাল সীমান্ত কিছু কাল ধরে বদলে গিয়েছিল। উন্মুক্ত সীমান্ত এক সময় ছিল শান্তিপূর্ণ ও সমস্যামুক্ত, কিন্তু নেপালে আইএসআই-এর ক্রমবর্ধমান তৎপরতায় সীমান্তের প্রকৃতি পুরোপুরি বদলে গেছে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিরাপত্তার দিকে অবিলম্বে জরুরিভাবে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

মওলানা আজহার মুক্তি পাওয়ার পর একটা সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করেন জায়িশ-ই-মোহাম্মদ নামে। এর লক্ষ্য ছিল কাশ্মিরকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা। র-এর সন্দেহ, এই দলের গভীর সংযোগ ছিল নেপালে। ছায়াযুদ্ধ চালান হচ্ছিল দুটো ফ্রন্টে–সন্ত্রাসবাদী ও স্লিপার সেল ধ্বংস করা এবং মাওবাদী আন্দোলনের ভয়াবহ বিপদ মোকাবেলায় নেপালকে সাহায্য করা। অবকাঠামো ধ্বংস করার জন্য এই আন্দোলন হিট স্কোয়াড ব্যবহার করছিল এবং ভারতীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছিল।

মাওবাদীদের প্রকাশ্য নেতারা যদিও অবিশ্বাস্য রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে। নির্মল খত্রী সাংকেতিক নামের একজন এজেন্ট সংগ্রহকারী বলেন, ক্যাডারদের সবাইকেই তারা চিনতেন। খত্রী ও কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ অভিযানের কাজে লাগানোর জন্য ক্যাডারদের ভিতর থেকে অ্যাসেট সংগ্রহ করতেন। কিন্তু ২০০০–২০০১ সালের মধ্যে কোনও সময়ে সবকিছু স্রেফ ভেঙে পড়েছিল। এর বড় কারণ ছিল সরকারের একমুখী নীতি। এতে মনে করা হত, শুধুমাত্র নেপালী কংগ্রেসকে সমর্থন দেয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং নেপালিজ মার্ক্সিস্টদের বিকশিত করা থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। খত্রীর কথায়, 'মার্ক্সিস্টদের মধ্যে আমরা নেটওয়ার্ক প্রসারিত না করার ফলে ভারতের প্রতি শত্রুতা শুরু হয়েছিল।'

খত্রী বলেন, র যখন মাওবাদী নেতৃত্বকে সমর্থন দেয়ার পক্ষে ছিল দৃঢ়ভাবে, তখন অটল বিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার এ বিষয়ে নিয়েছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ এমনকি অন রেকর্ডে বলেছিলেন, 'নেপালী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে ভারতেরও লড়াই।' এটা বিচলিত করেছিল অসংখ্য মাওবাদী নেতাকে, যারা গোপন সাহায্য পেয়ে আসছিলেন র-এর কাছ থেকে।

প্রতিবেশী দেশটিতে র-কে একটা যুদ্ধ করতে হচ্ছিল সিআইএর সঙ্গেও। উইকিলিক্সের ২০০৩ সালের একটা তারবার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে খত্রী বলেন, ভারত অসাবধানতাবশত কিছু জায়গা খুইয়েছিল ওই অঞ্চলে তৎপর অন্যান্য শক্তিগুলোর কাছে, মার্কিন সরকার সেই জায়গাগুলো দখলে নেয়ার চেষ্টা করছিল। গোপন তারবার্তাটি ড্রাফ্‌ট করেছিলেন নেপালে নিযুক্ত তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলানোস্কি। এর কয়েক মাস পর র অফিসার রবিন্দর সিংকে স্বপক্ষ ত্যাগ করে দলে ভিড়িয়ে নিতে সফল হয়েছিল সিআইএ। তারবার্তায় তুলে ধরা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের হতাশা ও নেপালে প্রতি ভারতের অনমনীয় নীতি। তারবার্তায় বলা হয়:

> *৩রা ডিসেম্বর (২০০৩) ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্যাম সরনের সামনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিছু রিপোর্ট তুলে ধরেন, যাতে বলা হয়েছে কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাসে নিযুক্ত ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা নেপালে মার্কিন সরকারের নীতি ও অভিপ্রায়কে এভাবে চিহ্নিত করে আসছে যে বিদ্বেষপরায়ণভাবে সেই নীতির লক্ষ্য হচ্ছে নেপালের সার্বভৌমত্ব খর্ব করা। সরনকে রাষ্ট্রদূত বলেন, রিপোর্টগুলো আমাদের কাছে এসেছে বেশ কিছু নেপালী রাজনৈতিক সূত্র থেকে, যারা দাবী করেছে যে ভারতীয় দূতাবাস ভিত্তিক র এজেন্টদের সঙ্গে সম্প্রতি তাদের ওই ধরনের আলাপচারিতা হয়েছে। তিনি সরনকে আরও ব্রিফ করেন, অপ্রমাণিত রিপোর্ট থেকে জানা গেছে কিছু নেপালী মাওবাদী নারীকে উত্তর ভারতের দেরাদুনে একটা নিরাপত্তা স্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সরকারের ভিতরকার ও বিরোধী দলভুক্ত উভয় পক্ষের নেপালীরাই কখনও কখনও ভারতীয় ও মার্কিন স্বার্থ নিয়ে খেলা করে, এ কথা উল্লেখ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এসব সোর্সের দেয়া তথ্য যাচাই করা হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন, কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল ইউনাইটেড মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট দলের সাধারণ সম্পাদক মাধব নেপাল ও নেপালী মাওবাদীদের মধ্যে লক্ষ্ণৌতে বৈঠক হয়েছে বলে*

*রিপোর্টে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত জোর দিয়ে বলেন, তিনি এ ব্যাপারে সরনের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বন্ধু ও মিত্র হিসেবে। ৩০শে নভেম্বর পৃথক এক বৈঠকে রাষ্ট্রদূতকে সরন নতুন দিল্লির সদ্য-গৃহীত নীতি সম্পর্কে ব্রিফ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারতের মধ্যে বিদ্রোহীদের সম্ভাব্য উপচে পড়ার ব্যাপারে তার আলোচনাকারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সরন উল্লেখ করেন, সরকারের ভিতরকার নির্দিষ্ট মহল আহ্বান জানিয়েছে যে মাওবাদীদের ওপর প্রভাব রাখতে তাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বজায় রাখা উচিৎ, এবং মাওবাদীদের ক্ষমতা দখলের মত সবচেয়ে খারাপ ঘটনার ক্ষেত্রেও যোগাযোগের চ্যানেল খোলা রাখা উচিৎ। আমরা এই সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারি না যে আমাদের নেপালী সূত্রগুলো ভারতের দ্বৈত আচরণের রিপোর্ট আমাদের দিয়েছে তাদের নিজস্ব অভিপ্রায় থেকে, যারা অনেকেই তাদের দেশে ভারতের প্রভাবে ক্ষুব্ধ। আমরা সবসময়ই সরনকে পেশাদার ও সহযোগিতাপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, এবং মনে করি তিনি নেপালে র-এর সকল তৎপরতা অনুমোদন করেন না এবং সম্ভবত তাদের ব্যাপারে অবগতও নন। তার স্বীকারোক্তি যে ভারত সরকারের কিছু ব্যক্তি 'নিজের পথে চলছে' এবং কিছু ব্যক্তি মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছে, এ কথায় তিনি আমাদের কাছে প্রথম স্বীকার করলেন যে তার দূতাবাসের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা হয়তো ভারত সরকারের নীতিকে দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে।*

নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা বিভাজন সম্পর্কে এই তারবার্তা যদিও স্ব-ব্যাখ্যামূলক, খত্রী বলেন যে ২০০০ সালের প্রথম দিকে নেপালে ক্ষোভের একটা চোরাস্রোত বইছিল জোরালভাবে, সেটা এই অনুভূতির কারণে যে ভারত কখনই নেপালকে সমৃদ্ধ হতে দেবে না। জনমনে এ ধরনের ভাবনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল শীর্ষ নেতাদের ভারতের অ্যাসেট করে নেয়ার ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের অনীহা এবং নেপালী রাজনীতির ভারতপন্থী অংশটির প্রতি পরস্পরবিরোধী আচরণ করা। আংশিকভাবে এর আরও কারণ ছিল নেপালী মাওবাদীদের নির্দিষ্ট অংশের ও পাকিস্তানি অপারেটিভদের তীব্র ভারতবিরোধী প্রপাগান্ডা।

এই ভাবনা ছিল ভুল, কেননা যথেষ্ট করেছিল ভারত। কিন্তু ভারতবিরোধী অংশগুলোর সৃষ্ট বিপুল প্রতারণা ছিল বেশি দৃশ্যমান। ভারতের প্রতি নেপালী

মাওবাদীদের মনোভাবের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। খত্রীর মতে, অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অল নেপালী ইউনিটি সোসাইটি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিল না। এই সংগঠনটি ছিল নেপালে মাওবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক ফ্রন্ট। সংগঠনটি ভারতে সক্রিয় ছিল এবং এর রাজনৈতিক নেতারা মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ করতে সমর্থন খুঁজছিলেন। কিন্তু নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে বাজপেয়ী সরকার শুধু যে এই দলটিকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিল তাই নয়, এর নেতাদেরও আটক করেছিল, যার মধ্যে ছিলেন মহেশ্বর দাহাল ও পার্থ ছেত্রী, ২০০২ সালের জুলাই মাসে যখন তারা দিল্লিতে ছিলেন। সরকারের নেপাল সংক্রান্ত কয়েকটি আলোচনায় একজন র অফিসার উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, বিপুল সংখ্যক আইএসআই অফিসার কূটনৈতিক আবরণে নেপালে অবস্থান করছিল, তারা আশ্রয় দিয়েছিল পাকিস্তানি চরমপন্থীদের, কার্যক্রম চালাচ্ছিল নেপালের মাটিতে থেকে, এটা সঠিক তথ্য হলেও তৃতীয় দেশের লোককে সমর্পণ করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল না নেপাল। তিনি বলেন, ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পারস্পরিক আইন সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে এক বৈঠককালে নেপালের অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানি চরমপন্থীদের দেশ থেকে বের করে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন নেপালী কর্মকর্তারা এবং ভারতীয় তদন্তকারীদের প্রবেশাধিকারের যে দাবী ভারত করছিল তাতেও তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক ফ্রন্টে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য রাজা জ্ঞানেন্দ্রর ওপর চাপ দিতে শুরু করেছিল ভারত। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে দহরম-মহরমে লিপ্ত নেতাদের বেশ কয়েকটি দল ইতোমধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এর মধ্যে রয়্যাল নেপালিজ আর্মির একটা অনুরোধ রক্ষা করছিল ভারত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে এবং ভারতে লুকিয়ে থাকা নেপালী মাওবাদী নেতাদের হস্তান্তর করছিল তাদের কাছে। এমনকি যারা চিকিৎসার জন্য এসেছিল তাদেরও। ভারতকে এর মূল্য দিতে হয়েছিল যখন রাজা জ্ঞানেন্দ্র, ২০০৫ সালে ক্ষমতা দখলের পর, ভারতের শত্রুতে পরিণত হন। রাজা দুই পক্ষেই খেলছিলেন। দেশে তিনি গোপনে আলোচনা করতেন মাওবাদীদের সঙ্গে, অথচ ওই আন্দোলনের নেতাদের ধরে দিতে বলতেন ভারতকে। নেপালে গণতন্ত্রের জন্য ভারতের আকাঙ্ক্ষায় তিনি আরও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং মনে করতেন ভারত তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে যেহেতু সে রাজতন্ত্রের বদলে

গণতন্ত্র পছন্দ করে। তিনি এত বেশি ভারতবিরোধী ছিলেন যে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম সরন অন রেকর্ডে বলেছিলেন, ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছেন রাজা।

নেপালী মাওবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে ভারত যখন অভিযান চালাচ্ছিল, তখন অভিযোগ করেছিল যে দেশে লাল বাহিনীকে শক্তি জোগাচ্ছেন রাজা জ্ঞানেন্দ্র। নেপালী ও ভারতীয় নকশালদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা বিষয়ক এই হুশিয়ারির তিরস্কার জুটেছিল জ্ঞানেন্দ্রর প্রাসাদ থেকে। সেটা ভারতের জন্য বিশাল বিব্রতকর ছিল বলে মনে করতেন র অফিসাররা। সরন অধিক জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'যা ঘটছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্যও এমনকি আমরা নেপাল সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার কোনও পথ পাচ্ছি না।'

খত্রী বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে জনমনে একটা বোধ লালিত হয়ে আসছিল যে নেপালের সমস্যার মূল কারণ ভারত। একেবারে শুরু থেকেই নেপালের প্রতি আমরা দূরদৃষ্টিহীন নীতি নিয়েছি। রাজতন্ত্রপন্থী, যাদের আমরা নেপালী গোষ্ঠীশাসক বলে আখ্যায়িত করতে অভ্যস্ত ছিলাম, আর মাওবাদীদের আমরা সহযোগিতা দিইনি, এই সুযোগ নিয়েছে আইএসআই ও চীন, পক্ষ নিতে তৈরি বিপুল সংখ্যক অ্যাসেটকে তারা দলে ভিড়িয়ে নিয়েছে। আমাদের প্রতি নেপালের শত্রুতা বৈশ্বিক সংবাদে পরিণত হয়েছিল যখন আমরা নেপালকে দেয়া আমাদের ত্রাণের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরতে শুরু করি। এমনকি বিদেশে নিযুক্ত আমাদের একজন নেপালী অ্যাসেটও অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। এই ছিল খারাপ গণতন্ত্রের ফল। দুই দশক আগেও যাদের র-এর অ্যাসেট বলে বিবেচনা করা হয়েছিল এমন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বর্তমান নেপালী বিধানের নির্বাহী পজিশনে রয়েছেন এখন। প্রয়োজনের সময় র তাদের সাহায্য করেনি, সে কথা তারা ভুলে যাননি।'

২০০৫ সালের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবাকে বরখাস্ত করেন রাজা জ্ঞানেন্দ্র এবং রাজ্যের নিরঙ্কুশ শাসকে পরিণত হন। সে সময় ভারত সরকারের মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। গণতন্ত্রের মধ্যে রাজার ক্ষমতায় ঘোরতর আপত্তি ছিল র অফিসারদের। মনমোহন সিংয়ের সরকার যখন জ্ঞানেন্দ্রর হাতেই ভেটো ক্ষমতা রেখে দেয়ার চেষ্টা করেছিল, র সতর্ক করে দিয়েছিল যে ভারত যদি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী চায় তাহলে রাজতন্ত্রকে বিদায় করতে হবে। চীনাদের লালন-পালন শুরু করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্র। র-এর একটি ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের মতে, তিনি

চীনাদের সঙ্গে বিশাল অস্ত্র চুক্তি করেছিলেন, ভারতীয় বিড উপেক্ষা করে। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়, অন্যান্য সেক্টরে আরও কিছু চুক্তির ফলে জ্ঞানেন্দ্রর আত্মীয়-স্বজনদের লাভবান হওয়ার অভিযোগ রয়েছে, যেমন মোবাইল টেকনোলজি।

কিন্তু নেপালের প্রতি নিজের আচরণ পুনর্মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারত। হিমালয়ের রাজ্যটিকে ছেড়ে দিয়েছিল নাগালের বাইরে।

### সন্ত্রাসবাদীদের সেফ হাউজ নেপাল

অবিরাম ইন্ডিয়ান মুজাহিদীনের পিছু ধাওয়াকারী ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা বলেন, প্রতিবেশী দেশটিতে চালান তাদের স্পাই মিশন থেকে এই আশঙ্কা নিশ্চিত হয় যে নেপালের ছোট ছোট গ্রাম আর শহরগুলো ভারত থেকে পলাতক সন্ত্রাসী চক্রের সেফ হাউজে পরিণত হচ্ছিল। নেপালের ভিতরকার সন্দেহভাজন সমর্থকদের ফোন নম্বর ট্র্যাক ও ইন্টারসেপ্ট করতে শুরু করেছিল র ২০০৮ সালে। আমি একটা ইন্টেলিজেন্স নোট দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, নেপালে সন্ত্রাসী সেলের দ্বৈত জীবনের কথা তুলে ধরা হয়েছিল ওই নোটে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে বাটলা হাউজ সংঘর্ষের পরপরই আরিজ খান ওরফে জুনাইদ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ইন্টেলিজেন্স নোটে বলা হয়, সে আলীগড়ে পৌছায় এবং মাসুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, পুলিশের ক্র্যাকডাউন সম্পর্কে ব্রিফ করে এবং কিছু আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে শাহ্জাদের সঙ্গে মিলে জুনাইদ যাতায়াত করে মুম্বাই, যোধপুর, নয়ডা ও মুজাফ্ফরনগরের মধ্যে। এই জুটি সফর করে ইউপির আজমগড়ে, জুনাইদ পরে চালে যায় কাটিয়ার ও জগবানিতে, সেখানে সে ভারত-নেপাল সীমান্ত অতিক্রম করে। একটা ট্যাক্সি সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল, সেটার ব্যবস্থা করেছিল নিজাম খান। জুনাইদ যখন বিরাট নগরে পৌছয়, কার্সিয়া রোডে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেয় খান এবং মোহাম্মদ সালিম নামে তাকে একটা নাগরিকত্বের কার্ড ও পাসপোর্ট জোগাড় করে দেয়, তাতে তার পিতার নাম ছিল নূর মোহাম্মদ এবং ঠিকানা ওয়ার্ড নম্বর ১৮, বিরাট নগর, নেপাল। তখন সে একজন নেপালী নাগরিক।

২০০৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে নিয়মিত মাদ্রাসায় যেত জুনাইদ। ২০০৯ সালে সে দুই মাস ছিল ঘুস্কিতে, হিলাল পাবলিক স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজ করত। গোয়েন্দা সূত্রগুলো জানতে পেরেছিল, স্কুলটি চালাত ইসলামী সংঘ নেপাল, যারা দাবী করতে সংঘটি গঠিত হয়েছে ১৯৮৫ সালে, ইসলামের

সামগ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করতে। সংগঠনটি র-এর রাডারে ছিল, কিন্তু আইএসআই-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে বেশি কিছু জানা ছিল না। র স্পাইদের ধারণা, ইসলামী সংঘ নেপাল দাতব্য কাজের ভিতর দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগিতা করত। নিজাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এই সংগঠনের সঙ্গে এবং এর কর্মকাণ্ডে অংশ নিত। জুনাইদ ২০০৯ সালটা কাটায় নেপালের কাওয়াসতি ও পাল্পায়। ২০১০ সালের শুরুর দিকে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় প্রবীণ ইন্ডিয়ান মুজাহিদীন নেতা আবদুল সুবহান ওরফে তওকীরের সঙ্গে। বাটলা হাউজ সংঘর্ষের পর এসআইএমআই ও আইএম-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর কারণে ভারত থেকে তওকীর পালিয়ে এসেছিল। তাকেও নিজাম খান জায়গা করে দিয়েছিল গোর্খা সিটিতে। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে বলা হয়:

> *২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে আবদুল হাকিমের মোবাইল ফোনে আবদুল সুবহানের সঙ্গে কথা বলেছিল জুনাইদ। বৈঠক হয় গোর্খা সিটিতে এবং পরবর্তী তিন থেকে চার মাসের জন্য জুনাইদ তার ঘাঁটি বদল করে। পরবর্তীকালে সে আহ্‌লে গ্রামে যায় এবং একটা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করে। ২০১০ সালের জুলাই মাসে জুনাইদ ফিরে আসে গোর্খা সিটিতে, একটা রেস্তোরাঁ চালু করে। তার অংশীদার ও আইএম সন্ত্রাসবাদী তওকীরের সঙ্গে তাবলিগী জামাতের বিবাদ দেখা দেয়ার পর সেটা বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্ত্রাসবাদীরা ঘাঁটি বদল করে কাঠমান্ডুতে। পরে জুনাইদ চলে আসে পাচেরায়, বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয় প্যারাডাইস পাবলিক একাডেমিতে, সেখানে থাকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময়ে সে বিয়েও করে, একজন ধর্মান্তরিত সদ্য বিধবাকে। বছরের শেষ দিকে জুনাইদ একটা নতুন পাসপোর্ট পায় জালালদীন মিয়ার সহায়তায়। কাঠমান্ডুর তাজ বেকারির কাছে মিয়ার একটা ট্রাভেল এজেন্সি ছিল। ২০১৫ সালের ১০ই জানুয়ারি জুনাইদ ও তওকীর সৌদি আরবগামী বিমানের একটি ফ্লাইট ধরে। তারা ভিসা জোগাড় করেছিল পান্ডা সুপারমার্কেট চেইনের মাধ্যমে। দাম্মামে তারা দুই বছর কাজ করে। সে কাজ করত পান্ডা (৪০১) ইবনে-খালদুন প্লাজায়। থাকত সুক আল-গানামে পান্ডা এমপ্লয়িজ ভিলায়। সৌদি আরবে জুনাইদ ও তওকীর গিয়েছিল তরুণদের রিক্রুট করার স্কাউটিং করতে, কিন্তু কোনও কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি। ২০১৭ সালের ২২শে মার্চ পাচেরায় ফিরে আসে জুনাইদ,*

শিক্ষকতা শুরু করে প্যারাডাউস পাবলিক স্কুলে। ২০১৮ সালের প্রথম দিকে কাঠমান্ডুতে সে যখন তার স্ত্রীর আত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, তখন তাকে আটক করেন ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা।

তওকীর একটা রিকশায় করে রাক্সাউল সীমান্ত অতিক্রম করে নেপালে প্রবেশ করেছিল এবং বীরগঞ্জের একটা হোটেলে থাকত। পরে চলে আসে বিরাট নগরের ভুট্টায়। ডা. গফুরের ক্লিনিকে মান্নান নামে একজন সমর্থকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। একটা ঘাঁটি গাঁড়তে তাকে সাহায্য করে ইসলামী সংঘ নেপাল। ২০০৮ সালে ডিসেম্বরে আবদুল রহমান শেখ নামে একটা নেপালী পরিচয়পত্র জোগাড় করে তওকীর, ওয়ার্ড নম্বর ১৮, বিরাট নগরের বাসিন্দা। তওকীর একটা নেপালী পাসপোর্টও চেয়েছিল, কিন্তু তার তত্ত্বাধায়ক নিজাম খান তা জোগাড় করে দেয়নি তার নেপালী ভাষা না জানার কারণে। তাকে বলা হয়েছিল, তাকে কিছুদিন গোর্খায় থাকতে হবে এবং স্থানীয় ভাষা শিখতে হবে। নিজাম কাঠমান্ডুতে তার বাড়িতে তওকীরকে দাওয়াতও করেছিল এবং ডেরা গ্রামে তার থাকার ব্যবস্থা আর একটা সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তিন মাস পর সে চলে আসে আহ্লে গ্রামে এবং একটা মাদ্রাসায় থাকে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সে ফের চলে আসে ডেরায়। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তেহ্ফুজুল-কুরান মাদ্রাসায় ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করে। ২০১০ সালের শুরুর দিকে তওকীর চলে আসে গোর্খা সিটিতে এবং আরেকজন আইএম সমর্থক আবদুল করিমের সঙ্গে অংশীদারীত্বে একটা কোচিং সেন্টার খোলে। ২০১১ সালের জানুয়ারিতে সেন্টারটি বন্ধ করে দেয়া হয়। তওকীর নেপাল ছেড়ে সৌদি আরবে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আবার কাজ শুরু করে। তাকে সাহায্য করে আইএম স্লিপার সেলের আরেক লোক আইয়ুব, যে একটা ট্রাভেল এজেন্সি চালাত বাগ বাজারে, কাঠমান্ডুর তাজ লজের উল্টো দিকে। পাল্লা নেপালের কাছে তামগাসে অর্জুন বোর্ডিং স্কুলে তওকীরের জন্য একটা কম্পিউটার শিক্ষার কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল আইয়ুব। পরবর্তীকালে সে শিক্ষকতা করত রুদ্র গঙ্গা বোর্ডিং স্কুলে। এই কাজও জোগাড় করে দিয়েছিল আইএমের সেল। ২০১৪ সালের শেষে তওকীর নেপালী পাসপোর্ট পাওয়ার চেষ্টা করে আবার। এ জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ডকুমেন্ট তাকে সরবরাহ করে নিজাম খান। ১৫ দিনের মধ্যেই সে সরকারীভাবে একজন নেপালী নাগরিকে পরিণত হয়। আইয়ুবের

*রেফারেন্সে সে হাফিজ নামে একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, যে লোক তার জন্য সৌদি ভিসা জোগাড় করে দেয়। ২০১৫ সালের ১২ই এপ্রিল রিয়াদগামী এমিরাটস-এর একটি বিমানে আরোহন করে তওকীর। দুটো সুপারমার্কেটে সে কাজ করে। একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে 'এক্সিট ৮' এবং অন্যটি ইমতিয়াজ আল-উরুবা। প্রতি মাসে তার আয় হচ্ছিল প্রায় ২৬০০ রিয়াল। ২০১৬ সালের রমজানে সে নেপালে ফিরে আসে এবং মুম্বাইতে তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে। ভারতীয় স্পাইরা তার কল ইন্টারসেপ্ট করে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে নেপাল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।*

এই ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টে হয়তো র স্পাইদের যন্ত্রণাকর কাজের প্রতিফলন মিলবে না। অফিসিয়াল ফাইলের জন্য সম্পন্নকৃত এটা একটা সহজ ও সাদামাটা ইন্টার্নাল মেমো। যাই হোক, ভিতরের লোকদের মতে, পলাতকদের পিছু ধাওয়া করার বিষয়টা ছিল ক্লান্তিকর। অনেক ঘটনায় নেপালে তৎপর সমর্থকদের গুপ্ত নেটওয়ার্কের কারণে তাদের রোডব্লকে পড়তে হত, ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদীদের আঁকাবাঁকা পথে টাকার জোগান দিত ওইসব নেটওয়ার্ক। নেপালী সিস্টেমে একটা জটও ছিল, তাতে গোপন সূত্র থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করতে তাদের বাধার মুখে পড়তে হত।

খত্রীর মত ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভদের ক্ষেত্রে, গ্রেপ্তার ছিল একাধারে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুইই। এই তথ্যে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন যে ভারতের ওয়ান্টেড সন্ত্রাসবাদী সহজেই দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে নেপালে। আর পাকিস্তানের সাহায্যপুষ্ট মাদ্রাসাগুলোর যত বেশি বিস্তার ঘটছে, পরিস্থিতি ততই থমথমে হয়ে উঠছে। তিনি সীমান্ত বন্ধ করে দেয়ারও পক্ষে নন, কেননা এর ফলে নেপালীরা আরও বেশি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়তে পারে, তাদের পক্ষে চীনা ও পাকিস্তানিদের শক্তভাবে টেনে নিতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, প্রধান সমস্যা হচ্ছে ১৭১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ খোলা সীমান্ত দিয়ে সন্ত্রাসবাদী ও অপরাধীদের অনুপ্রবেশ রোধ করা। এর জন্য মোতায়েন করা হয়েছে একত্রিশ ব্যাটেলিয়ন সাশ্ত্রা সীমা বল (এসএসবি)। স্বরাষ্ট্র সচিব ও যুগ্ম সচিব স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম ছাড়াও দুই দেশের জেলা সমন্বয় কমিটিও রয়েছে, যারা পারস্পরিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে, যেমন আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, চোরাচালান ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা দমন করা।

আমরা কি সীমান্ত বন্ধ করতে পারি? চীনা ইন্টেলিজেন্স এখন যেহেতু নেপালে অভিযান চালিয়েছে, তাই সেটা সম্ভব নয়। ম্যান্ডারিন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গজিয়েছে এবং ভারতীয় কন্সুলেটের সামনে সম্প্রতি একটা ছোটখাট বিস্ফোরণের ঘটনা ছিল কেবল একটা হুশিয়ারি যে চীনারা আমাদের ঘাড় চেপে ধরতে পারে। ২০০৬ সালের জানুয়ারিতে সম্পর্ক ঝালাই করে নেয়ার একটা সুযোগ এসেছিল যখন দুই দেশের কর্মকর্তারা নতুন দিল্লিতে একটা বৈঠকে বসেছিলেন ভারত-নেপাল ট্রানজিট চুক্তি নিয়ে আলোচনা করার জন্য, যাতে পনেরটি ট্রানজিট পয়েন্ট দিয়ে নেপালে মসৃণভাবে মালামাল পরিবহন করা যায়। নেপালে মোট বাণিজ্যের ৬০ শতাংশেরও বেশি ছিল ভারতের সঙ্গে এবং নিজের উন্নয়নের জন্য নেপাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করতে চাইছিল। তবে ভারত সরকার উদ্বিগ্ন ছিল ভারতীয় ও নেপালী মাওবাদীদের মধ্যে যোগসূত্র এবং চীনা ও পাকিস্তানিদের নিরঙ্কুশ প্রবেশাধিকার নিয়ে। ভারত সরকার নেপালকে নির্দিষ্ট পূর্বশর্ত পালনের আহ্বান জানিয়েছিল, যেমন ট্রানজিট পয়েন্টগুলো যুক্তিসিদ্ধ করা, একটা গ্যারান্টি সিস্টেমের মাধ্যমে তৃতীয় দেশের পণ্য পরিবহনে সুরক্ষা প্রদান এবং নেপালের ভিতর দিয়ে ভারতের এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে পণ্য পরিবহনের অধিকার দেয়া। এই আলোচনা এবং নির্দিষ্ট শর্তগুলোর ব্যাপারে ভারতের অনড় মনোভাব এই বৈঠকের ইতিবাচক ফলাফলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। চুক্তি নবায়নে অন্তত তিন মাস বিলম্ব করা হয়েছিল যা প্রথম স্বাক্ষরিত হয় ১৯৫০ সালে এবং এতে একটা রাজনৈতিক সংকেত গিয়েছিল যে নেপাল নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ভারতের ওপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার মতামতই বাস্তব হয়েছিল যখন মাওবাদীরা সহিংসতা ত্যাগ করে নির্বাচনের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। কতিপয় নেপালী মাওবাদী নেতা তখনও র-এর অ্যাসেট ছিলেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল শান্তি প্রক্রিয়ায় এবং তেরাই অঞ্চলের গুপ্ত স্থান থেকে মাওবাদী নেতাদের নিরাপদে কাঠমান্ডুতে আগমনে।

ভারতের সবসময়ই আঙ্গিক সম্পর্ক ছিল নেপালের সঙ্গে, কিন্তু বিশ্বের গতি পরিবর্তন ও চীনাদের উপস্থিতির ফলে দেশটির ওপর থেকে ভারতের মুঠি আলগা হয়ে গেছে। র অফিসার দিবাকর স্মৃতিচারণ করে বলেন, এমনকি মার্কিন সরকারও নেপালকে কোনও কিছু জ্ঞাপন করাতে চাইলে তাদের

কূটনীতিকরা ভারতকে অনুরোধ করত বার্তাটা পৌঁছে দিতে। কিন্তু ২০০৯ সাল নাগাদ ভারতের প্রতি নেপাল এতটাই উদাসীন হয়ে পড়ে যে এমইএর একজন কর্মকর্তা মার্কিন দূতাবাসের একটা প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে নেপালকে অবশ্যই রাজনৈতিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করায় প্রবৃত্ত সকল রাজনৈতিক দলকে গ্রহণ করে নিতে হবে। তিনি বলেন, এটা ছিল একটা চিহ্ন যে নেপালী রাজনৈতিক শ্রেণীতে ভারতবিরোধী অবস্থানকে দেখা হত নেপালপন্থী অবস্থান হিসেবে, যদিও তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভারতের ওপর নির্ভরশীল।

দিবাকর বলেন, 'সরকার পর্যায়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নেপাল সরকারকে সরাসরি কোনও বার্তা দেব না। সত্যটা হল, নেপালীদের অনুসরণ ও প্রভাবিত করার মত অবস্থায় আর ছিল না গুপ্তচর সংস্থাটি। নেপালীদের উদ্দেশ্য নিয়েও সন্দেহ ছিল র-এর, কেননা তারা প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিল ভারতের শত্রু চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে। ভারত সরকারের অনিচ্ছার কারণে শীর্ষ নেতাদের রিক্রুট করার সুযোগ হারিয়েছিল র, যারা হয়তো রাষ্ট্রের গোপন তথ্য দিতে পারত। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য মানুষের কোনও বিকল্প নেই এবং সূত্র যদি শুকিয়ে মরে তাহলে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাওবাদীদের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু আমরা সবখানেই আমাদের লোক রাখতে চেয়েছিলাম। শত্রুশিবিরে গুপ্তচর না থাকলে সেটা বিপদের কারণ হতে পারে। আমরা যথাযথ নিয়ন্ত্রণে নেপালের ভিতরে আমাদের সোর্সদের পরিচালনা করে যাচ্ছি। এমনকি যখন ব্যবহার সীমিত ছিল–যেহেতু আমরা কত দূর যেতে চাই সেটা স্থির করার ভার ছিল সরকারের–তখনও প্রচুর ইনফর্মার নিযুক্ত করেছিলাম যাতে নেপালী নীতিনির্ধারকদের প্রতিটা পদক্ষেপ অনুসরণ করতে পারি। ওই রকম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশে এজেন্টাদের চালান খুবই কঠিন, কিন্তু আমাদের হতভম্ব হলে চলবে না। আমাদের নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ ছিল তেরাই অঞ্চল ও কাঠমান্ডুর কিছু নির্দিষ্ট এলাকা, কেননা উগ্রপন্থীরা ক্যাম্প আর সেফ হাউজ স্থাপন করছিল সীমান্ত ঘেঁষে। কট্টরপন্থীদের দূর করতে নতুন করে অভিযান চালান হয়েছিল, অন্যদিকে উন্নয়ন ও অবকাঠামো প্রকল্পে ত্রাণ সরবরাহ করে নেপালী রাজনীতিকদের শান্ত করছিল সরকার।'

খত্রীর মতে, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশল থেকে স্বল্পমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু এস্পিওনাজ আপনাকে দেবে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা। 'এমনকি আজকের দিনেও নেপালী সরকার যুক্তি দেয় যে চীনের চেয়ে ভারত অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী, কিন্তু আপনি অন্ধের মত তাদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। হৃদয় জয়ের দিন পেরিয়ে গেছে। এখন সময় হচ্ছে ভারতবিরোধী অংশগুলোকে দুর্বল করা। প্রাধান্যের বিষয়টি পরিষ্কার–চীনা ও পাকিস্তানিদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটা নির্বাচিত, স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক সরকারকে আমরা সমর্থন করি।'

৫

# দরবেশের মধ্যে এক গুপ্তচর

রূপালী পর্দায় গুপ্তচরবৃত্তি দেখতে ভালই লাগে। সিনেমায় দেখা যায়, অস্ত্রসজ্জিত একজন একাকী যোদ্ধা বৈশ্বিক যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, তার ছদ্মাবরণের অংশ হিসেবে একজন সুন্দরী নারীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বের কিছু বিশাল অভ্যুত্থান ঘটেছে যেখানে একটা অস্ত্রও দেখা যায়নি। একটা শক্তিশালী শত্রুপক্ষের সদস্যদের মধ্যে আপনি কীভাবে ভিন্নমত চারিয়ে দিতে পারবেন? আপনার দেশের সেরা স্বার্থের জন্য আপনি কীভাবে শত্রুতে পরিণত হওয়া এক বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হবেন? দেয়ালের ওপাশের ঘটনাবলী জানতে আপনার সংস্থার জন্য কীভাবে ডাবল এজেন্ট শনাক্ত ও রিক্রুট করবেন? কীভাবে আপনি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বদলে দেবেন এক দেশকে আরেক দেশের বিরুদ্ধে লাগিয়ে? এবং আপনার দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন বিপন্ন, তখন একটা অনুকূল সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে কীভাবে ছায়াযুদ্ধ চালাবেন?

বিপুল চন্দ্র ছিলেন জেমস বন্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও গুপ্তচর মহলে তরুণ এই স্পাই পরিচিত ছিলেন 'সন্ত্জী' (সাধু) হিসেবে। তিনি মদ্যপান করতেন না, ধূমপান করতেন না এবং প্রশিক্ষণকালে একটিমাত্র প্রেমের ঘটনায় জড়িয়েছিলেন, মুম্বাইয়ে জন্ম নেয়া সেই মেয়েটিকে পরে বিয়ে করেন তিনি। র-তে বিপুলের যোগ দেয়ার সময় বিশ্ব মানচিত্রে দ্রুত গতিশীল কিছু ঘটনা ঘটছিল, যার মধ্যে ছিল ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লাহ্ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে শিয়া বিপ্লব, আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ও আফগান মুজাহিদীনের একটা গ্রুপকে অস্ত্রসজ্জিত করতে দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের আগমন। তার প্রথম পোস্টিং ছিল কাবুলে, আট মাস পর তাকে নিযুক্ত করা হয় সিরিয়ায়। এক বছর পর সেখান থেকে ফিরে এলে বিপুলকে ইরাকে

পাঠান হয় একটা অভিযানে। আরবী, দারী, উর্দু, জার্মান ও রুশ ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন তিনি। এবং তপস্বীর হাসি ছিল তার পছন্দের অস্ত্র। তিনি সংস্কৃত ভালবাসতেন, অবসর সময়ে পড়তেন সুফী অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল মানুষটার কেবল একটা দিক। অন্য দিকটা ছিল সম্পূর্ণ রহস্যজনক। একজন পেশাদার স্পাই হিসেবে বিপুল চন্দ্র ছিলেন ধূর্ত, বহু দূর থেকেও গোপন তথ্যের গন্ধ পেতে সক্ষম, দেশের প্রতি অনুগত একজন যোদ্ধা এবং খালি হাতেই যেকোনও লোককে হত্যা করার প্রতিরক্ষা কৌশলে সুদক্ষ। তার দেহটা ছিল ইস্পাতের, বন্ধুরা মজা করে বলত।

১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন তিনি ইরাকে ছিলেন, দিল্লি থেকে তার কাছে একটা ফোন আসে, দেশে অত্যন্ত জরুরি একটা মিটিংয়ে উপস্থিত হতে তাকে ডেকে পাঠান হয়। ভারত সেই সময় ভিতরে-বাইরে টালমাটাল অবস্থা মোকাবেলা করছিল এবং বিপুলকে দরকার ছিল আরেক রঙ্গমঞ্চে।

১৯৭৯ সাল থেকে, যখন খোমেনীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনে ইরানের শাহ্ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং টিকে থাকার জন্য অন্যত্র আশ্রয় নেন, ইরানের ব্যাপারে ভারতের সমীকরণ তখন শত্রুতায় মোড় নেয়। একদা বন্ধু রাষ্ট্র ইরান ভারতকে দেখে সেই দেশ হিসেবে যে শাহ্-এর শাসনকে সমর্থন করত, এখন পক্ষ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির।

খোমেনীর উপলব্ধি একটা মাত্রা পর্যন্ত সত্য ছিল, বিপুলের বস ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সবসময় জোট-নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে চলছিল এবং ভারত-যুক্তরাষ্ট্র-শাহ্ সম্পর্ক বিষয়ক কথাবার্তা ছিল একটা প্রপাগান্ডা যুদ্ধের অংশ, ভারত ও ইরানের মধ্যে ফাটল চওড়া করতে শত্রুরা যা শুরু করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে খোমেনীর কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা ছিল বিপুলের। এই ধর্মীয় নেতা একদা একটা কথা বলেছিলেন যা বিখ্যাত হয়ে রয়েছে: 'কলম হোক, বন্দুক হোক যেকোনও অস্ত্র সরাসরি তাক করতে হবে মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে, তাদের শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারগুলো।' তাছাড়া, ইরাক ও ইরানের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে চলা যুদ্ধও ছাপ ফেলেছিল ভারত ও ইরানের সম্পর্কের ওপর। তেলের জন্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা এতটাই বেশি ছিল, যে ১৯৮১ সালে এমইএ পরীক্ষা করতে শুরু করেছিল অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কন্‌ফারেন্স (ওআইসি)-তে ভারতের যোগ দেয়া সম্ভব কিনা। অথচ এই সংগঠনটিকে আগে মনে করা

হত পক্ষপাতদুষ্ট। বিপুলকে বিভিন্ন বিষয়ের টপ-সিক্রেট বিশ্লেষণ ও গোপন নথিপত্র প্রদান করা হয়। ওআইসিতে ভারতের যোগ দেয়ার বিষয়টি বুঝতে তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখেন, প্রতিটা মুসলিম দেশ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেয়ার যোগ্য, এর সনদ গ্রহণ করার প্রস্তুতি ও আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে আবেদন করতে হবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইসলামী সংহতি বিকশিত করা কন্‌ফারেন্সের প্রধান লক্ষ্য তা ওই সনদে নিরূপণ করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিলে ওই সনদ মেনে নেয়া ও ওই ধরনের লক্ষ্যে কাজ করা সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু, ১৯৬৯ সালে সূচিত হওয়ার পর থেকে ওআইসি বিভিন্ন বিধি গ্রহণ করেছিল সদস্যদের আবদ্ধ করতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একটা জিহাদ ফান্ড গঠন করেছিল। এই ফান্ডের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়া এবং দুর্দশাগ্রস্ত অন্যান্য ইসলামী দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

কতিপয় ব্যক্তি যুক্তি দিয়েছিলেন, ওআইসির সদস্যপদ ভারতকে পাকিস্তানি পদক্ষেপ মোকাবেলা করতে সাহায্য করবে, কিন্তু একই সঙ্গে, কন্‌ফারেন্সে পাকিস্তানের সঙ্গে অবিরাম কলহে লিপ্ত হলে পাকিস্তানবিরোধী ফোবিয়ার অভিযোগও ঘাড়ে এসে পড়বে। কাশ্মিরের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সম্ভাবনায় আপসরফার জন্য নিশ্চিতভাবেই ভারতের ওপর চাপ দেয়া হবে এবং মধ্যস্থতারও উদ্যোগ নেবে ওআইসি। এই সংগঠনের ব্যাপারে এমইএর একটি নোটে বলা হয়েছিলঃ

> *ওআইসিতে আমাদের সদস্যপদ লাভের পর, এটা সম্ভব যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিয়মিতভাবে ওআইসির হস্তক্ষেপের একটা দরজা খুলে যাবে। ১৯৬৯ সালে রাবাতে ইসলামী সম্মেলনে আমাদের অংশগ্রহণের অতীত অভিজ্ঞতাও উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। সেই সম্মেলনে ভারতের সঙ্গে বিশ্রীভাবে আচরণ করা হয়েছিল, যদিও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সরকার স্তরে। আমাদের রাষ্ট্রদূত সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ আপত্তি তোলেনি। ২৪শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের তরফ থেকে আপত্তি তোলা হয়েছিল সেখানে আমাদের উপস্থিতি নিয়ে। এই সংগঠনে সদস্যপদ অর্জন করলে ভারতের তেমন কোনও সুবিধা হবে বলে প্রতীয়মান হয় না। এসব দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মসৃণভাবে চলছে, হয়তো আরও*

*জোরদারও হবে। প্রতীয়মান হয়, ওআইসির সদস্য হওয়ার চেয়ে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এতেই।*

ভারত-ইরান সম্পর্ক গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে খোমেনীর কঠোর অবস্থানের কারণে। একজন গুরুত্বপূর্ণ শিয়া নেতার সন্ধান পেতে কূটনীতিকরা গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিলেন, যে নেতা ভারতের পক্ষে দাঁড়াবেন, কারণ ওই ধরনের প্রভাব ছাড়া যেকোনও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। বিপুলের বস, সাংকেতিক নাম অনিল প্রসাদ, একটা কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন: 'তুমি কি ভারতের জন্য খোমেনীর আস্থা অর্জন করতে, ক্ষুব্ধ রাজনৈতিক নেতাদের প্রশমিত করতে আর ইরানে পাকিস্তানের প্রভাব দূর করতে পারবে? ইরানে পা না দিয়েই একটা থার্ড-কান্ট্রি অপারেশন চালাতে তুমি কি সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী?'

বিপুল আমাকে বলেন, তার মনে হয়েছিল যেন মাথায় একটা হাতুড়ির বাড়ি মারা হয়েছে।

'কিন্তু আমি কোনও অপারেশনে কখনও না বলিনি,' তিনি যোগ করেন। 'আর এখন আমাকে একটা কাজ দেয়া হচ্ছে যেটা করতে সমগ্র কূটনৈতিক মহল ব্যর্থ হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এ কথা বলতে মিথ্যা বলা হত। আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম, তা আমার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল। যাই হোক না কেন, আমি উপলব্ধি করেছিলাম কোনও চয়েস নেই। আমার বস এই অপারেশনের ওপর নির্ভর করছিলেন।'

ভারত ও ইরানের সম্পর্কের মধ্যে বড় ধরনের টার্নিং পয়েন্ট আবিষ্কার করতে বিপুল বেশ কিছু নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেন। দুই দেশের সম্পর্ক স্থির করতে যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তার ওপর আলোকপাত ছিল ওইসব নথিতে। তিনি একটা কথোপকথন খুঁজে পান যেটা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ৩রা অক্টোবর, স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফিসে, তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্বরন সিং ও তৎকালীন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যে। দুই নেতা মধ্যাহ্নভোজ শুরু করার ঠিক আগে। সেই কথোপকথনের কিছু অংশ:

*হেনরি কিসিঞ্জার: আপনাদের প্রচেষ্টার সফলতা দেখাই আমাদের একমাত্র আগ্রহ। আমরা এক পক্ষ বা অন্য পক্ষকে সমর্থন করি না। আমাদের কেবল কিছুটা উদ্বেগ আছে আফগানিস্তান নিয়ে। আমরা*

পাকিস্তান ও ইরানকে বলেছি আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে যতক্ষণ না আফগানিস্তান তাদের অভ্যন্তরীণ সিস্টেম ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

স্বরন সিং: এ বিষয়টা সামনে এসেছিল যখন আমি ইরানে গিয়ে কথা বলেছিলাম শাহেনশাহ্-এর সঙ্গে।

হেনরি কিসিঞ্জার: শাহ্ আপনার সফরের বিষয়টি আমার কাছে উল্লেখ করেছিলেন।

স্বরন সিং: আমি তাকে সরলভাবে বলেছিলাম, ভারতের বিপক্ষে আপনারা সবসময় পাকিস্তানের পক্ষ নেবেন, এটাই কি আপনাদের অবস্থান? তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানকে ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। তিনি দুটো পয়েন্ট তুলে ধরেছিলেন–(১) পাকিস্তান যদি আগ্রাসনের শিকার হয়, তিনি পাকিস্তানকে সমর্থন করবেন, কিন্তু তিনি মনে করেন না পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানোর নীতি নিয়েছে ভারত, (২) যদি পাকিস্তানের খণ্ডিত হওয়ার বিপদ দেখা দেয়, বিশেষ করে বেলুচিস্তানে, তিনি পাকিস্তানকে সমর্থন দেবেন ওই ধরনের আন্দোলন প্রতিহত করতে। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমার প্রধানমন্ত্রী ও আমি কয়েকটি বিবৃতি দিয়েছি যে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।

হেনরি কিসিঞ্জার: শাহ্ ভারতকে দোষারোপ করছিলেন না, কেবল বিভিন্ন সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিলেন।

স্বরন সিং: তিনি প্রধানত উদ্বিগ্ন ছিলেন বেলুচিস্তান নিয়ে, আর পরোক্ষভাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমরা সেখানকার কোনও বিধ্বংসী আন্দোলন সমর্থন করছি না।

হেনরি কিসিঞ্জার: শাহ্ আমাকে বলেছেন, আপনি তার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়ার আগে তিনি আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন কিনা এবং তিনি আপনাকে বলেছিলেন যে করবেন।

স্বরন সিং: হ্যাঁ, তিনি আমাকে এ কথা বলেছেন।

এই কথোপকথনে উন্মোচিত হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট: নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইসুতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের উদ্বেগ শাহ্-এর কাছে পৌঁছান হয়েছিল মার্কিন সরকারের মাধ্যমে। বিপুল বলেন, অন্যান্য কয়েকটি ফাইলে পরিষ্কারভাবে শত্রুতার মনোভাব ব্যাখ্যা করা

পাকিস্তান থেকে তেহরানে সামরিক সহযোগিতার প্রবাহ ছিল অবাধ। আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আখতার আবদুর রহমান ইরান ও অন্যান্য আরব দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কট্টর সমর্থক ছিলেন আফগানিস্তানের ওপর লক্ষণীয় প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য।

অনিল প্রসাদ ১৯৮৪ সালের অভিযানের পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিপুলকে কাজ করতে হয়েছিল একাকী যোদ্ধা হিসেবে। ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সিরিয়ান আরব রিপাবলিকের রাজধানী দামেস্কে অবতরণ করেন। তার একজন অ্যাসেট ছিলেন, নাম হাইয়ান। প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল-আসাদের সিরিয়ান বা'থ পার্টির সরকারে কাজ করতেন হাইয়ান। এর আগে বিপুল ও হাইয়ান এক সঙ্গে কাজ করেছিলেন লেবাননে। আয়াতোল্লাহ্ মোহাম্মদ হুসেইন ফাদলাল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ গ্রুপে ঢুকতে পেরেছিলেন হাইয়ান জোগাড়যন্ত্র করে, ফাদলাল্লাহ্ ছিলেন একজন শিয়া ধর্মীয় নেতা, মনে করা হত তিনি হিজবুল্লাহ্র সমর্থক। লেবাননী কট্টর সংগঠন হিজবুল্লাহ্ বিশ্বের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর নজরে আসে ১৯৮৩ সালে বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণের পর, ওই বিস্ফোরণে কয়েকশো মার্কিন ও ফরাসী সেনা নিহত হয়। ১৯৮৩ সালে বৈরুতে একটা সীমিত পরিসরের অভিযানে লিপ্ত ছিলেন বিপুল, সে সময় ধর্মীয় নেতা ফাদলাল্লাহ্র সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হাইয়ান। বিপুলকে ফাদলাল্লাহ্ বলেছিলেন, তিনি স্পাইদের গন্ধ পান এবং বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার জন্য যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তিনি পেশাটিকে একটা দেশকে রক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন।

'এটা যদিও আনন্দদায়ক কাজ নয়, দেশের মানুষের জন্য জীবনকে আনন্দদায়ক করে তোলে এই পেশা,' বিপুল বলেছিলেন ফাদলাল্লাহ্কে। 'গুপ্তচরবৃত্তি কেবল বিশ্বাসঘাতকতা আর দ্বৈততার বিষয় নয়। এটা একটা প্রেমও যা নিরাপত্তার উপরিতলে রঙ ছড়ায়।'

সফল ইরানী বিপ্লবের কালে জন্ম নিয়েছিল হিজবুল্লাহ্র ধারণা। গুপ্তচররা মনে করেন, খোমেনীকে আইডল হিসেবে নিয়ে প্রতিবেশী দেশে শিয়াদের কট্টর করে তোলার পাশাপাশি উগ্রপন্থী তৎপরতায় সাহায্য করত এই সংগঠন। বিপুলের জন্য ফাদলাল্লাহ্ ছিলেন একটা চাবির ছিদ্র, তার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী দেখতেন তিনি আর চুপিসারে নিজের কাজ করতেন।

এখন তাদের শেষ সাক্ষাতের প্রায় দুই বছর পর ইরান-ইরাক যুদ্ধের পটভূমিতে হাইয়ানের সঙ্গে বিপুলের দেখা করার প্রধান কারণটা ছিল সহজ–ইরানী নেতাদের সঙ্গে ফাদলাল্লাহ্‌র সম্পর্কটাকে তিনি কি কাজে লাগাতে পারবেন ইরান সরকারের ভিতরে পা রাখার জায়গা করে নিতে, যে সরকার ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন? স্পাইদের কাছে এটা আর গোপন কিছু ছিল না যে হিজবুল্লাহর উত্থান ঘটেছে ইরানী মদদে এবং ফাদলাল্লাহ ও দলটির নেতা হুসাইন মুসাভী দুজনেই খোমেনীর ঘনিষ্ঠ মহলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

বিপুলের সঙ্গে ফাদলাল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আয়োজন করতে বৈরুতের কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে একটা বার্তা পাঠিয়েছিলেন হাইয়ান। ধর্মীয় নেতার কাছ থেকে একটা জবাবের আশায় তারা প্রায় দুই মাস অপেক্ষা করেন, এমন সময় ১৯৮৫ সালের ৮ই মার্চ সংবাদপত্রের একটি খবরে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েন। দক্ষিণ বৈরুতের বির আল-আবেদ এলাকায় একটি গাড়িবোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে, প্রাথমিক খবরে জানা গেছে এ হামলার লক্ষ্য ছিলেন ফাদলাল্লাহ্‌, এতে নিহত হয়েছে অন্তত আশিজন। যাই হোক, অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন ফাদ্‌লাল্লাহ্‌।

ওই হামলার পর তার প্রথম ধর্মীয় বক্তৃতায় ফাদলাল্লাহ বোমাহামলার জন্য আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে দায়ী করেন। সিরিয়া নিয়ন্ত্রিত বেকা উপত্যকায় একটা স্লিপার সেল হিসেবে কর্মরত একজন হিজবুল্লাহ্‌ কন্ট্যাক্টের কাছ থেকে হাইয়ান পরে জানতে পারেন, ফাদলাল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করার সময় এখনও আসেনি। যাই হোক, কন্ট্যাক্ট আরও জানায়, বিপুল ও হাইয়ানকে কুয়েতে চলে যেতে হবে এবং সিগন্যালের অপেক্ষায় থাকতে হবে। বিপুল ও হাইয়ানকে কন্ট্যাক্ট সতর্ক করে দেয়, যে ইসরায়েলী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাদ আর সিআইএ হিজবুল্লাহ্‌ কন্ট্যাক্টদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে, সুতরাং চিন্তাভাবনা না করে কোনও কাজ করলে গোটা এস্পিওনাজ অপারেশনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। সিআইএ মনে করত, একাধারে একটা আগ্রাসী সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক হিসেবে ও লেবাননে উদীয়মান মৌলবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে হিজবুল্লাহ ছিল মার্কিন স্বার্থের জন্য গুরুতর হুমকি এবং মার্কিন সেনা ও স্থাপনার ওপর এদের আঘাত হানার ক্রমবর্ধমান সক্ষমতায় মধ্যপ্রাচ্যে ও পশ্চিম ইউরোপে নিয়মিত মার্কিন কূটনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১৯৮৫ সালের জুনে ফাদাল্লাহ্‌র সহযোগিতায় বিপুল ও হাইয়ান কুয়েতে সাক্ষাৎ করেন আবদুল্লাহ শিরাজীর সঙ্গে। শিরাজী একটা ছোট শিয়া গ্রুপের নেতৃত্ব দিতেন। গ্রুপটা পরিচিত ছিল জুন্দ্ আল-ইমাম নামে। কিন্তু ইরানের শিয়া নেতাদের ওপর তার ছিল বিশাল প্রভাব। তিনি আবদুল হাকিমের সঙ্গে একটা বৈঠক আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেন। হাকিম ছিলেন একজন ইরাকী শিয়া নেতা, তিনি রাফসানজানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বলে মনে করা হত। সাক্ষাতের আয়োজনের জন্য কিছু টাকা দিতে হয়েছিল, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা সেই টাকা সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করেছিল বাগদাদে। ১৯৮৫ সালের অগাস্টে সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিআইএ ও মোসাদের নজর এড়াতে প্যারিসে র-এর একটি সেফ হাউজে। শিরাজী, হাকিম ও ভারতীয় গুপ্তচরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং সেটা গভীর হয়েছিল।

হাকিম দরবেশদের একটা গ্রুপও চালাতেন–তারা ছিলেন সুফী মতবাদের অনুসারী–প্যারিস নগরীতে। সামা ধ্যানে উপস্থিত হতে এক সন্ধ্যায় বিপুলকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, সালওয়ার ও জামেহ্ আর মাথায় উলের তৈরি টুপি পরে সেখানে হাজির হয়েছিলেন বিপুল। তিনি পরে জানতে পারেন, দরবেশদের গ্রুপটিকে ফ্রান্সে ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে গোপন তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগাতেন হাকিম।

১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরের মধ্যে বিপুল ও হাইয়ান উনচল্লিশবার গোপনে সফর করেন সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও আফগানিস্তান। একজন ক্ষমতাশালী শিয়া নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার তিনবার আফগানিস্তান সফরে বিপুলের নাম-পরিচয় ছিল: খালেদ ফারাজ, একজন কুয়েতী ব্যবসায়ী। ফাদাল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বৈরুতে উড়ে এসেছিলেন আফগান নেতা, ভারতীয় এজেন্সির কাছ থেকে বিস্তর উপহার সঙ্গে নিয়ে। বিপুল স্পষ্ট করে বলেন, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা কখনই হিজবুল্লাহর কর্মকাণ্ড সমর্থন করত না, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থক হিসেবে ব্যাপকভাবে নিন্দিত একজন নেতার কাছ থেকে সাহায্য নিতেও দ্বিধা করেনি।

'এস্পিওনাজে, আপনার অ্যাসেটের কোনও রঙ থাকে না যতক্ষণ সে আপনার স্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় আর অ্যাসেট ছদ্মবেশের মধ্যে থাকে,' বিপুল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন আমার কাছে।

তিনি পাঁচবার বাগদাদ ও নাজাফে গিয়েছিলেন। সেখানে শিয়া নেতাদের একটা গ্রুপ ইরানী বিপ্লবকে সমর্থন করতেন এবং গোপনে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে কাজ করতেন। ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন সাদ্দাম হোসেন। যাই

হোক, তেহরানে সব ধরনের সফর পরিত্যাগ করা হয়েছিল যাতে এই অভিযান তৃতীয় দেশ থেকে সম্পন্ন করা যায়।

অবশেষে ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে নেদারল্যান্ডসের হেগে একটা মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। রাফসানজানীর লোক ফারহাদকে সেখানে অভ্যর্থনা জানান শিরাজী, হাকিম, হাইয়ান ও বিপুল। মিটিংটা মসৃণভাবে চলেনি। র প্রধান জি. সি. সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করতে চান ফারহাদ। বিপুল সঙ্গে সঙ্গে একটা সাংকেতিক বার্তা পাঠান তার বস অনিল প্রসাদকে।

'র সবসময় কাজ করত গোপনে এবং রাফসানজানীর দাবী ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক,' বলেন প্রসাদ। 'যাই হোক না কেন, গ্যারিকে (জি. সি. সাক্সেনা) জানান হয়। তাকে আমরা অন্তত একবার ফারহাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পরামর্শ দিই, যাতে রাফসানজানীর মনে কোনও সন্দেহ থাকলে তা দূর হয়। গ্যারি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন, সম্ভবত অপারেশনের ব্যাপারে তাকে ব্রিফ করতে। কয়েক দিন পর তিনি আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্টে সাক্ষাতের আয়োজন করতে বলেন।'

কিছুটা সমস্যার ভিতর দিয়ে বিপুলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন প্রসাদ, কেননা হাকিমের সঙ্গে তিনি থাকতেন ইরাকের দক্ষিণ-মধ্য অংশের নাজাফ নগরীতে, কুয়েতী শিয়া ব্যবসায়ী জামাইল নামে। ফ্রাঙ্কফুর্টের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে। আয়োজনে সাহায্য করেছিলেন হাকিম ও শিরাজী। ফারহাদকে র প্রধান বলেছিলেন, ভারত সরকার একটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাপারে গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ভারত-ইরান সম্পর্ক নিয়ে ভুল ধারণা যাই ছড়ান হোক না কেন তা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি ফারহাদকে আরও বলেছিলেন, বিপুল ভারত সরকারের বক্তব্য বহন করছেন এবং তার অথোরিটির ব্যাপারে তাদের সন্দেহ করা উচিৎ নয়। ফারহাদ কোনও কিছুর অঙ্গীকার করেননি, তবে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এই বার্তা তিনি পৌছে দেবেন রাফসানজানীর কাছে।

১৯৮৬ সালের জানুয়ারিতে হাকিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ফারহাদ একটা সংক্ষিপ্ত বার্তা নিয়ে। তার সিনিয়র, রেজা বাহ্‌রাম, র স্পাই বিপুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। এবার মিটিং আয়োজন করা হয় মাদ্রিদে। রাফসানজানীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রেজা বাহ্‌রাম দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের সীমারেখা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বেশ কিছু বিষয়ে তারা একমত হন:

ক) আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক অব্যাহত রাখব, কিছু দিনের জন্য প্রকাশ্যে নয় গোপনে।

খ) এমনকি সবচেয়ে খারাপ সময়েও ইরান ভারতের জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণ অব্যাহত রাখবে।

গ) আমরা প্রত্যেকেই সরকার পর্যায়ে ভারতের শিয়া নেতাদের সঙ্গে বৈঠক অব্যাহত রাখব এবং প্রতি ছয় মাসে একটি প্রতিনিধি দল ইরান সফর করবে।

ঘ) সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে একটি ইরানী সরকারী প্রতিনিধি দলকে অবশ্যই ভারত সফর করতে হবে।

ঙ) রাফসানজানীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য একজন ভারতীয় কূটনীতিককে পাঠান হবে।

১৯৮৬ সালের মার্চে রাফসানজানী, প্রথমবারের মত, একজন ভারতীয় কূটনীতিবিদকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ প্রদান করেন। যা ছিল র-এর একটি অসাধারণ অভিযানের ফসল। কূটনীতিবিদ বৈঠকের ব্যাপারে এমইএকে অবহিত করেন এবং এই আশ্বাসের কথা জানান যে ইরানী মন্ত্রী পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল শীগগিরই ভারত সফর করবে। সেটা ছিল ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন ১৯৮৬ সালের অগাস্টে ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতী ভারত সফর করেন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ বৈঠকের সাইডলাইনে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছিল।

চিত্তকর্ষক বিষয়, ইরান অপারেশনের সম্পূর্ণ ক্রেডিট নিয়েছিল এমইএ। প্রসাদের কথায়, মূলত মন্ত্রণালয়টি একটি কূটনৈতিক অভ্যুত্থানের অবয়বে পরিণত হয়েছিল যার ব্যবস্থা করেছিল একটি স্পাই এজেন্সি।

'আপনি পুরো অর্কেস্ট্রা শুনছেন, কিন্তু কন্ডাক্টরকে দেখতে পাচ্ছেন না,' প্রসাদ বলেন। 'তারা ইরানী সরকার ও নেতা খোমেনীর কাছে অবাধ প্রবেশাধিকার দাবী করেন, কিন্তু যে এজেন্ট এটা সম্ভব করেছে সে চুপিসারে উধাও হয়ে গেছে আরেক কঠিন ভূখণ্ডে আরেক অভিযানে।'

একটা শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলে ষোল মাস দীর্ঘ অভিযানের পর এক রকম নির্জনবাসে চলে গিয়েছিলেন বিপুল। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের একটা সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি, যেখানে জি. সি. সাক্সেনাও ছিলেন।

'গান্ধী ফিসফিস করে গ্যারিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি বিপুলকে পদ্ম ভূষণ খেতাব দেবেন কিনা। চিফ মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'না, স্যার। একজন স্পাইয়ের পুরস্কার হচ্ছে অভিযানের সাফল্য। তার আর কোনও তকমার প্রয়োজন নেই,' অনিল প্রসাদ পরে আমাকে বলেছিলেন, যখন সম্পূর্ণ ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরিত করতে বিপুলের প্রয়োগ করা নানা পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ওইসব খুঁটিনাটি বিবরণ টপ সিক্রেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ এবং র-এর ভল্টে সেসব চাপা পড়ে থাকবে যুগের পর যুগ।

# শেষ কথা

যখন রাষ্ট্রহীন ফ্যানাটিকদের হুমকির মতই ডিজিটাল হুমকিও সমান বিপদজনক, এমন এক যুগে ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা প্রায়শ চিন্তা করেন: জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি নিশ্চিহ্ন করতে স্পাই অপারেশন কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে? তারা এ প্রশ্নও করেন: প্রথাগত গুপ্তচরবৃত্তি যেখানে শত্রুর দেশে চর নিয়োগ ও পরিচালনা করার জন্য হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স (হিউমিন্ট)-এর ওপর নির্ভর করতে হয়, তা কি এই ইলেক্ট্রনিক নজরদারীর যুগেও প্রাসঙ্গিক? সাইবার এস্পিওনাজের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্তে হানা দেয়ার কৌশল কি শত্রুব্যূহের ভিতরে থাকা একজন ভাল স্পাইকে হটিয়ে দিতে পারবে?

দিল্লিতে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকগুলোয় ইন্টেলিজেন্সের ফাঁকফোকর ও ভুলত্রুটি নিয়ে বর্তমানে যেসব তর্ক-বিতর্ক হয়, সেখানে মানুষ ও যন্ত্রের কাজের ফলাফল তুলনা করা হয়, বেশি বেশি জোর দেয়া হয় মহাশূন্যে স্থাপিত স্যাটেলাইটের ওপর। কিন্তু যুক্তির দিক থেকে এ ধরনের পার্থক্য করার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে। দেশ যেসব হুমকির মুখোমুখি হয়েছে সেগুলো বহুমাত্রিক এবং হুবহু সাদা-কালো নয়। ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা বলেছিল লশ্‌কর-ই-তাইয়িবা (এলইটি), সেই কথাবার্তা ইন্টারসেপ্ট করা সত্ত্বেও শ্রবণ যন্ত্রপাতি ডিকোড করতে পারেনি হাফিজ সাঈদের মাথায় কী ভাবনা চলছিল। সে ঠিক কোথায় আঘাত হানার পরিকল্পনা করছিল? কীভাবে সেটা ঘটাতে যাচ্ছিল? কাউন্টারটেরোরিজমে যুক্ত সিনিয়র র অফিসাররা কখনও কখনও চিন্তা করেন: এলইটির মধ্যে যদি তাদের একজন চর থাকত, তাহলে কি মুম্বাইতে ২০০৮ সালের ২৬শে নভেম্বর দিনটাও হত আর দশটা স্বাভাবিক দিনের মতই একটা দিন?

মানব গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যেসব সন্দেহ তা পরিষ্কার হয়ে যায় গুপ্তচরবৃত্তি বিষয়ে চাণক্যর কথায়। তিনি বলেছিলেন: একজন রাজার গুপ্তচর দরকার সেটা শুধু তার শত্রুদের গোপন তথ্য চুরি করার জন্যই নয়, বরং শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যও। ছদ্মবেশে কর্মরত একজন অগ্নিগর্ভ গুপ্তচর বদলে দিতে পারে একটি দেশের ভাগ্য।

চীনা সামরিক কৌশলবিদ সুন ৎজু বলে গেছেন: 'তুমি যদি শত্রুকে চেন আর নিজেকেও চেন, তাহলে একশো যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে তোমার শঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

এসব কথা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনই সত্য রয়েছে। সেই কারণে একজন এজেন্টের সুতীব্র দক্ষতাকে হটিয়ে দেয়া যায়নি, যদিও বিশ্বব্যাপী গুপ্তচর সংস্থাগুলোর কাজের ধরনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স।

২০০৮ সাল থেকে বাদবাকি বিশ্বের গুপ্তচর সংস্থাগুলোর মত ভারতের গুপ্তচর সংস্থাও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে গুপ্তচরবৃত্তির ডিজিটাল ও ট্র্যাডিশনাল উভয় প্রকার পদ্ধতির ওপর মনোযোগ দিতে শুরু করেছে। উপমহাদেশে র তার হিউমিন্ট নেটওয়ার্ক প্রসারিত করতে শুরু করে এবং সাইবার এস্পিওনাজের জন্য একটা পৃথক ডিভিশনও গঠন করে। র-এর একটা বিশেষায়িত দল মনিটর করে গোপন সংকেত, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষায় যেগুলো রচিত, সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিকর বার্তা ছড়িয়ে দিতে যেগুলো ব্যবহার করে বিদেশভিত্তিক সমাজবিরোধী চক্র। বর্তমানে নিজ রাষ্ট্রের গোপনীয়তা রক্ষা ও অন্য রাষ্ট্রের গোপনীয় তথ্য হাতিয়ে নেয়ার চেয়েও অনেক বেশি কাজ করে র-এর স্পাই নেটওয়ার্ক। স্পাইরা মাদক ও অর্থ পাচারকারী চক্রকে পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিহ্ন করে, যেসব দেশে স্বার্থ রয়েছে সেসব দেশে অন্তর্ঘাতের জন্য অ্যাসেটদের নিযুক্ত করে, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, আর্থিক প্যাকেজের সাহায্যে বিদেশে ভারতপন্থীদের শক্তিশালী করে, এসব ছাড়াও সন্ত্রাসীদের সম্ভাব্য হুমকি ও ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত বিদেশী সংগঠনগুলোর তথ্য দিয়ে অবিরাম সহায়তা করে ইন্টেলিজেন্স বুরো ও অভ্যন্তরীণ অন্যান্য নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে। বর্তমানে র-এর এস্পিওনাজ কালেকশন অতীতের যেকোনও সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পারদর্শিতায় পূর্ণ।

অন্য দিকে, দিল্লি কিংবা বেঙ্গালুরুর একজন সাইবার সিকিউরিটি অফিসার একটা বোতাম টিপেই লাহোরের একটা বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করে দিতে পারেন অথবা দেশের অতিব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রহীন দুর্বৃত্তদের চালান সাইবার হামলা ব্যর্থ করে দিতে পারেন। ভারতের নতুন রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স, ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স ও হিউমিন্টকে অবশ্যই একটা শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে সরকারের জন্য, যাতে গৃহীত নীতিগুলো হয় তথ্যাভিজ্ঞ। আজকের দিনে নীতিনির্ধারকদের যেসব হুমকি

মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেগুলো যেহেতু কোনও একটা এজেন্সির পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব নয়, সুতরাং র-কে অন্যান্য দেশের বন্ধুপ্রতিম গুপ্তচর সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব বড়াতে হবে। কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে, একজন শত্রুর মনে কী চিন্তা চলছে তা বোঝার জন্য সবসময়ই একজন ভাল গুপ্তচর দরকার হবে সরকারের।

১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে ভারতীয় স্পাই এজেন্সি একজন পাকিস্তানি অ্যাসেটকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা দিয়েছিল একটা উর্দু সংবাদপত্র চালু করার জন্য। বেসামরিক আমলারা ভেবেছিলেন, এটা ছিল টাকার শ্রাদ্ধ। আজ, সেই পত্রিকা র-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রগুলোর একটায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু হিসাবের ভুলও হয়েছে। ২০০২ সালে প্রতিবেশী দেশটির এক দুর্বৃত্তকে উপেক্ষা করেছিল র, সে সময় আফ্রিকায় ব্যবসা করার জন্য সে টাকা চেয়েছিল। এ ব্যাপারে জড়িত ভারতীয় অপারেটিভ ভেবেছিল যে এটা দারুণ অফার, কিন্তু দিল্লিতে তার সিনিয়র সাড়া দেননি। সেই দুর্বৃত্ত এখন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাকে যদি রিক্রুট করা হত, তাহলে হয়তো সে সন্ত্রাসী চক্র, আইএসআই ও পাকিস্তান সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য প্রদান করতে পারত। কাজে-ঝাঁপিয়ে-পড়তে-প্রস্তুত একজন অ্যাসেটের কোনও বিকল্প নেই।

কিছু ব্যর্থতা সত্ত্বেও র-এর অভিযান দেশের স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করেছে। বিদেশী হুমকি মোকাবেলার প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে এই সংস্থা গুপ্ত তথ্য প্রদান অব্যাহত রেখেছে প্রধানমন্ত্রীকে ও বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাকে। একই সঙ্গে এই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির জন্য প্রয়োজন কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া একটা স্বচ্ছ রাজনৈতিক নির্দেশনা, যদি বজায় রাখতে হয় এর নিরপেক্ষতা, গতি ও দক্ষতা।

—

যতীশ যাদব নতুন দিল্লিভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিক। দুই দশকের সাংবাদিকতার জীবনে পনের বছরেরও বেশি সময় কাটিয়েছেন ইন্টেলিজেন্স ও তদন্তকারী সংস্থাগুলোর খবর সংগ্রহ করে। কাশ্মির, উত্তরপূর্ব ভারত ও রেড করিডরের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন করেছেন। ডিজিটাল মিডিয়ার প্রথম দিনগুলোয় সাংবাদিকতায় যোগ দেয়ায় পেশাদার ফটোগ্রাফার হওয়ার সুযোগটাও পেয়েছেন। পরবর্তীকালে যোগ দেন টেলিভিশনে, চলচ্চিত্র নির্মাণ কৌশল শেখেন। ২০০৫ সালে *রোপস ইন দেয়ার হ্যান্ডস* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রের জন্য পান নিউ ইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের বেস্ট ডাইরেক্টর অ্যাওয়ার্ড। *দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* ও *দ্য সানডে স্ট্যান্ডার্ড* পত্রিকার দিল্লি ব্যুরো চিফ হিসেবেও কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি নেটওয়ার্ক ১৮-এর অ্যাসোসিয়েট এডিটর।

অনুবাদক পরিচিতি

প্রমিত হোসেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য-অনুবাদক। নিজেও শক্তিমান লেখক। ছোটগল্প, উপন্যাস ও অনুসন্ধানী লেখায় তার মননশীলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে সাংবাদিকতায় জড়িত আছেন আড়াই দশকেরও বেশি। গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে। প্রথম অনূদিত গ্রন্থ অরুন্ধতী রায়ের *দ্য গড অফ স্মল থিংস* থেকেই তিনি খ্যাতিমান। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জন স্টেইনবেক, সালমান রুশদি, ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা, ভি.এস. নাইপল, মার্গারেট অ্যাটউড, জে.এম. কোয়েটজি, জন আপডাইক, ওলগা তোকারচুক প্রমুখের উপন্যাসসহ এ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটিরও বেশি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি। এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে তার ছোটগল্প- *শয়তান* এবং *মিশ্রমাধ্যমের কাজ*, উপন্যাস- *নিষিদ্ধ ভ্রমণ*, অনুসন্ধানী- *জীবন্ত শহীদ: সোলাইমানী হত্যার নেপথ্য কাহিনী*।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সাইদ বারী

রুপালি পর্দায় গুপ্তচরবৃত্তি দেখতে ভালই লাগে। সিনেমায় দেখা যায়, অস্ত্রসজ্জিত একজন একাকী যোদ্ধা বৈশ্বিক যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, তার ছদ্মাবরণের অংশ হিসেবে একজন সুন্দরী নারীর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিশ্বের কিছু বিশাল অভ্যুত্থান ঘটেছে যেখানে একটা অস্ত্রও দেখা যায়নি। একটা শক্তিশালী শত্রুপক্ষের সদস্যদের মধ্যে আপনি কীভাবে ভিন্নমত চারিয়ে দিতে পারবেন? আপনার দেশের সেরা স্বার্থের জন্য আপনি কীভাবে শত্রুতে পরিণত হওয়া এক বন্ধুর সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হবেন? দেয়ালের ওপাশের ঘটনাবলী জানতে আপনার সংস্থার জন্য কীভাবে ডাবল এজেন্ট শনাক্ত ও রিক্রুট করবেন? কীভাবে আপনি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি বদলে দেবেন এক দেশকে আরেক দেশের বিরুদ্ধে লাগিয়ে? এবং আপনার দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ যখন বিপন্ন, তখন একটা অনুকূল সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে কীভাবে ছায়াযুদ্ধ চালাবেন?